# মূর্তিভাঙার রাজনীতি
# ও
# রামমোহন-বিদ্যাসাগর

অমল ঘোষ

প্রগ্রেসিভ ষ্টাডি গ্রুপ
১২/৩, সুরা ক্রস লেন
কলকাতা-৭০০ ০১০

প্রথম প্রকাশ :
১লা অক্টোবর, ১৯৬৩

প্রকাশক :
'প্রগ্রেসিভ স্টাডি গ্রুপ'-এর পক্ষে—
প্রণব রায়
১২/এ, সুরা ক্রস লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০১০

মুদ্রক :
রবীন্দ্রনাথ দাস
'মুদ্রাকর প্রেস'
১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৩

পরিবেশক :
'কথাশিল্প'
১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ :
অনিন্দ্য সেনগুপ্ত

# সূচীপত্র

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

# মূর্তিভাঙা ঃ সাংস্কৃতিক বিপ্লব না নৈরাষ্ট্রবাদী কার্যকলাপ ?

কথিত আছে ইতিহাসের নাকি পুনরাবৃত্তি ঘটে [illegible] শুধু একই ভাবে নয়। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন-বিদ্যাসাগবকে যে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল, তাবই পুনরাবৃত্তি ঘটছে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। পার্থক্য এই—সেদিন তাঁরা জীবিত ছিলেন, আর আজ তাঁদের অনুপস্থিতিতে আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে তাঁদের মূর্তিগুলো। সেদিন যাঁবা এই আক্রমণের প্রধান পুরোহিত ছিলেন, তাঁরা ছিলেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচাবক, আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থাব চরম বিবোধী ও দেশীয় লোকাচারেব রক্ষক। আর আজ যাঁরা এ কাজে লিপ্ত, তাঁরা চান বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন। তদানীন্তন কালে রামমোহন-বিদ্যাসাগর অভিযুক্ত হয়েছিলেন সনাতনী হিন্দু সমাজে পরিবর্তন ঘটানোব জন্য। আর বর্তমানে তাঁদের দাবী করা হচ্ছে যে সে-যুগে তাঁবা নাকি ছিলেন পরিবর্তন-পরিপন্থী। ইতিহাসের কি করুণ পরিহাস !

**সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব না নারদ্‌নিক-বাদী চিন্তাধারা ?**

প্রায় এক দশক আগে ভারতবর্ষে মূর্তিভাঙার সূত্রপাত। সাময়িক বিরতির পর ১৯৭৯-এ আবার তার আত্মপ্রকাশ। সূচনা থেকেই এই কর্মধারা কোন কোন বিপ্লবী মহলের কাছে একটি সঠিক বিপ্লবী কর্মকাণ্ড বলে সমাদৃত। প্রাক্তন ও বর্তমান—সব মূর্তিভাঙার সমর্থকের কাছেই মূর্তিভাঙা হল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অন্যতম ( নাকি একমাত্র ? ) অভিব্যক্তি। আর তাই তাঁরা দাবী করেন যে বিভিন্ন 'প্রতিক্রিয়াশীল' ভারতীয়

ব্যক্তিদের মূর্তিভাঙার মাধ্যমে তাঁরা ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনা করছেন। ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক যুগ অনুযায়ী, ক্ষেত্র অনুযায়ী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য ভিন্ন। তাই প্রশ্ন হল, এই 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'-এর প্রধান উদ্দেশ্যটি কি? এই 'বিপ্লব'-এর সাহায্যে কোন্ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা হবে আর কোন্ সংস্কৃতিই বা প্রতিষ্ঠিত হবে? বর্তমান মূর্তিভাঙার প্রচারকরা দাবী করেন—এটি হচ্ছে প্রলেতারীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লব। মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি যে বিপ্লব অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করে তদানীন্তন চীনা রাষ্ট্র ও চীনের পার্টি থেকে বুর্জোয়া পথযাত্রীদের অপসারণ করেছিলেন, এবং চীনা সর্বহারা শ্রেণী যে বিপ্লবের সাহায্যে চীনা সমাজে সর্বহারা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, উক্ত 'বিপ্লবী'দের কাছে এই বিপ্লব হল সেই সফল চীন-বিপ্লবেরই ভারতীয় সংস্করণ। প্রশ্ন করা যেতে পারে, কোন্ সমাজ ব্যবস্থায় চীন-পার্টি সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনা করেছিলেন? সকলেই বলবেন—সেটি ছিল শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্বে পরিচালিত একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ। আর কোন্ সমাজ ব্যবস্থায় চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভারতীয় অনুকরণকারীরা এটি প্রয়োগ করতে চাইছেন? সমস্ত বিপ্লবীরাই একমত যে ভারতীয় সমাজ হল একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক ও নয়া-ঔপনিবেশিক সমাজ। চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য কি ছিল? শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সর্বহারা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা। আমাদের তথাকথিত বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যও কিন্তু একই, অর্থাৎ বর্তমান ভারতীয় সমাজে সর্বহারা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা! কোন্ শ্রেণী এর নেতৃত্ব দেবে? চীনা সংস্কৃতিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মাও সে-তুং চিন্তাধারায় শিক্ষিত ও পরিচালিত অগ্রণী শ্রমিক-শ্রেণী। আর ভারতবর্ষে এই তথাকথিত বিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ছিন্নমূল কিছু ভবঘুরে পাতিবুর্জোয়া। আধা-সামন্ততান্ত্রিক নয়া-ঔপনিবেশিক সমাজে সর্বহারা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা! বলতে দ্বিধা নেই, নতুন রাজনৈতিক 'তত্ত্ব' হিসাবে এই প্রস্তাব যতই চমকপ্রদ হোক না কেন এর সঙ্গে সামাজিক কাঠামো ও উপরিকাঠামো সম্পর্কিত মার্কসবাদী চিন্তাধারার কোন সম্পর্কই নেই।

সামাজিক কাঠামো ও উপরিকাঠামো সম্পর্কে তা'হলে মার্কসবাদী

ধারণাটি কি ? সকলেই জানেন যে মার্কসবাদের দার্শনিক ভিত্তি হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, এবং সমাজে এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নীতির প্রয়োগেই সৃষ্টি হয়েছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ মনে করে বস্তু মুখ্য এবং চেতনা গৌণ। বস্তু থেকেই চেতনা সৃষ্টি হয়, চেতনা থেকে বস্তু নয়। চেতনা বস্তুজগতের প্রতিফলন। চেতনা ও বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই বস্তুবাদী ধারণার প্রয়োগ ঘটিয়েই মার্কস দেখিয়েছেন প্রত্যেকটি মানবসমাজের ক্ষেত্রে উক্ত সমাজের অর্থনীতি হল বাস্তবভিত্তি, আর এর উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি, এককথায় সংস্কৃতি। মার্কসবাদে এই অর্থনৈতিক ভিত্তিকে বলা হয় কাঠামো বা স্ট্রাক্চার ; আর রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি প্রভৃতিকে ( অর্থাৎ সংস্কৃতিকে ) উপরিকাঠামো বা সুপার-স্ট্রাক্চার নামে অভিহিত করা হয়। মানুষের ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক সমাজে যে বস্তুজীবন গড়ে ওঠে, সেই বস্তুগত জীবন বা অর্থনৈতিক ভিত্তিরই প্রতিফলন হচ্ছে সমাজের সংস্কৃতি।

মার্কসবাদী চিন্তাধারা অনুযায়ী প্রত্যেকটি সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থাই সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও বস্তুগত জীবন প্রস্তুত করে এবং উৎপাদন ব্যবস্থার পার্থক্যই বিভিন্ন ঐতিহাসিক সমাজের পার্থক্য সূচিত করে। সুতরাং কোন উৎপাদন ব্যবস্থা স্থিতিশীল নয়, প্রত্যেকটি উৎপাদন ব্যবস্থারই পরিবর্তন ঘটে। প্রশ্ন হল : সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার কোন্ অংশে পরিবর্তনের সূচনা পরিলক্ষিত হয়—উৎপাদন সম্পর্ক না উৎপাদিকা শক্তি ? মার্কসবাদ উত্তর দেয় যে কোন একটি বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থার প্রথম পরিবর্তন আসে উৎপাদনের যন্ত্রে এবং অবশেষে সমগ্র উৎপাদিকা শক্তিতে। "সর্বপ্রথম সমাজের উৎপাদিকা শক্তি পরিবর্তিত ও উন্নত হয় এবং পরিবর্তনের উপর নির্ভর করিয়া এবং ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মানুষের পরস্পর উৎপাদন সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে।"[১] অবশ্য উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের এই সামঞ্জস্য বিধানের কাজটি যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। ফলে যতদিন সমাজে নতুন উৎপাদিকা শক্তি ও পুরানো উৎপাদন সম্পর্ক বিরাজ করে, অর্থাৎ যতদিন নতুন উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নতুন উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন উৎপাদনের এই দুইটি অংশের দ্বন্দ্বের দরুণ সমাজে সংকট দেখা যায়। আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজেরও সমস্ত সংকটের মূল

কারণ উৎপাদনের ওই দুটি অংশের মধ্যে অসঙ্গতি, দ্বন্দ্ব। একদিকে উৎপাদিকা শক্তি সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের, আর অপরদিকে উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র হল ব্যক্তিগত। তাই এই দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য, উৎপাদিকা শক্তিকে বন্ধনমুক্ত করার জন্য, প্রয়োজন পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। এই পরিবর্তনটি কিন্তু পরিমাণগত পরিবর্তন হবে না, এটি হবে গুণগত পরিবর্তন, একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এইটিই হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা। সুতরাং **পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা হ'ল সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের বৈষয়িক পূর্বসর্ত,** কারণ পুঁজিবাদী সমাজের অভ্যন্তরেই সমাজতান্ত্রিক উৎপাদিকা শক্তি বিকশিত হয়। কিন্তু পৃথিবীতে পুঁজিবাদের অসম বিকাশের ফলে সর্বত্র পুঁজিবাদের একইরকম স্তর দেখা যায় না। তা'হলে যে সমস্ত দেশে পুঁজিবাদের উপযুক্ত বিকাশ হয় নি, যেখানে সামন্তবাদের অস্তিত্ব এখনও বর্তমান, সেই দেশগুলি কি সরাসরি সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উপনীত হতে পারে? না, তা পারে না। মাও সে-তুং দেখান যে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক সমাজে সমাজ বিপ্লবের প্রথম পর্যায় হল একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন এবং পরবর্তী ধাপটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন। "যদিও সামাজিক অর্থে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির প্রথম স্তরের এই ধরনের বিপ্লব এখনও মূলতঃ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক এবং যদিও **এই বিপ্লবের বাস্তব লক্ষ্য হ'চ্ছে ধনতন্ত্র বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করা,** তা সত্ত্বেও এই বিপ্লব বুর্জোয়া নেতৃত্বে ধনতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার এবং বুর্জোয়া এক-নায়কত্বের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পুরানো ধাঁচের বিপ্লব নয়। এই বিপ্লব নতুন ধাঁচের বিপ্লব এবং এর নেতৃত্বে থাকবে শ্রমিকশ্রেণী। প্রথম স্তরে এর লক্ষ্য হবে নয়া-গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীসমূহের যুক্ত এক-নায়কত্বের অধীনে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এইভাবেই এই বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্রের বিকাশের পথকেই প্রশস্ত করে।"[২] (বড় হরফ আমাদের) সুতরাং নয়াগণতান্ত্রিক সমাজ হল ঔপনিবেশিক আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অন্তবর্তী পর্যায়, এবং এই পর্যায়টি অতিক্রম না করে কোন ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক সমাজের পক্ষে সরাসরি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পৌছানো সম্ভব নয়।

বলা বাহুল্য আধুনিক চীনও এর ব্যতিক্রম নয়।

এ'ত গেল উৎপাদন ব্যবস্থা বা সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সম্পর্কিত মার্কসবাদী বক্তব্য। কিন্তু উপরিকাঠামোর পরিবর্তন কি ভাবে সাধিত হয়? অনেকে মনে করেন যে যদি উপরিকাঠামো উৎপাদন ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে, তাহলে নিশ্চিতভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপরিকাঠামোরও আপনা-আপনিই (অটোমেটিক) পরিবর্তন হয়। কিন্তু মার্কসবাদ এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীকে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বলে। বস্তুবাদীদের মধ্যে কিছু কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা বস্তু প্রাথমিক বলে চেতনার ভূমিকাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। এঁদের ভাল্‌গার মেটিরিয়ালিস্ট বা যান্ত্রিক বস্তুবাদী বলা হয়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীরা যদিও বস্তুকে প্রাথমিক মনে করেন, কিন্তু চেতনার যে ভূমিকা আছে তাও তাঁরা স্বীকার করেন। কারণ চেতনা বস্তু-জগতের প্রতিফলন হলেও বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। চেতনার এই ভূমিকা আছে বলেই প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত বস্তুসামগ্রীর পরিবর্তন মানুষ ঘটাতে পারে এবং প্রয়োজন-অনুযায়ী, ইচ্ছানুযায়ী বস্তুর আকার দিতে পারে। সমাজের ক্ষেত্রেও উপরিকাঠামো উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠলেও এটি আবার উৎপাদন ব্যবস্থা রক্ষা করতে সাহায্য করে। আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের যে উপরিকাঠামো, অর্থাৎ রাজনীতি, শিক্ষানীতি, মূল্যবোধ প্রভৃতি, তা পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার কাজই করে। উপরিকাঠামো যেমন উৎপাদন সম্পর্ককে রক্ষা করে, তেমনিই উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপরিকাঠামোর **প্রতিষ্ঠানগত** পরিবর্তন হলেও পুরানো সংস্কৃতির **মূল উপাদানগুলি** বহুলাংশে অপরিবর্তিতই থেকে যায়। ফলে সমাজে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলেও পুরানো আদর্শ, ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস প্রভৃতি পুরানো সাংস্কৃতিক জীবনের উপাদান-গুলি নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার গতিকে ব্যাহত করে। এই কারণে মার্কসবাদ মনে করে যে নতুন সমাজ ব্যবস্থায় পুরানো উপরিকাঠামোর যে উপাদানগুলি চলে এসেছে, সেগুলির বিনাশ সাধন করে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপরিকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। সুতরাং উপরিকাঠামো সম্পর্কে মার্কসবাদী ধারণা হল কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপরি-কাঠামোর সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয় না, এবং তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক

শ্রেণীর অবশ্য কর্তব্য হল এই বুর্জোয়া সংস্কৃতির ধ্বংস সাধন ও সর্বহারা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা। এইটিই হল চীনা সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তত্ত্বগত ভিত্তি। কেবলমাত্র মাও সে-তুং নন, মার্কস-লেনিন-স্তালিনও এই বিষয়টি অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়ার নতুন অর্থনৈতিক নীতির (NEP) ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির কথা ব্যাখ্যা করে লেনিন বললেন, "সঠিক-ভাবে বললে, আমাদের 'একমাত্র' একটা কাজই করার আছে এবং তা'হল আমাদের জনসাধারণকে এমনভাবে 'আলোকপ্রাপ্ত' করে তোলা যাতে তারা সমবায়-কাজে প্রত্যেকের অংশ গ্রহণের সুফলগুলি উপলব্ধি করতে পারে এবং এই অংশগ্রহণের কাজকে সংগঠিত করতে পারে। কিন্তু এই 'একমাত্র' (কাজটি-লেখক) অর্জন করতে গেলে **একটা খাঁটি বিপ্লব অবশ্যই প্রয়োজন**; সমগ্র জনগণকে অবশ্যই একটা সাংস্কৃতিক উন্নতিব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।"[৩] (বড় হরফ আমাদের) বুঝতে অসুবিধা নেই, লেনিন যে প্রকৃত বিপ্লবেব প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন, যার দ্বারা সমগ্র জনগণের সংস্কৃতি বিকশিত হবে, সেটি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সুরক্ষিত কবার জন্যই আবশ্যক এবং এই নতুন সংস্কৃতি সবহারা সংস্কৃতি ভিন্ন অন্য কোন কিছু নয়। তাই লেনিন আরও বললেন, "কিন্তু সমবাযগুলোতে সমগ্র কৃষকদের সংগঠিত করার পূর্বসর্ত হল কৃষকদের সাংস্কৃতিক মান…যা বাস্তবিক পক্ষে একটা **সাংস্কৃতিক বিপ্লব** ভিন্ন অর্জন করা যেতে পারে না।

"আমাদের বিরোধীরা বারবাব বলে থাকেন যে যথেষ্ট সুসংস্কৃত নয় এমন একটা দেশে সমাজতন্ত্র রোপণ করাব দাযিত্ব গ্রহণ কবে আমবা হঠকারী কাজ করেছি। কিন্তু তত্ত্বদ্বারা (সব রকমের তত্ত্ববাগীশদেব তত্ত্ব) নির্দেশিত পথের ঠিক বিপরীত দিক থেকে আমাদের কাজ শুরু কবা দেখে এঁরা সবাই বিভ্রান্ত হন। কারণ যে **সাংস্কৃতিক বিপ্লব এখন আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে,** আমাদের দেশে সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগেই ঘটেছে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব।"[৪] (বড় হরফ আমাদের) লেনিনের এই উক্তিটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এ হ'ল সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে লেনিনের সামগ্রিক চিন্তাধারারই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই এ সম্পর্কে লেনিনের স্বচ্ছ চিন্তাধারা ব্যক্ত করতে যেয়ে স্তালিন লিখলেন, "মার্কস-এর ধারণা আরও প্রসারিত ও বিকশিত করে লেনিন লিখেছেন:

'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে লক্ষ লক্ষ কৃষক ও ক্ষুদ্র উৎপাদক, হাজার হাজার অফিস কর্মচারী, আমলা ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের সকলকে শ্রমিক রাষ্ট্র ও শ্রমিক নেতৃত্বের অধীনস্থ করতে এবং তাদের বুর্জোয়া অভ্যাস ও ঐতিহ্য কাটিয়ে ওঠার জন্যে তাদের পুনর্শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন।' যেমন আমরা অবশ্যই '—শ্রমিক একনায়কত্বের ভিত্তিতে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীকেও পুনর্শিক্ষিত করব, যারা এক আঘাতেই, কোন এক অলৌকিক ঘটনা দ্বারা, মেরী মাতার আদেশক্রমে, বা কোন শ্লোগান, প্রস্তাব অথবা ডিক্রীর আহ্বানে তাদের পাতিবুর্জোয়া সংস্কার ঝেড়ে ফেলতে পারে না, বরং তা একমাত্র ব্যাপক পাতিবুর্জোয়া প্রভাবের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য গণসংগ্রামের মাধ্যমেই করে থাকে।'"[৫] বলা বাহুল্য এই দীর্ঘস্থায়ী গণসংগ্রাম মারফৎ শ্রমিকশ্রেণীসহ অন্যান্য শোষিত শ্রেণীগুলিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত সদস্যরূপে শিক্ষিত করে তোলাই হল সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অন্তঃসার। কিন্তু লেনিন ও স্তালিনের পক্ষে ঐতিহাসিক কারণে যা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নি, সেইটিই মাও সে-তুং একটি সুসম্বদ্ধ তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং চীনা সমাজতান্ত্রিক সমাজের ক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। এইখানেই মাও সে-তুং-এর স্বকীয়তা এবং তাঁর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তত্ত্বটি হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞান ভাণ্ডারে এক অমূল্য সংযোজন। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এই সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তত্ত্বটি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ধারাবাহিক বিকাশেরই ফল।

এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হল তা মার্কসবাদের একেবারে প্রাথমিক জ্ঞান। আমরা জানি যে এই আলোচনা যে কোন সচেতন পাঠকেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক অবস্থা যখন এমনই যে মার্কসবাদের অ-আ-ক-খ সম্পর্কে পরিচয় নেই এমন কিছু আত্মনিয়োজিত বিপ্লবী মার্কসবাদের নাম করেই মার্কসবাদ-বিরোধী কাণ্ডকারাখানা চালাচ্ছেন, তখন এ আলোচনা আমাদের কাছে যতই ক্লান্তিকর হোক না কেন, না করে উপায়ই বা কি? এই সমস্ত ব্যক্তিদের মার্কসবাদ সম্পর্কে কোন ধারণা নেই বলেই এ কথা তাঁরা বলতে সাহস পান যে একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক সমাজে তাঁরা সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনা করছেন। এইরকম একটি সমাজে কি প্রকৃতই সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সুপারিশ করা

যায়? এ ধরনের চিন্তা শুধু অসম্ভবই নয়, হাস্যকর। যখন ভারতীয় সমাজের আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির ধ্বংস সাধনের দায়িত্ব ঐতিহাসিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর উপর বর্তায়, তখন শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি সেজে কেউ যদি সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা প্রচার করেন তখন তাঁকে কি বলা যাবে? হয় এঁদের সমাজবিকাশের ধারা সম্পর্কে কোন মার্কসবাদী ধারণাই নেই, অথবা এঁরা মার্কসবাদেই বিশ্বাস করেন না। প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদ সম্পর্কে অজ্ঞানতা বশতঃই হোক অথবা ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক, এই সমস্ত ব্যক্তিরা যে রাজনৈতিক কর্মধারা অনুসরণ করেন তার সঙ্গে মার্কসবাদের কোন সম্পর্কই নেই। এঁরা একটি মার্কসবাদের সাইনবোর্ড লাগিয়ে জনগণকে বোকা বানাচ্ছেন মাত্র। অপরপক্ষে এঁদের কর্মধারার সঙ্গে কিন্তু নৈরাষ্ট্রবাদীদের কার্যকলাপের অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়ায় নারদ্নিকরা মনে করেছিল রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ হল একটি আকস্মিক ঘটনা। এই চিন্তাধারা থেকেই নারদ্নিকরা রাশিয়ায় পুঁজিবাদের প্রয়োজনকে অস্বীকার করেছিল। তারা মনে করত যে রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত প্রাক্-পুঁজিবাদী কৃষক কমিউন বা গ্রামগোষ্ঠী ছিল সেগুলিই হচ্ছে সমাজতন্ত্রের ভ্রূণ এবং ভবিষ্যতে এগুলিই হবে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি। "নারদনিকরা বিশ্বাস করিত যে রুশদেশে সমাজতন্ত্র সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্য মারফৎ আসিবে না, বরঞ্চ চাষীদের যে পঞ্চায়েতকে (কমিউন) তাহারা সমাজতন্ত্রের ভ্রূণ ও ভিত্তি মনে করিত, সেই পল্লীব্যবস্থার মধ্য দিয়াই আসিবে।"[৬]

নারদ্নিকদের এই চিন্তা ছিল প্রচণ্ড রকমের একটা কাল-ব্যতিক্রম। কিন্তু কেন তারা মনে করেছিল যে রাশিয়ার সামন্ততান্ত্রিক সমাজ পুঁজিবাদী পর্যায়টি অতিক্রম না করেই সরাসরি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উন্নীত হতে পারবে? কারণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব এবং অধিবিদ্যক চিন্তার ফলে শুধুমাত্র পুঁজিবাদের শোষণের দিকটাই তাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল, এবং তারা বুঝতে অপারগ হয়েছিল যে পুঁজিবাদী উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ হচ্ছে সমাজ-তন্ত্র গঠনের বৈষয়িক পূর্বসর্ত। নারদ্নিকদের সঙ্গে কি আমাদের মূর্তিভাঙার প্রচারকদের চিন্তাধারার আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে না? নারদ্নিকরা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে একলাফে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উন্নীত

হওয়ার স্বপ্ন দেখত। আর এঁরা সুপারিশ করছেন একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক সমাজে সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সাহায্যে সর্বহারা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার কথা। সকলেই জানেন ইতিহাসে নারদ্‌নিকদের স্থান মার্কসবাদী হিসাবে নয়, নৈরাষ্ট্রবাদী হিসাবে। এই নৈরাষ্ট্রবাদী চিন্তা থেকেই নারদ্‌নিকরা যেমন সমাজবিকাশের নিয়ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করত, তেমনি তারা সমাজে শোষণ দূর করার পথ হিসাবে বেছে নিত ব্যক্তি হত্যা, এবং অস্বীকার করত শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকাকে। নারদ্‌নিকদের এই বক্তব্য ভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রযুক্ত হলেও, ভারতীয় মূর্তিভাঙার প্রচারকদের তথাকথিত সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও অন্যান্য কার্যাবলী নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে এরা মার্কসবাদ নয়, নারদ্‌নিকবাদ, অর্থাৎ নৈরাষ্ট্রবাদেরই উত্তরসূরী।

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে নারদ্‌নিকরাই একমাত্র নৈরাষ্ট্রবাদী ছিল না। মার্কস-এর জীবদ্দশাতেই প্রুধোঁ-বাকুনিন মার্কসবাদ বিরোধিতার অস্ত্র হিসাবে বেছে নেয় নৈরাষ্ট্রবাদকে। প্রকৃতপক্ষে এই সব নৈরাষ্ট্রবাদীদের বিরুদ্ধে নিরন্তর মতাদর্শগত সংগ্রাম করেই মার্কস

**মার্কসবাদী দৃষ্টিতে নৈরাষ্ট্রবাদ**

এঙ্গেলস মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লেনিন-স্তালিন-কেও নৈরাষ্ট্রবাদীরা অব্যাহতি দেয় নি। যতই মার্কসবাদ বিকশিত হচ্ছে, নৈরাষ্ট্রবাদীরাও তত নতুন নতুন সাজে আবির্ভূত হচ্ছে। আসলে নৈরাষ্ট্রবাদ হল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে পাতি-বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভাব। যতদিন সমাজে পাতিবুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে ততদিন নৈরাষ্ট্রবাদী ভাবাদর্শও প্রচারিত হবে। তাই দেখা যায় প্রুধোঁ-বাকুনিন মতাদর্শের ক্ষেত্রে মার্কস-এঙ্গেলস-এর কাছে চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করলেও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে বারবার নৈরাষ্ট্রবাদী তত্ত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটছে। মাৎসিনি-ক্রপোট্‌কিন-অরবিন্দ থেকে সাম্প্রতিক কালের চে-দেব্রে প্রচারিত প্রত্যেকটি 'নতুন' বক্তব্যের অন্তঃসার হল এই নৈরাষ্ট্রবাদ। কিন্তু মার্কসবাদ চিরকালই যে কোন ধরনের নৈরাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারাকেই আদর্শগত-ভাবে শ্রমিক শ্রেণী ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে বিষাক্ত মতবাদ বলে গণ্য করে থাকে। নৈরাষ্ট্রবাদীদের মধ্যে যে কোন কোন ব্যক্তির সাহস ও আত্মত্যাগ অপরিসীম তা লেনিনের অজানা ছিল না। তাঁদের প্রতি

শ্রদ্ধা সত্ত্বেও লেনিন কিন্তু ১৯০৫ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গ শ্রমিক-সোভিয়েতে নৈরাষ্ট্রবাদীদের প্রবেশাধিকারের বিরুদ্ধেই মতপ্রকাশ করেছিলেন। কি কারণে শ্রমিক সোভিয়েতে নৈরাষ্ট্রবাদীদের অন্তর্ভুক্তি লেনিন সমর্থন করলেন না? নানা কারণের মধ্যে প্রধান কারণটি হল—এই সোভিয়েতগুলি বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক ও বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ভাবাপন্ন পার্টি ও মানুষের ব্যাপক যুক্ত মোর্চার মাধ্যমে যে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করতে চায়, সেই কাজটি নৈরাষ্ট্রবাদীরা বানচাল করে দেবে। এ প্রসঙ্গে লেনিন বলছেন, "সমস্ত বাস্তব কাজকর্মের উদ্দেশ্যে শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েত হচ্ছে সমাজতন্ত্রী এবং বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের একটি ব্যাপক সংগ্রামী মোর্চার সূচনা........ রাজনৈতিক ধর্মঘট ও আরও সক্রিয় সংগ্রামগুলি পরিচালনার জন্য, জরুরী গণতান্ত্রিক দাবী-দাওয়াগুলি, যেগুলি জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মেনে নিয়েছেন এবং অনুমোদন করেছেন, সেগুলি আদায়ের উদ্দেশ্যে এই ধরনের মোর্চা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। এইরকম একটি মোর্চায় **নৈরাষ্ট্রবাদীরা কখনই সম্পদ হিসাবে গণ্য হতে পারে না, বরঞ্চ তারা একটি বোঝা হয়েই দাঁড়াবে।** তারা নিছক সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং এইভাবে এই যুক্তমোর্চার প্রচণ্ড ক্ষমতাকে দুবল করে তুলবে; রাজনৈতিক সংস্কার জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ কিনা এ ব্যাপারটি তাদের কাছে এখনও 'বিতর্কের বিষয়'। এই সংগ্রামী মোর্চা থেকে, যে মোর্চা গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, **নৈরাষ্ট্রবাদীদের বহিষ্কার একান্ত প্রয়োজন;** এই বিপ্লবের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং এই বিপ্লবের স্বার্থেই এটি প্রয়োজন। এই সংগ্রামী মোর্চায় একমাত্র তাঁদেরই স্থান থাকবে যাঁরা এই মোর্চার উদ্দেশ্যের জন্য সংগ্রাম করবেন।"[৭] (বড় হরফ আমাদের)

শুধুমাত্র রুশ শ্রমিক-সোভিয়েতেই নয়, আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসগুলিও কোনদিন নৈরাষ্ট্রবাদীদের প্রবেশাধিকারের দাবী মেনে নেয়নি। কারণ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের মনে নৈরাষ্ট্রবাদীদের সমাজতন্ত্র-বিরোধী চরিত্র সম্পর্কে কোন সংশয় ছিল না। কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই দেখা যায় যে প্রকৃত বিপ্লবী পথের অনুগামী বলে পরিচিত ব্যক্তিরাও নৈরাষ্ট্রবাদী মতবাদ সম্পর্কে অযথা সহানুভূতি প্রদর্শন করতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। নৈরাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারা প্রভাবিত সাধারণ কর্মীদের আত্মত্যাগের

বিষয়টি এঁদের এতই বিমোহিত করে ফেলে যে সমাজতন্ত্র ও নৈরাষ্ট্রবাদের উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তা তাঁরা অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেন না। লেনিন কিন্তু এই বাস্তব সত্যকে জনসমক্ষে প্রচার করতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নি। তাই লেনিনকে বলতে শোনা যায়, "আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসগুলি যে নৈরাষ্ট্রবাদীদের অন্তর্ভুক্ত না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তা অকারণে করা হয়নি। সমাজতন্ত্র ও নৈরাষ্ট্র-বাদের মধ্যে একটি **দুস্তর ব্যবধান** রয়েছে। গুপ্ত পুলিশ বাহিনী ও প্রতি-ক্রিয়াশীল সরকারের পদলেহী সংবাদপত্রগুলি বৃথাই দাবী করে যে এই ব্যবধানের অস্তিত্ব নেই।"[৮] ( বড় হরফ আমাদের )

তা'হলে প্রশ্ন হল মার্কসবাদের সঙ্গে নৈরাষ্ট্রবাদের পার্থক্য কোথায়? যদিও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে নৈরাষ্ট্রবাদী তাত্ত্বিকরা নতুন নতুন বক্তব্যের আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু সর্বকালের সর্বদেশের নৈরাষ্ট্রবাদী বক্তব্যের সারবস্তু একই—তা উনিশ শতকের প্রুধোঁ-বাকুনিন তত্ত্বই হোক, আর আধুনিক কালের চে-দেব্রে তত্ত্বই হোক। তাই নৈরাষ্ট্রবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। লেনিন তাঁর '*Anarchism and Socialism*' প্রবন্ধে এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যই তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে লেনিনীয় শিক্ষা অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, সমস্ত নৈরাষ্ট্রবাদীদের মূল বৈশিষ্ট্য হল অবৈজ্ঞানিক বা এমন কি বিজ্ঞান-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী। সে কারণেই সামাজিক শোষণ বিচার করার ক্ষেত্রে এদের একমাত্র পুঁজি হল ব্যক্তিগত আবেগ ও অনুভূতি। ফলে শোষণের বাস্তব কারণ অনুসন্ধান বা তা' দূর করার জন্য কোন সময়সাপেক্ষ বাস্তবোপযোগী কর্মসূচী গ্রহণ এদের কাছে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। প্রত্যেক নৈরাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারার স্বাভাবিক অনুষঙ্গ হল সমাজ বিকাশ সম্পর্কে চূড়ান্ত অজ্ঞতা। এই চিন্তাধারা অনুযায়ী পুঁজিবাদ কোন ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যসূচক উৎপাদন প্রথা নয়, শুধুমাত্র শোষণের কৌশল। ফলতঃ এরা সর্বকালেই দাবী করে বসে যে পুঁজিবাদের বিরোধিতা করাই বুঝি প্রকৃত বিপ্লবী কাজ। আর স্বভাবতই এরা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় যে পুঁজিবাদী উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ হল সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের বৈষয়িক পূর্বসর্ত। তাই এদের কাছে যেমন প্রাক্-সমাজতান্ত্রিক সমাজে বৃহৎ শিল্পের বিশেষ কোন ভূমিকা নেই, তেমনি বুর্জোয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান বা বুর্জোয়া

এন্‌লাইটেন্‌মেণ্টের ভূমিকাও মূল্যহীন। আসলে নৈরাষ্ট্রবাদের ভিত্তি হল বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ। সর্বকালের সর্বদেশের নৈরাষ্ট্রবাদী মতবাদ এই বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের উপর নির্ভরশীল বলে প্রত্যেক নৈরাষ্ট্রবাদীই সমাজে ব্যক্তির ভূমিকাকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে, এবং প্রকারান্তরে শ্রেণী-সংগ্রামকে অস্বীকার করে। এই ব্যক্তি-চিন্তা থেকেই এরা মনে করে যে কতিপয় ব্যক্তিকে সরিয়ে দিলেই বুঝি সব মুস্কিল আসান। উল্লিখিত প্রবন্ধে লেনিন বলেছেন—

"১। নৈরাষ্ট্রবাদ তার ৩৫ থেকে ৪০ বছরে (বাকুনিন এবং **আন্তর্জাতিক**, ১৮৬৬) অস্তিত্বের ইতিহাসে · · **শোষণের** বিরুদ্ধে কিছু মামুলী মন্তব্য ভিন্ন আর কিছুই সৃষ্টি করেনি।

"এইসব বুলি কিন্তু ২০০০ বছরেরও বেশিদিন ধরে চলছে। কিন্তু যা খুঁজে পাওয়া যায় না, তা হল—(ক) শোষণের কারণ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা, (খ) সামাজিক **বিকাশই** যে সমাজতন্ত্রে উত্তরিত হয়, সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা, (গ) **শ্রেণী সংগ্রামই** যে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সৃষ্টি শক্তি, সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা।

"২। শোষণের **কারণগুলি** ব্যাখ্যা। **ব্যক্তিগত** সম্পত্তি—**পণ্য** অর্থনীতির ভিত্তি। উৎপাদনের উপায়ে সামাজিক সম্পত্তি। নৈরাষ্ট্রবাদে—শূন্য।

"নৈরাষ্ট্রবাদ হল বিপরীতক্রমে বুর্জোয়া **ব্যক্তিবাদ**। ব্যক্তিবাদ নৈরাষ্ট্রবাদের সামগ্রিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তি। (নৈরাষ্ট্রবাদ—লেখক) মাঝারী সম্পত্তি ও জমিতে **মাঝারী অর্থনীতি** রক্ষার সপক্ষে।

. ... .... . . ...... . . .................. .... ... ................ ...

কর্তৃত্বের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করার ক্ষমতাকে অস্বীকার করা।

"৩। সামাজিক বিকাশ—বৃহৎ উৎপাদনের ভূমিকা—ধনতন্ত্রের সমাজতন্ত্রে উত্তরণ—উপলব্ধি করার অক্ষমতা।"*

নৈরাষ্ট্রবাদ হল পাতিবুর্জোয়া, বিশেষতঃ বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণীদর্শন। সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থায় পাতিবুর্জোয়াদের শ্রেণী অবস্থান এবং আচার-ব্যবহার, জীবনপ্রণালী ও মানসিকতা তাদের শ্রেণীদর্শনে প্রতিফলিত হয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় মধ্যবিত্তরা যে বিচ্ছিন্নভাবে অংশ গ্রহণ করে, তার ফলে তারা

শ্রেণীগতভাবে সব সময়ই সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা পালনে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত হয়। আর উৎপাদনব্যবস্থায় পাতিবুর্জোয়াদের এই বিশেষ অবস্থানের জন্যই এদের মানসিকতা হল ব্যক্তিবাদী। এ কারণেই এদের কর্মকাণ্ড, আশা-নিরাশা, চিন্তা-ভাবনা সব কিছুই গড়ে ওঠে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। এই শ্রেণীর সভ্যদেব ব্যক্তিগত আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ প্রত্যেককেই করে তোলে আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী। এই শৃঙ্খলাবিহীন জীবনযাত্রা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণার ফল-স্বরূপ এই শ্রেণীর সদস্যরা সাধারণভাবে হয় আত্মবাদী, যার দরুণ তাদের কাছে নিজস্ব মতই একমাত্র অভ্রান্ত। এই কারণেই পাতিবুর্জোয়াবা যেমন সুবিধা-বাদী ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী পথ গ্রহণ করে, তেমনি বিশৃঙ্খলতাও এদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নৈরাষ্ট্রবাদের শ্রেণীভিত্তি এই দোদুল্যমান, আত্মসর্বস্ব, শৃঙ্খলাবিরোধী পাতিবুর্জোয়া শ্রেণী হওয়ার ফলে সমস্ত নৈবাষ্ট্রবাদীরাই যে কোন ধরনের কর্তৃত্ব (অথরিটি)-বিরোধী। এদেব মধ্যে একদল শ্রেণী-সমাজে রাষ্ট্রের ভূমিকাকেই অস্বীকাব করে, আব এক দল বাষ্ট্র-প্রশ্নে সবাসবি বিরোধিতা না করলেও অন্য কোন ধবনের কর্তৃত্ব, এমন কি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতাও গ্রহণ করতে সম্মত হয না। তাই নৈবাষ্ট্রবাদীবা যেমন একদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকশ্রেণীব একনায়কত্ব বিবোধী, তেমনি কমিউনিষ্ট পার্টিতে প্রচলিত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতাও তাদেব কাছে আমলাতান্ত্রিক বীতি-নীতিরই নামান্তর। বলা বাহুল্য, এ ধরনেব চিন্তাধারাব পথিকবা যে কোন ধরনের বিপ্লবী সংগঠনে বিশৃঙ্খলাব জন্ম দিতে বাধ্য। আব তাব ফলে যে বিপ্লবী আন্দোলন বাস্তবিক পক্ষে বাধাপ্রাপ্তই হয় সে উল্লেখ না করলেও চলে।

নৈরাষ্ট্রবাদেব আবও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সবপ্রকাব বাজনৈতিক কার্যাবলীকে কাযতঃ অস্বীকাব করা। এবও মূল কাবণ কিন্তু ওই পাতিবুর্জোযা মানসিকতা। পাতিবুর্জোয়াদের জীবনদশন ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলে, সাধাবণভাবে এরা যখন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকে ঝোঁকে তখন সেটা তাবা ততটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী করে না যতটা করে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। সামাজিক শোষণ যখন পাতিবুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও সামাজিক মর্যাদা হরণ করে তখন এই শোষণ তাদের বিপ্লবী চরিত্র প্রদান কবে না। বরং তাদের বস্তুগত জীবনের সুযোগগুলি হারিয়ে, এবং অদূর ভবিষ্যতে

সেগুলি ফিরে পাওযার সম্ভাবনা না দেখে, তারা হয়ে পড়ে অস্থির ও হতাশাগ্রস্ত। এই ব্যক্তিগত দুর্দশাগ্রস্ত জীবন থেকে মুক্তির ইচ্ছাই তাদের সমাজ-পবিবর্তন সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। ফলে যখন পাতিবুর্জোয়ারা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দেয, তখন সাধারণভাবে তারা মনের কোনে এই সুপ্ত বাসনা লালন-পালন করে যে এই সমাজ-পরিবর্তনের কাজটি মিটে গেলেই তাবা তাদের প্রাক্তন অর্থনৈতিক স্থাযিত্ব ফিবে পাবে। এই চিন্তা থেকেই তারা তাদের জীবৎকালের মধ্যেই সামাজিক পরিবর্তনের কাজটি সম্পূর্ণ করতে চায, যাতে সমাজ বিপ্লবের ফসল তাবা নিজেরাই উপভোগ করতে পারে। ফলতঃ নৈরাষ্ট্রবাদীরা দীর্ঘ, কষ্টকর পথের বিকল্প হিসাবে এমন সব কর্মপন্থা অনুসরণ করে যেগুলি আপাতভাবে দ্রুত কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজ। এর পরিণামে গুপ্ত হত্যার মত ষডযন্ত্রমূলক কার্যকলাপই তাদের কাছে সমাজ-পরিবর্তনের একমাত্র পথ হয়ে দাঁডায়। এই কারণেই লেনিনকে বলতে হয়েছে, "**হতাশার** থেকে নৈরাষ্ট্রবাদের জন্ম। (নৈরাষ্ট্রবাদ-লেখক) শ্রমিক শ্রেণীর নয়, অস্থির বুদ্ধিজীবী ও ভবঘুরেদের মানসিকতা।"[১০]

নিজ আয়ুষ্কালেব মধ্যে সমাজ বিপ্লব সমাধানের আশা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব সকল নৈরাষ্ট্রবাদীদের আত্মমুখীন করে তোলে, যাব পবিণামে বিপ্লবী আন্দোলনের সাফল্যের জন্য বিপ্লবী পরিস্থিতিব প্রয়োজনীয়তার বিষয় উত্থাপন যেমন এদের কাছে সংশোধনবাদী চিন্তাধারা তেমনি বিপ্লবী আন্দোলনে জনগণের বাস্তব উপস্থিতিব প্রশ্নও সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। আসলে তাবা বাস্তব অবস্থার ওপব নির্ভর কবে তাদের কর্মপন্থা স্থির করে না, তারা স্বপ্ন দেখে যে তাদের কল্পনা অনুযায়ী বাস্তব অবস্থা পরিবর্তিত হবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা যখন তাদের এই স্বপ্নকে প্রশ্রয় দিতে রাজী হয় না, অর্থাৎ তাদের ইচ্ছা ও বাস্তব অবস্থার মধ্যে যখন এক দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়, তখন এই স্বকপোলকল্পনা ও অধৈর্যবাদ নৈরাষ্ট্রবাদীদের মধ্যে কার্যতঃ জনগণ-বিরোধী চিন্তারই জন্ম দেয়। ফলে প্রত্যেক নৈরাষ্ট্রবাদীই জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের পরিবর্তে ষড়যন্ত্রমূলক কাজকেই অগ্রাধিকার দেয়। এই কারণেই যে কোন ধরনের গণসংগঠনের সঙ্গে নৈরাষ্ট্রবাদীদের জন্মগত বিরোধ। তাদের চিন্তাধারা অনুযায়ী যেহেতু সমাজ-বিপ্লবে জনগণের কোন কার্যকর ভূমিকা নেই, সেহেতু জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রশ্নটিও

নৈরাষ্ট্রবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন। আর এই ধবনের কার্যকলাপ যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রগুলোর পক্ষে জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তারের পথকেই প্রশস্ত করে তা বলা বাহুল্য। তাই নৈরাষ্ট্রবাদীদের সমস্ত বক্তব্যের অন্তঃসার হল,—

"নৈরাষ্ট্রবাদী দর্শন হল প্রকৃত বুর্জোয়া দর্শনের বহিঃপ্রকাশ। তাদের ব্যক্তিবাদীতত্ব ও ব্যক্তিবাদী আদর্শগুলি সমাজতন্ত্রেব ঠিক বিপরীত। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী কথনই বুর্জোয়া সমাজ, যা কিনা অপ্রতিরোধ্য গতিতে শ্রমের সমাজ-তন্ত্রীকরণের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মত প্রকাশ করে না। বরং তারা বর্তমান এমনকি অতীতের সেই সমাজে ছড়িয়ে থাকা বিচ্ছিন্ন উৎপাদকদের উপর দৈব সুযোগের আধিপত্যকেই (domination of blind chance) প্রকাশ করে। তাদের কৌশল, যা কিনা রাজনৈতিক সংগ্রামকে কার্যতঃ অস্বীকার করে, তা শ্রমিকশ্রেণীকে বিচ্ছিন্ন করে এবং বাস্তবিকপক্ষে **শ্রমিকশ্রেণীকে একটি বা অপর একটি বুর্জোয়ানীতির নিষ্ক্রিয় অংশগ্রহণকারীতে পরিণত করে।** যেহেতু রাজনীতি থেকে বিযুক্ত থাকা শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে অসম্ভব এবং অবাস্তব।"[১১] (বড় হরফ আমাদের)

এই একই প্রসঙ্গে ***'Anarchism and Socialism'*** প্রবন্ধে লেনিন সুস্পষ্টভাবে বললেন যে বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে নৈরাষ্ট্রবাদীদেব অবদান হল, "বুর্জোয়া সমাজে রাজনীতির অযৌক্তিক অস্বীকৃতি।" 'বুর্জোয়া সমাজে রাজনীতি নাকচ কর'—এ আবরণের আড়ালে নৈরাষ্ট্রবাদীরা বাস্তবিকপক্ষে কি সুপারিশ কবে? লেনিনের মতে **"রাজনীতি অস্বীকার করার মুখোশ পরে বুর্জোয়া রাজনীতির কাছে শ্রমিকশ্রেণীর নতিস্বীকার।"**[১২] (বড় হরফ আমাদের) সত্যসত্যই নৈরাষ্ট্রবাদীরা তাদের অধিবিদ্যক বিচার-ধারার প্রভাবে বুর্জোয়া সমাজের প্রতিটি গণসংগঠনের মধ্যে সংস্কারবাদের ভূত দেখে। যেহেতু দীর্ঘস্থায়ী বাস্তব কাজ ও মতাদর্শগত সংগ্রামের পথকে সমস্ত নৈরাষ্ট্র-বাদীরা সযত্নে পরিহার করে চলে, সেহেতু তারা অবিরত প্রচার করে থাকে যে গণসংগঠনে যোগদানের অর্থ সংস্কারবাদী চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন কিছু নয়। ফলে নৈরাষ্ট্রবাদীরা তাদের নানা ধরনের বাক্‌চাতুরী সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে শোষিত ও নির্যাতিত শ্রেণীগুলির মুক্তির জন্য, কোন কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ

করতে পারে না, বরং শ্রেণীগুলিকে প্রতিক্রিয়াশীল পার্টিগুলোর হাতেই সমর্পণ করে বসে।

যে কোন রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিমাত্রই লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হবেন না যে বিগত কয়েক বছরে ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনেও নৈরাষ্ট্রবাদের উপরোক্ত লক্ষণগুলির সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান মূর্তিভাঙার প্রচার-করা যে রাজনীতির অনুগামী তা নৈরাষ্ট্রবাদ ভিন্ন অন্য কোন মতবাদ নয়।

সাম্প্রতিক বিপ্লবী আন্দোলনে নৈরাষ্ট্রবাদের প্রভাব

অবশ্য বর্তমান মূর্তিভাঙার প্রচারকদের এ বিষয়ে প্রবর্তকের আসন দেওয়া চলে না। কারণ আধুনিক কালে ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে নৈরাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারা প্রবর্তনের সব কৃতিত্বই সি. পি. আই. ( এম-এল ) ও তার সহযোগী দু'একটি গ্রুপেরই প্রাপ্য। বর্তমান মূর্তিভাঙার প্রচারকরা সেই ঐতিহ্যই বহন করে চলেছেন মাত্র। সকলেরই স্মরণে আছে যে ১৯৬৯ সালে সি. পি. আই. ( এম-এল ) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্প কিছুকাল পর থেকেই এই পার্টিটি যে কর্মসূচী গ্রহণ করে তার অন্যতম বিষয় ছিল ছাত্র ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন থেকে শুরু করে সর্বপ্রকার গণসংগঠন বর্জন। আজন্ম সংশোধনবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে যে অর্থনীতিবাদী চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে তার থেকে সি. পি. আই. ( এম-এল ) এই ভুল সিদ্ধান্ত করে বসে যে অর্থনৈতিক সংগ্রামেরই কোন প্রয়োজন নেই। শুধু অর্থনৈতিক সংগ্রাম নয়, এই পার্টিটি নৈরাষ্ট্রবাদীদের প্রতিধ্বনি করে সমস্ত ধরনের গণআন্দোলনকেই অপ্রয়োজনীয় বলে প্রচার করে। প্রকৃত মার্কসবাদী মাত্রই জানেন, সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যতীত সমাজ পরিবর্তনের অন্য কোন পথ নেই। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রাম হল শ্রেণী-সংগ্রামের উচ্চতম রূপ। তাই সশস্ত্র সংগ্রাম মুক্তির একমাত্র উপায় হলেও প্রয়োজনীয় গণআন্দোলনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এঁরা নৈরাষ্ট্রবাদী ভাবধারায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে সহজেই বিস্মৃত হলেন মাও সে-তুং-এর সেই অতিপরিচিত উক্তিটি, "অবশ্য সশস্ত্র সংগ্রামের ওপর জোর দেওয়ার অর্থ সংগ্রামের অন্যান্য রূপ বা ধরন বর্জন করা নয়, বরং ঠিক উল্টোটি, অর্থাৎ অন্যান্য ধরনের সংগ্রামের সঙ্গে সমন্বয় না থাকলে সশস্ত্র সংগ্রাম সফল হতে পারে না।"[১০] আসলে নবপ্রতিষ্ঠিত কমিউনিষ্ট পার্টিটি মাও সে-তুং বিচারধারার প্রতি মৌখিক

আনুগত্য জানালেও কার্যতঃ তাদের প্রতিটি কার্যকলাপই ছিল মাও চিন্তার বিরোধী কাজ। এই কারণেই এরা মাও-এর গেরিলাযুদ্ধ সম্পর্কিত চিন্তাব অপব্যাখ্যা করে প্রচার করেছিল—'গেরিলাযুদ্ধ একমাত্র কৌশল'-এর তত্ত্ব। এই পার্টিটি একটি পাতিবুর্জোয়া পার্টি হওয়ার ফলে, বাস্তবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব অস্বীকার ক'রে, গণসংগঠন ও গণ-আন্দোলন বর্জন ক'রে, এরা সর্বকালের নৈরাষ্ট্রবাদীর মত গুপ্ত হত্যাকেই একমাত্র বিপ্লবী কাজ বলে চিহ্নিত করে। এদের গেরিলাযুদ্ধ নামক গুপ্ত হত্যার আসল অনুপ্রেরণা যে চে-দেব্রের 'এ্যাকশন' ভিত্তিক শহুরে গেরিল্লাযুদ্ধ তা কারুর কাছে অস্পষ্ট নয়। ওই তথাকথিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিটির প্রকৃত দর্শন নৈরাষ্ট্রবাদ ছিল বলেই আদর্শ নৈরাষ্ট্রবাদীর মত এদের পক্ষে প্রচাব করা সম্ভব হয়েছিল—"সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পবিণত করুন।"

মার্কসবাদের প্রথম যুগ থেকে মার্কসবাদীরা সর্বপ্রকাবের বুর্জোয়া চিন্তা-ধারার বিরুদ্ধে নিরন্তর মতাদর্শগত সংগ্রাম করেই মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই সমাজ-পরিবর্তনের প্রশ্নে বিভিন্ন বুর্জোয়া তত্ত্ব ও শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির অভ্যন্তরে বুর্জোয়া চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম সর্বকালের মার্কসবাদীদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ কারণেই লেনিন বলেছেন, "আমাদের মধ্যে সোস্যাল ডেমোক্রেসির মহান আন্দোলনের মাত্র **দুটি** রূপ (রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক) দেখাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এঙ্গেলস কিন্তু সেটা করেন নি—তিনি দেখেছেন **তিনটি, প্রথম দুটির সঙ্গে যোগ করেছেন তত্ত্বগত সংগ্রামকে**।[১৪] এই তত্ত্বগত সংগ্রামের ওপর এঙ্গেলস কতটা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বোঝা যায় তাঁর বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানে। এঙ্গেলস-এর মতে তদানীন্তন বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের ব্যর্থতার মূল কারণ কি? 'জার্মানীতে কৃষক বিদ্রোহ' পুস্তকে তিনি বললেন, "ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন ইউনিয়নের নিজস্ব সংগঠন অপূর্ব হওয়া সত্ত্বেও প্রধানত সমস্ত তত্ত্বের ওপর উদাসীনতার ফলেই এখানকার শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতির এত মন্থরতা,"।[১৫] ভাবতবর্ষে এমনিতেই সংশোধনবাদী প্রভাবে তত্ত্বগত প্রশ্নে মার্কসবাদীদের এক করুণ অবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। তারপর যখন বিপ্লবী লাইনের বিরোধিতা করার জন্য সংশোধনবাদীরা জোটবদ্ধভাবে একদিকে মার্কসবাদের মূল

সত্যগুলোকে ও মাও সে-তুং চিন্তাধারার অস্তিত্বকে অস্বীকার করল, এবং অন্যদিকে তাদের অগণিত পার্টি কর্মীদের মধ্যে মার্কসবাদ চর্চা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়ে এক ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করল, তখন এই তত্ত্বগত কাজটির গুরুত্ব যে আরও অনেকগুণ বেড়ে গেল তা যে কোন সুস্থ ব্যক্তিই স্বীকার করবেন। তাই সে সময় ভারতীয় বিপ্লবীদের অন্যতম কাজ ছিল, এঙ্গেলস ও লেনিন কর্তৃক উল্লিখিত সংগ্রামের তৃতীয় রূপটি, তত্ত্বগত সংগ্রামেব কাজটি, সর্বাধিক গুরুত্বের সঙ্গে পরিচালনা করা। আদর্শগত সংগ্রামকে অগ্রাধিকার দেওয়াতে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করতে পারেন ; কিন্তু আদর্শগত জয় ভিন্ন যে বাকি দুটি সংগ্রামও সঠিক পথে এগোয় না—বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনই তার জাজ্বল্য প্রমাণ। সে কারণেই নকশালবাড়ী ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ে বিপ্লবী লাইনের অনুগামীদেব প্রধান কাজ ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে মাও সে-তুং চিন্তাধারা, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ, সশস্ত্র বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবীত্ব, অর্থনীতিবাদ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে মতাদর্শগত সংগ্রাম দ্বারা সমস্ত ধরনের সংশোধনবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচন। আর এই একই প্রশ্নে বিপ্লবীদের দ্বিতীয় কাজটি ছিল সর্বস্তরের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ব্যাপক চর্চার সূত্রপাত করা। কারণ এই তত্ত্বগত সংগ্রাম ও অবিকৃত মার্কসবাদী মতবাদের অবিরাম প্রচারের ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হত, তাতে যেমন সাধারণ মানুষের এক বৃহৎ সংখ্যা ক্রমশঃ সংশোধনবাদ বর্জন করে বিপ্লবী মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হতেন, তেমনি তাঁদের বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় একটা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীও গড়ে উঠত। আর এই প্রক্রিয়ার ফল হিসাবে বিপ্লবী কর্মী ও সাধারণ মানুষের মনে মার্কসবাদ লেনিনবাদ সম্পর্কে যে গভীর আস্থার সৃষ্টি হত তার মূল উৎপাটন শাসকশ্রেণীর পক্ষে প্রায় অসাধ্য হয়ে দাঁড়াত। প্রকৃতপক্ষে ১৯১৯ সাল থেকে বিভিন্ন গ্রুপগুলি অল্প মাত্রায় হলেও এই কাজটি শুরু করেছিলেন, এবং সে বিষয়ে সর্বভারতীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটির ( যা থেকে সি. পি. আই. (এম-এল) গঠিত হয় ) ভূমিকাও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় সি. পি. আই. (এম-এল) পার্টিটি স্থাপনাকাল থেকেই সমস্ত তত্ত্বগত প্রশ্নকে চরম অবহেলা করতে থাকে এবং অবশেষে ভারতীয় সংশোধনবাদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তারা সর্বপ্রকার তত্ত্বগত আলোচনা সম্পূর্ণ বন্ধ করে

দেয়। চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় মাও সে-তুং-এর একটি উক্তি ছিল "The more you study, the more stupid you become. You are now at a crucial time of transition ; you must learn the right way."১৬

অর্থাৎ এর সরল বাংলা হল, "তুমি যত পড়বে, তত নির্বোধ বা বোকা হবে। তোমরা এখন যুগসন্ধিক্ষণের এক কঠিন মুহূর্তে আছ, তোমাদের অবশ্যই সঠিক পথ চিনে নিতে হবে।" একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে মাও-এর 'বই পূজা চলবে না' যে উদ্দেশ্যে রচিত, সেই একই উদ্দেশ্যে বর্তমান উক্তিটি। মাও কোন্ উদ্দেশ্যে 'বই পূজা চলবে না' রচনা করেছিলেন? মাও সে-তুং-এর এই প্রবন্ধের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল প্রধানতঃ সেই সমস্ত বুদ্ধিজীবী যাঁরা চীনা সমাজের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের চেষ্টা না করে কেবলমাত্র কিছু মার্কসবাদী পুস্তক কণ্ঠস্থ করা এবং সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতশূন্য আবৃত্তিকেই সঠিক বিপ্লবী কাজ বলে মনে করতেন। এই ধরনের বুদ্ধিজীবীরা যেহেতু বাস্তব সমস্যাবলী জানেন না এবং জানার চেষ্টাও করেন না, সেহেতু তাঁদের পক্ষে অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগও সম্ভব হয় না। বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে এই অজ্ঞতা ঢাকার জন্যই এঁরা বইকে অভ্রান্ত মনে করেন। মাও সে-তুং চীনের পার্টিতে এই শ্রেণীর বই পড়ুয়াদের সম্পর্কে বলছেন,

যে যত পড়ে
সে তত মূর্খ হয়?

"যা কিছু বইতে লেখা আছে সব ঠিক—এই হচ্ছে এখনো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর চীনা কৃষকদের মনোভাব। আশ্চর্যের বিষয়, কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যেও এমন লোক আছেন যারাও কোন বিষয় আলোচনার সময় সব সময় বলে থাকেন, 'বইয়ে কোথায় লেখা আছে আমাকে দেখান।'

"শুধুমাত্র বই থেকে সমস্ত সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করার পদ্ধতি ঠিক এইরূপভাবেই অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং এমনকি প্রতিবিপ্লবের পথেও নিয়ে যেতে পারে। তার স্পষ্ট প্রমাণ, সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছিলেন শুধু বই থেকে, এমন দলের পর দল চীনা কমিউনিস্টরা প্রতিবিপ্লবী হয়ে গেছেন। আমরা বলি মার্কসবাদ সঠিক, কিন্তু সঠিক এজন্য নয় যে, মার্কস ছিলেন একজন 'পয়গম্বর'—তা এই জন্য সঠিক যে আমাদের কর্মের ও আমাদের সংগ্রামের মধ্যে তার তত্ত্ব সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। লড়াই চালাতে গেলে আমাদের মার্কসবাদের

সঙ্গে অধ্যয়নকে যুক্ত করতে উপদেশ দেওয়া। আর যে সব বুদ্ধিজীবী শুধুমাত্র বই থেকে সমাজবিজ্ঞান আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন এবং যাঁদের সামাজিক গতি-প্রকৃতি, নিয়মাবলী, শ্রেণীসংগ্রাম প্রভৃতি সম্পর্কে কোন সম্যক উপলব্ধি নেই, তাঁদের পড়া যে কোন সত্যকার জ্ঞানলাভে সাহায্য না করে আরও নির্বোধ করে তোলে তাতে কি কোন সন্দেহ আছে? এই জন্যই সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলাকালীন চীনের পার্টির একটি বিঘোষিত নীতি ছিল বুদ্ধিজীবীদের বৃহৎ সংখ্যায় উৎপাদন প্রথায় প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের জন্য উৎসাহদান। আর এইভাবেই চীনা বুদ্ধিজীবীরা জনগণের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পুস্তক থেকে আহৃত বিদ্যাকে প্রকৃত জ্ঞানে পরিণত করতেন।

কিন্তু ভারতীয় নৈরাষ্ট্রবাদীরা মাও সে-তুং-এর এই উক্তিটির কি ব্যাখ্যা করলেন? তাঁরা ভাবলেন যখন 'যে যত পড়ে সে তত মূর্খ হয়', তখন অধ্যয়ন সম্পূর্ণ বন্ধ করাই বুঝি মূর্খ হওয়ার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার একমাত্র পথ। তাই দেওয়ালগাত্রে লেখা হল—'যে যত পড়ে সে তত মূর্খ হয়', আর ফর্মান জারী হল 'রেড বুক' ও মাও-এর তিনটি লেখা ভিন্ন পার্টি কর্মীদের অন্য কিছু পড়া অনাবশ্যক। সি. পি. আই. (এম-এল) চেয়ারম্যান চারু মজুমদার লিখলেন, শুধুমাত্র 'রেডবুক' ও 'তিনটি লেখা' বেশী করে অধ্যয়ন করতে হবে। আর সেই বাণীকে বাস্তব রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'দেশব্রতী' পত্রিকায় " 'নকশালবাড়ীর কষ্টিপাথরে মার্কসবাদী কারা' পুস্তিকা সম্পর্কে" ঘোষণা করা হল, "……'ভারতের বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করে এগিয়ে চলুন' নামক প্রবন্ধে কমরেড চারু মজুমদার এই মুহূর্তে একমাত্র চেয়ারম্যান মাও-এর 'উদ্ধৃতি' এবং 'তিনটি লেখা'কে অবলম্বন করে রাজনৈতিক পাঠ্যক্রমের যে নতুন ধারার কথা বলেছেন, তদনুযায়ী ঠিক এই ধরনের তত্ত্বভিত্তিক পুস্তিকার প্রকাশ আপাততঃ বন্ধ রাখা হয়েছে।"[২০]

একইভাবে এই পার্টিটি বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করল তাও সম্পূর্ণ মার্কসবাদ বিরোধী। "বুর্জোয়া শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই"—প্রচার করে নৈরাষ্ট্রবাদীরা একটা গোটা প্রজন্মের শিক্ষাগত মানের যে চূড়ান্ত অধঃপতন ঘটাল তা কার্যতঃ প্রতিবিপ্লবীদের সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক অধঃপতন ঘটান'র পরিকল্পনাকেই সফল করে তুলল। আবার অন্যদিকে শুধুমাত্র মাও-এর 'তিনটি লেখা' ও 'রেড বুক' অধ্যয়নের সুপারিশ কিন্তু তাদের বই

পূজার দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রকাশ। কারণ মৌলিক মার্কসবাদ অধ্যয়ন না করে যারা কেবল এই কয়টি লেখা পড়ে তাদের কোনমতেই মার্কসবাদ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা গড়ে উঠতে পারে না। আর যেহেতু তারা মাও-এর মূল লেখা ব্যতিরেকে কেবলমাত্র 'রেডবুক' পড়ে, তাদের পক্ষে যে উদ্ধৃতিগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি কবা আদৌ সম্ভব নয় সে বিষয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। প্রকৃতপক্ষে নৈরাষ্ট্রবাদীরা এই বই পূজার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল বলেই তারা নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তি, তত্ত্ব ও তথ্যের উপর নির্ভর না করে, শুধুমাত্র কতিপয় সি. পি. আই. (এম-এল) মুরুব্বী লিখিত মার্কসবাদ বিরোধী লেখাগুলিকেই অভ্রান্ত মনে করতেন। এইভাবে একদিকে বুর্জোয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন সম্পূর্ণ বর্জন ও অপরদিকে মৌলিক মার্কসবাদ সম্পর্কে চবম উদাসীনতার ফলে নৈরাষ্ট্রবাদীরা ভারতীয় বিপ্লবীদের সচেতনতা-স্তরেব যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে সে ভুলেব মাশুল আমবা আজও দিয়ে চলেছি। আর পরিণামে মাও-অনুগামী বলে পবিচিত এই সব ব্যক্তিদেব বাস্তব কার্যকলাপ ও মাও-এর উদ্ধৃতিব অপব্যাখ্যা মাও-চিন্তাধারার প্রসারের পরিবর্তে মাও সে-তুং-এর উজ্জ্বল ভাবমূর্তিটি জনগণেব সামনে কলঙ্কিতই করে তুলল।

এই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিটিই মাও সে-তুং বিচারধাবার মুখোশ পরে ভাবতবর্ষে সর্বপ্রথম তথাকথিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তত্ত্বটি আমদানি কবে। মূর্তিভাঙার রাজনীতির তাত্ত্বিক নেতা শ্রীসরোজ দত্ত প্রমাণ কবতে সচেষ্ট হয়েছিলেন যে এই মূর্তিভাঙাই নাকি সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব। এ প্রসঙ্গে

সর্বহারা সংস্কৃতিক বিপ্লব ও মূর্তিভ'ঙা

তিনি লিখেছেন, "সংশোধনবাদীরা প্রমাণ কবল, বাংলার যুবশক্তির এই মূর্তিভাঙ্গা ও স্কুল কলেজ ভাঙ্গার অভিযানকে নিন্দা করতে হলে কান টানলে মাথা টানাব মত চীনেব মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নিন্দা অনিবায্যভাবেই এসে যায়। অতএব যাঁরা বিপ্লবের স্তর ইত্যাদি নানা তত্ত্বের অবতারণা করে একই সঙ্গে চীনেব সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে অভিনন্দন এবং বাংলার যুব ছাত্রদের এই কায্যকলাপেব ধিক্কার জানাচ্ছেন আশা করি তারা প্রতিবিপ্লবী সি. পি. এমের এই সংশোধনবাদী তাত্ত্বিক কসরৎ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন।"[২১] সাধু! সাধু! দত্তমশাই, আপনি এই একটি অনুচ্ছেদেই আপনার নৈরাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারা

অতি চমৎকারভাবে প্রকাশ করে ফেলেছেন। সত্যিই ত' একমাত্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরাই বিপ্লবের স্তর বিচার করে থাকেন, কিন্তু চে-দেব্রের তত্ত্বে বিপ্লবের স্তর বিচারের কি প্রয়োজন? যে কোন মুহূর্তই 'এ্যাকশন'-মুহূর্ত। যদিও আমরা আগেই দেখেছি যে বর্তমান ভারতীয় সমাজে সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রশ্ন হাস্যকর ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু 'শশাঙ্ক'র পরামর্শমত আপাততঃ বিপ্লবের স্তর নির্ধারণের বিষয়টি স্থগিত রাখা গেল। তা না হলে আবার 'অতিসূক্ষ্ম সংশোধনবাদ'-এর দায়ে দোষী হতে হবে। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া যায় যে বর্তমান ভারতেও উল্লিখিত সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনা করা সম্ভব, তাহলেও প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক—কি ভাবে সেটি প্রয়োগ করা যাবে? মূর্তিভাঙা বা স্কুল-কলেজ ভাঙা কি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে? দেখা যাক মাও সে-তুং-এর পরিচালনায় চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি কোন অস্ত্রটিকে বেছে নিয়েছিল।

১৯১৯ সালের ৮ই অগাষ্ট চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে যে ষোল দফা দলিল প্রচার করেন, তার প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "পার্টির অষ্টম কেন্দ্রীয় কমিটির দশম প্লেনারী অধিবেশনে কমরেড মাও সে-তুং বলেছেন, : একটি রাজনৈতিক ক্ষমতাকে উৎখাত করতে হলে সবসময় সবার আগে প্রয়োজন জনমত সৃষ্টি করা, আদর্শগত ক্ষেত্রে কাজ করা। বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী উভয় শ্রেণীর ক্ষেত্রেই এটি সত্য। বাস্তবে কমরেড মাও সে-তুং-এর এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

"যদিও বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করা হয়েছে, কিন্তু এরা এখনও শোষকশ্রেণীর পুরাণো ধ্যানধারণা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও অভ্যাসগুলোকে কাজে লাগিয়ে জনগণকে কলুষিত করার চেষ্টা করছে; তাদের মন জয় করার চেষ্টা করছে এবং ক্ষমতায় ফিরে আসার চেষ্টা করছে। শ্রমিকশ্রেণীকে এর ঠিক উল্টোটাই করতে হবে : মতাদর্শগত ক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের প্রতিটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নতুন ধ্যানধারণা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, অভ্যাস ইত্যাদি ব্যবহার করে সমগ্র সমাজের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন করতে হবে। বর্তমানে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত যে সব ব্যক্তি ধনতন্ত্রের পথ গ্রহণ করছে, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ও তাদের উৎখাত করা;

প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থার 'কর্তৃপক্ষ'কে এবং বুর্জোয়া ও অন্যান্য শোষক শ্রেণীগুলির মতাদর্শকে সমালোচনা করা, নাকচ করা এবং শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প ও উপরিকাঠামোর অন্যসব দিকগুলো, যেগুলো সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, সেগুলোর রূপান্তর সাধন করা, যাতে করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয় এবং তার বিকাশ সাধন আরও সহজ হয়ে ওঠে।"২২

চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এই ঐতিহাসিক দলিলটির ১৪নং দফায় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রধান উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে— **"মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য হল জনগণের মতাদর্শের বিপ্লবীকরণ**, সাথে সাথে এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কাজের সমস্ত ক্ষেত্রে আরও বিরাট, আরও দ্রুত, আরও ভালো এবং আবও বেশী বেশী অর্থনৈতিক ফললাভ করা।"২৩ ( বড হরফ আমাদের )

সুতরাং বলা যেতে পারে চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চীনা সমাজের উপরিকাঠামোব যে যে অংশ সমাজতান্ত্রিক অর্থনেতিক ভিত্তির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, সেগুলির ধ্বংস সাধন। কারণ চীনা সমাজতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া উপবিকাঠামোর যে উপাদানগুলি চলে এসেছে, সেগুলি সততই জনগণের এক বিরাট অংশেব চিন্তাধাবা, মানসিকতা প্রভৃতিকে প্রভাবিত করে থাকে। আর জনগণের মধ্যে এই বুর্জোয়া মানসিকতা, অভ্যাস, মূল্যবোধ প্রভৃতির উপস্থিতি শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টিই করে না, এমনকি এটি প্রাপ্তবয়স্ক সমাজতান্ত্রিক সমাজেও পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র রাষ্ট্র ও সমাজে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। তাই সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনীতিব গতিকে অব্যাহত রাখার জন্যই প্রয়োজন জনগণেব আদর্শ ও মানসিকতার বিপ্লবীকরণ। অর্থাৎ যদিও প্রত্যেক বিপ্লবেব মত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সঙ্গেও রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলের প্রশ্নটি জডিত, কিন্তু **এই বিপ্লব হচ্ছে প্রধানতঃ মতাদর্শগত ; আর তার প্রধান অস্ত্র হল মতাদর্শগত সংগ্রাম।** কারণ একমাত্র মতাদর্শগত সংগ্রাম দ্বারাই জনগণের মধ্যে যুগযুগান্তরের সঞ্চিত অসমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও প্রাত্যহিক অভ্যাসের পরিবর্তন করা সম্ভব। তাই এই বিপ্লবে শ্রামিকশ্রেণীর প্রধান কর্তব্য—তার দর্শন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সে-তুং বিচারধারার সাহায্যে অন্যান্য

শোষকশ্রেণীর মতাদর্শের বিরুদ্ধে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম দ্বারা জনগণের মধ্যে সর্বহারা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা।

এই বিপ্লবের মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণী কমিউনিষ্ট পার্টি ও রাষ্ট্রে অবস্থিত বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন, সুবিধাবাদী, সংশোধনের অযোগ্য ব্যক্তিদের বহিষ্কার ক'রে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সুরক্ষিত করে। চীনে শ্রমিকশ্রেণী যেমন পোষ্টার, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, চিত্রশিল্প, বিতর্কসভা প্রভৃতির মাধ্যমে বুর্জোয়াশ্রেণীর শিক্ষা, দর্শন, আচার-ব্যবহার, মানসিকতার উপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন, তেমনি পার্টি ও রাষ্ট্রের উপরতলা থেকে নীচুতলার প্রতিটি কর্মীকে বাধ্য করেছিলেন জনগণের সমালোচনার সম্মুখীন হতে। আর সর্বস্তরের চীনা জনগণও অনুপ্রাণিত হয়ে এই বিপ্লবে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ ক'রে সমগ্র চীনা সমাজে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। এই বিপ্লব প্রধানতঃ মতাদর্শগত ছিল বলেই আদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে কখনও বলপ্রয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এমন কি অত্যন্ত দোষী ব্যক্তিকেও আত্মসমালোচনা ও আত্মসংশোধনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে মাও সে-তুং-এর শিক্ষাই হল—"**ঐ সব পার্টি বিরোধী ও সমাজতন্ত্র বিরোধী একগুঁয়ে ব্যক্তি— যারা পুনঃপুনঃ শিক্ষাদানের পরও নিজেদের ত্রুটি** সংশোধন করতে অস্বীকার করে, তাদের ছাড়া অন্যান্যদেব ভুল সংশোধন **করতে দিতে হবে এবং তাদের অপরাধের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে উৎসাহিত করতে হবে।**"[২৪] কিন্তু যখন রাষ্ট্র ও পার্টিব অভ্যন্তবে অবস্থিত পুঁজিবাদী পথের পথিকরা এই বিপ্লব ব্যর্থ কবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিল এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্ষমতার প্রয়োগ করেছিল, তখন শ্রমিকশ্রেণীও সশস্ত্র সংগ্রামের সাহায্যে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতাদখল করতে বাধ্য হয়েছিল। এই কারণে অন্যান্য বিপ্লবের মত সাংস্কৃতিক বিপ্লবটিও ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা-দখলের লড়াই।

কিন্তু ভারতীয় মূর্তিভাঙার প্রচারকরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কি ব্যাখ্যা করল? বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কোন নৈরাষ্ট্রবাদীর পক্ষেই ব্যাপক জন-সমাবেশের মাধ্যমে কোন কাজ করা সম্ভব নয় এবং কোন ধরনের মতাদর্শগত সংগ্রামই তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তাই

তথাকথিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রচারকরা নৈরাষ্ট্রবাদীদের মতই প্রকৃত প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শ ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম ও জনগণের আদর্শের বিপ্লবীকরণের বিকল্প হিসাবে বেছে নিয়েছে সব থেকে সহজ পদ্ধতি—বিভিন্ন ব্যক্তির মূর্তিভাঙা ও স্কুল-কলেজ পোড়ানো। এই মূর্তিভাঙার কাজটিও তারা করে থাকে তাদের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে। রাতের অন্ধকারে জনগণের চোখের আড়ালে নিঃশব্দে দু'একজন ব্যক্তির মূর্তি ভেঙে সরে পড়াকেই তারা বিপ্লবী কাজ বলে মনে করে। বলাবাহুল্য, কোন্ ব্যক্তি যথার্থ প্রতিক্রিয়াশীল আর কোন্ ব্যক্তি প্রগতিশীল—সে বিচার করার জন্য যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রয়োজন সেটি নৈরাষ্ট্রবাদীদের না থাকাতে তাদের অবৈজ্ঞানিক, একপেশে চিন্তাধারা অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তিকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিতে অসুবিধে হয় না। আর যেহেতু তারা কখনও যুক্তি-তথ্য উপস্থাপিত করে না, ফলে যে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা কল্প-কাহিনী তৈরি করাতেও এই নীতিহীনদের নীতিতে বাধে না। এই কারণেই দেখা যায় যে সরোজ দত্তর মত প্রবীণ নেতাও বিভিন্ন উদ্ভট তথ্য পরিবেশন করতে দ্বিধা করেন নি। যেমন, বিদ্যাসাগর নাকি সিপাহী বিদ্রোহের সময় স্বেচ্ছায় সংস্কৃত কলেজকে বিদ্রোহ-দমনের জন্য সেনানিবেশে পরিণত করেছিলেন; অথবা "গান্ধীঘাট তৈরী করা হয়েছে মঙ্গল পাঁড়ের পূণ্যস্মৃতি মুছে দেওয়ার জন্য।"[২৫] এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক প্রমাণ দাবী করুন, তখনই 'শশাঙ্ক'র কলমে হয়ে যাবেন 'শুয়োরের বাচ্চা' অথবা 'অতি-সূক্ষ্ম সংশোধনবাদী'।

কিন্তু অন্য কোন পথ গ্রহণ না করে এরা মূর্তিভাঙার পথ বেছে নিল কেন? কারণ একটিই, এবং সেটি হল: নৈরাষ্ট্রবাদীরা তাদের যে ব্যক্তিবাদী চিন্তাধারার ফলে ব্যক্তি হত্যা করে সমাজে শোষণ দূর করতে চায়, সেই চিন্তাধারা অনুযায়ীই ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাঁদের মূর্তি ভেঙে তারা প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চায়।

বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে জনরোষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ নানারূপ গ্রহণ করলেও একটি সুচিন্তিত এবং পরিকল্পিত রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে মূর্তিভাঙা প্রায় নজিরবিহীন। এ পর্যন্ত 'কালাপাহাড়'ই এ বিষয়ে অনন্য ছিলেন। অবশ্য কালাপাহাড়ের মূর্তিভাঙাকে বুর্জোয়া

ঐতিহাসিকরা এক উন্মাদ মানুষের খামখেয়ালীপনা বলে চিত্রিত করলেও সেটি ছিল শোষিত ও নির্যাতিত মানুষের ক্ষোভেরই প্রকাশ। ক্রুশ্চেভ সংশোধনবাদী কর্তৃক স্তালিনের মৃতদেহ অপসারণই বোধ হয় আধুনিক কালে প্রথম সচেতনভাবে মূর্তিভাঙা। ভারতীয় নৈরাষ্ট্রবাদীরা কোন্ স্থান থেকে মূর্তি-ভাঙার কৌশলটি উদ্ভাবন করেছেন সেটি বলা কঠিন হলেও এই মূর্তিভাঙার আরও একটি নজির এই শতাব্দীর ষাটের দশকেই পাওয়া যায়। প্রত্যেক বিপ্লবের সময় যেমন ক্ষুব্ধ জনগণ কিছু কিছু মাত্রাতিরিক্ত কাজ করেন, চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ও এই ধরনের বেশ কিছু ঘটনা ঘটে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় যে সব মাত্রাতিবিক্ত কাজ হয় তার মধ্যে অন্যতম হল চীনের পুরুষানুক্রমিক পূজাবেদীর মূর্তি অপসারণ করে মাও-এর প্রতিমূর্তি স্থাপন। এ সম্পর্কে যে সংবাদটি প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয়, "লালরক্ষীরা ২৩শে অগাষ্ট পিপিং-এর খৃষ্টান গীর্জাগুলিকে অপবিত্র করে। তারা পূজ্যমূর্তিগুলিকে অপসারিত ক'বে মাও সে-তুং-এর আবক্ষমূর্তি প্রতিস্থাপিত করে।"[২৬] শুধুমাত্র পূজাবেদীর মূর্তি অপসারণ নয়, এমন কি কনফুসিয়াসের স্মৃতিস্তম্ভও এসময় আক্রান্ত হয়। বেজিং থেকে ছ'শ কিলোমিটার দূরে, কনফুসিয়াসের স্মৃতিস্তম্ভটি এক শ্রেণীর লালরক্ষীরা এতই ক্ষতিগ্রস্ত করে যে সেটি পুনরুদ্ধারের জন্য বর্তমান চীনা সরকারকে প্রায় ৬৪০,০০০ ডলার ব্যয় করতে হচ্ছে।[২৭]

বলাবাহুল্য চীনের পার্টি এই ধরনের কাজকে কোনদিন সমর্থন করেনি। যদিও পূজাবেদীর মূর্তি অপসারণ করে মাও-মূর্তি প্রতিষ্ঠা লালরক্ষীরা কোন কোন ক্ষেত্রে বিপ্লবী আবেগে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই করেছিলেন, তবুও সন্দেহ করা যায় চীনে কোন কোন প্রতিবিপ্লবী চক্র সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে কলঙ্কিত করার জন্য এবং জনগণকে লালরক্ষী বাহিনী এবং মাও-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পরিকল্পনা করেছিল এটি ছিল তার মধ্যে অন্যতম। চীনে এইরকমই একটি প্রতিবিপ্লবী চক্র ছিল ১৬ই মে গ্রুপ, যাদের মাও-বিরোধী কার্যকলাপকে চীনের পার্টি বারবার নিন্দা করেছে। "সরকারী চীনা সূত্রগুলি সেপ্টেম্বরে একটি 'প্রতিবিপ্লবী' সংগঠনকে আক্রমণ করতে শুরু করে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তারা মাওবাদী নেতৃত্বের মধ্যে বিভেদ-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচার চালায়। এই সংগঠনকে '১৬ই মে গোষ্ঠী' রূপে চিহ্নিত করা হয়। এদের প্রধান কর্মস্থল ছিল পিকিং।"[২৮]

এই প্রতিবিপ্লবী গ্রুপটির অস্তিত্ব ও কার্যকলাপ সম্পর্কে হ্যান স্যুইনও উল্লেখ করেছেন: "আর একটি গোষ্ঠী, যাদের ১৬ই মে বলা হত, তারা এপ্রিল মাসে আত্মপ্রকাশ করল এবং তামাম চীনে কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল। মাও-এর ১৯৬৬ সালের ১৬ই মের দলিল অনুসারে এদের গোষ্ঠীর নামকরণ হয়েছিল। যেহেতু মে মাস বছরের পঞ্চম মাস, সেহেতু এরা ৫১৬ নামেও পরিচিত ছিল। এটি ছিল আধা গোপন সংস্থা, যার বৈশিষ্ট্য হল সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার এবং গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্তির সময় বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন। এই গোষ্ঠীটি বিশৃঙ্খলা উস্কিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে লিন পিয়াও-এর হাতের অস্ত্রে পরিণত হয়েছিল। অবশ্য ১৯১৯ সালের আগে এটি কারোরই জানা ছিল না।"[২৯]

উপরের এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে পরিষ্কার যে, যে সমস্ত প্রতিবিপ্লবী চক্র চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে ভিতর থেকে বিপথগামী করার কাজে তৎপর ছিল তার মধ্যে অন্যতম হল এই ১৬ই মে গ্রুপ বা ৫১৬ গ্রুপ। মনে রাখা প্রয়োজন এই চক্রের প্রধান উপদেষ্টা ছিল স্বয়ং লিন পিয়াও, যার ভূমিকা সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ অনুচর হিসাবে বিশ্ববাসীর সামনে আজ প্রমাণিত সত্য। তাই ১৬ই মে গ্রুপটিকে শুধু প্রতিবিপ্লবী হিসাবে চিহ্নিত করাই যথেষ্ট নয়, নিঃসংশয়ে এটি ছিল সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদপুষ্ট একটি চক্র। এরা ঠিক লিন পিয়াও-র মতই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরোধিতা করত মাও সে-তুং চিন্তাধারার মুখোশ পরে। লিন যেমন 'রেডবুক' হাতে না নিয়ে চলতে পারত না, এরাও তেমনি মাও-এর নাম জপ করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করত এরা কতটা মাও-এর অনুগামী। মাও সে-তুং বিচারধারার আসল সত্যকে বিকৃত করে এরা মাওকে একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী চিন্তানায়ক থেকে ভাববাদী দেবতায় পরিণত করার চেষ্টা করেছিল। এই কারণে সাধারণ মানুষের মনে দেবতা সম্পর্কে যে ভয়মিশ্রিত ঘৃণা থাকে, মাও-এর প্রতি সেই বিদ্বেষ সৃষ্টি করার জন্য এই প্রতিবিপ্লবীরা যেমন সাধারণ মানুষদের মাও-এর প্রতিমূর্তির সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য করত, তেমনিই তারা বিভিন্ন স্থানে চীনের পার্টির অন্যান্য সদস্যের আলোকচিত্র অপসারণ করে মাও-এর আলোকচিত্র স্থাপন করত। আসলে এটা ছিল মাও-এর প্রতিমূর্তি স্থাপনের মধ্য দিয়ে মাও-এর ভাবমূর্তি

কলঙ্কিত করার এক অভিনব কৌশল। তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় অন্যান্য আলোকচিত্র বা প্রতিমূর্তির পরিবর্তে মাও-এর আলোকচিত্র বা প্রতিমূর্তি স্থাপনের যে ঘটনাগুলি ঘটেছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে লালরক্ষীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই ঘটনাগুলিতে অংশগ্রহণ করলেও সেগুলি ছিল মাও সে-তুং চিন্তাধারাকে জনগণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের এক সুপরিকল্পিত ও ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। ৫১৬ গ্রুপের কার্যাবলী সম্পর্কে হ্যান সুইনের বিবরণ এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। "৫১৬ গোষ্ঠীটি মাও সম্পর্কে একটি পৌত্তলিক মতবাদ গড়ে তোলে এবং এ ব্যাপারে যারই সায় ছিল না তাকেই আক্রমণ করে। এই মতবাদ আধা-ধর্মীয় বিষয়গুলিকে গ্রহণ কবতে শুরু করেছিল; 'চেয়ারম্যান মাও-এর প্রতি আনুগত্য' ছিল তাদের বিচারের কষ্টিপাথর। লিন পিয়াও বলেছিল যে, 'যতক্ষণ একজন সঠিক পথে ( Orientation ) আছে, ততক্ষণ সে কি করে না করে তাতে কিছু যায় আসে না।' এবং এই উক্তিটি ৫১৬ গোষ্ঠীটিকে যা খুশী তাই করার জন্যে সম্মতি দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। প্রত্যেকটি জায়গায় জনতাকে মাও-এর প্রতিমূর্তির সামনে জোর করে নত করানো হত। চিং কাংশান, সুনাই এবং বিপ্লবের অন্যান্য পীঠস্থান থেকে, লিন পিয়াও ও মাও-এর ছবি ছাড়া, মাও-এর সহকর্মীদের সমস্ত ছবি অপসারিত করা হয়েছিল। কারণ লিন পিযাও হল মাও-এর একমাত্র বিশ্বাসী, ঘনিষ্ঠ কমরেড এবং 'যে কখনও একটি ভুলও করেনি'।"[৩০]

সুতরাং ভারতীয় মূর্তিভাঙার প্রচারকরা যে মূর্তিভাঙাকে সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব বলে দাবী করেছেন, সেই মূর্তিভাঙার সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না, এবং শ্রমিকশ্রেণী তার রাজনৈতিক আন্দোলনের সচেতন অস্ত্র হিসাবে কোন ক্ষেত্রেই মূর্তিভাঙা বা ঐ জাতীয় কোন কাজকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। শুধু তাই নয়, একথা আজ নিঃসংকোচে বলা যায় যে, মূর্তিভাঙা হল বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবীদের অস্ত্র। এ হল শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদের এক অভিনব কৌশল। কোন বিপ্লবী দল যদি প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামের পরিবর্তে মূর্তিভাঙাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে, তাহলে এই হাতিয়ার তাদের আসল উদ্দেশ্য সফল না করে

ঠিক তার বিপরীত ফলই সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষের বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাই এই মূর্তিভাঙা প্রকৃত প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির ক্ষতিসাধন না করে জনগণের মধ্যে বিপ্লবী আদর্শকেই ক্ষুণ্ণ করেছে, এবং সেই সুযোগে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বিহ্বল ও আতঙ্কিত জনগণের মধ্যে তাদের দালালদের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার নতুন করে প্রয়াস পেয়েছে। এইভাবে, অচেতনভাবে হলেও, ভারতীয় মূর্তিভাঙার প্রচারকরা শেষ বিচারে প্রতিবিপ্লবীদের চক্রান্তকেই সফল করতে সাহায্য করেছেন।

আজ মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিসহ ভারতের সমস্ত সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি এবং শাসকশ্রেণীর রক্ষিতা সংবাদপত্রগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে অবিরাম প্রচার করে চলেছে যে নকশালবাড়ীর আন্দোলন নাকি প্রথম থেকেই ছিল নৈরাষ্ট্রবাদী আন্দোলন। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা ত' নিজেরা কত বড় 'প্রফেট' তা প্রমাণ করার জন্য বলে বেড়ান যে, 'আমরা'ত প্রথম থেকেই বলেছিলাম নকশালবাড়ীর আন্দোলন হল বাম হঠকারী আন্দোলন, পরে'ত তাই প্রমাণিত হ'ল। আজ নকশালবাড়ীর আন্দোলনে ভীত শাসকশ্রেণী তার ভাড়াটিয়া লেখকদের দিয়ে নকশালবাড়ীর ও তৎপরবর্তী বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে চলেছে। কিন্তু প্রকৃতই কি নকশালবাড়ী আন্দোলনের প্রধান স্রোতটি ১৯৬৭ সাল থেকেই বাম হঠকরী ছিল? এই স্বল্প পরিসরে নকশালবাড়ীর প্রকৃত ঘটনা ও ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস বিবৃত করা সম্ভব না। তবুও কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য উপস্থিত না করলে বোঝা যাবে না যে প্রকৃত নকশালবাড়ীর আন্দোলন ও পরবর্তীকালে সি. পি. আই. (এম-এল)-এর নৈরাষ্ট্রবাদী কার্যকলাপের মধ্যে ভেদরেখাটি কি, এবং ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে নৈরাষ্ট্রবাদী প্রভাবের সূত্রপাত কোথায়। 'মার্কসবাদী' নেতারা যখন 'প্রফেট' সাজার নেশায় মশগুল, তখন নকশালবাড়ীর সূত্রপাত সম্পর্কে তাদের দৈনিক পত্রিকা 'গণশক্তি'তে প্রকাশিত সংবাদ থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে দেওয়াই বোধ হয় এই 'প্রফেট'দের স্বরূপ উন্মোচনের পক্ষে যথেষ্ট। অনেকেরই স্মরণে আছে যে নকশালবাড়ীতে সি. পি. আই. (এম) দলভুক্ত দার্জিলিং জেলার কয়েকজন অগ্রণী কমরেডের নেতৃত্বে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে ১৯৬৭

নকশালপন্থী আন্দোলনের প্রধান ধারা

সালের এপ্রিল মাসে। এ সম্পর্কে ৩রা মে'র গণশক্তিতে যে সংবাদটি প্রকাশিত হয় তাতে বলা হল, "শিলিগুড়ি, ২রা মে—দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ীর কৃষকগণ উচ্ছেদবন্ধের জন্য জোতদারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, স্থানীয় জোতদারগণ যুক্তফ্রন্ট সরকারের উচ্ছেদ-বিরোধী নীতি মানতে অস্বীকার করায় কিছুটা সংঘর্ষ হয়। জোতদারের বিরুদ্ধে কৃষকদের এই সংগ্রামকে কয়েকটি সংবাদপত্রে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্টদের অপকীর্তি হিসাবে চালাবার চেষ্টা করা হয় এবং স্থানীয় কমিউনিষ্ট নেতাদের উপর দোষারোপ করে সংবাদ প্রকাশিত হয়। স্থানীয় সকল দলের মিলিত সভায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের উচ্ছেদবিরোধী নীতির সমর্থনে প্রস্তাব পাকা করা হয়। তাঁরা মন্ত্রীদের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করে জানিয়েছেন—'এ সম্পর্কে আপনাদের হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন নাই।' সংবাদপত্রে বিকৃত ও অসত্য প্রচারের জন্য স্থানীয় জনগণ বিশেষ ক্ষুব্ধ" ( পৃঃ ২ )। এরপর ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয় এবং স্বীকার করা হয় যে কৃষকদের উপব জোতদারদের অত্যাচারের সময় কোন পুলিশবাহিনী আসেনি। এই দিনের গণশক্তির চতুর্থ পৃষ্ঠায় বলা হল : "কৃষকসভার পক্ষ হতে এই ঘটনা এবং পুলিশের কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করার বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীকে টেলিগ্রাম করা হয়।"

**গণশক্তি, ২৭শে মে :**

"নকশালবাড়ীতে পুলিশের হিংস্র আক্রমণে নারী ও শিশুসহ ৯ জন নিহত : বিভিন্ন মহল হতে পুলিশের গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা"

"সরকারী সূত্রে আজ রাত্রি পর্যন্ত প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ যে পুলিশ গুলি বর্ষণ ৯ জনকে নিহত করেছে। তার মধ্যে ৬ জন হলেন স্ত্রীলোক, শিশু ২টি। পুলিশ ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।" ( পৃঃ ১ )

সম্পাদকীয়তে বলা হল, "কয়েকটি গ্রামের গরীব কৃষকদের শায়েস্তা করার জন্য চারটি সশস্ত্র পুলিশের কোম্পানি পাঠাবার কোন প্রয়োজন ছিল কি? আমরা যতদূর সংবাদ পেয়েছিলাম—স্থানীয় জোতদার ও কৃষক উভয়পক্ষই ঘটনার একটা মিটমাট চেয়েছিলেন। তারপর অকস্মাৎ গ্রামের মধ্যে পুলিশ ফৌজ প্রেরণ ও পুলিশ-গ্রামবাসী সংঘর্ষ ঘটাবার কি কারণ ঘটেছিল তা এখনও জানা গেল না। সরকারী জমিবণ্টনের ব্যাপারে জোতদার ও কৃষকদের

মধ্যে এই বিরোধের একটি রাজনৈতিক সমাধান না করে পুলিশী হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হয়েছিল বলে আমরা মনে করি না।”

**গণশক্তি, ২৮শে মে :**

“নকশালবাড়ী হত্যাকাণ্ড : সরকার বিরোধী পুলিশ কর্তৃপক্ষের আর একটি চক্রান্ত, মীমাংসার সূত্র উপেক্ষা করে গ্রামাঞ্চলে পুলিশের হিংস্র প্ররোচনা”

“কলকাতা, ২৮শে মে—নকশালবাড়ীর সমগ্র ঘটনার মূলসূত্র হল—বুদ্ধিমান তির্কি নামক এক জোতদার দলবলসহ সরকারী জমির ঠিকা প্রজা বিগল কিসানকে জমি আবাদের সময় প্রহার করে এবং সংঘর্ষের সূত্রপাত এখানেই। এই জোতদারের দল সরকারের জমি বণ্টন নীতি অমান্য করায় ঐ অঞ্চলে গোলমালের উৎপত্তি হয়। তারপর সেচমন্ত্রী ও ভূমিরাজস্বমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের ফলে একটা মীমাংসার সূত্র উদ্ভাবিত হয়।……মীমাংসাব এই যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল তার সুযোগ না দিয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষ গ্রামে পুলিশ ফৌজ পাঠাতে নির্দেশ দেন এবং তার পূর্বে স্থানীয় যুক্তফ্রণ্ট দলনেতাদের জানানো হয়নি। ফলে ঘটনার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। কমিউনিষ্ট নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত শিলিগুড়ি থেকে ফিরে এসে এক সাক্ষাৎকারে এই জানান।” ( পৃঃ ১ )

“বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, যুক্তফ্রণ্ট সরকারের ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার এবং সেচমন্ত্রী বিশ্বনাথ মুখার্জী তাঁদের সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গ সফরকালে নকশালবাড়ীতে গিয়েছিলেন। নকশালবাড়ীতে মন্ত্রীদ্বয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে এবং সরকারী অফিসারদের সাথে দেখা করে সমস্যাগুলি মীমাংসার চেষ্টা করেছিলেন। নকশালবাড়ীর সমস্যা নিছক আইন শৃঙ্খলার সমস্যা নয়। একে অন্যান্য ঘটনাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। এঁরা সেইজন্যই আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই এর মীমাংসার সূত্র উদ্ভাবন করে এসেছিলেন। আলোচনায় সমস্ত এস. পি. ও অন্যান্য সরকারী অফিসাররাও উপস্থিত ছিলেন। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ফলে মীমাংসার বাস্তব অবস্থাও সৃষ্টি হয়েছিল। এই অঞ্চলের যুক্তফ্রণ্টের নেতৃবৃন্দও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসাই চেয়েছিলেন।

—৩

এই পরিস্থিতিতে মীমাংসার সুযোগ বানচাল করার জন্যই নকশালবাড়ী অঞ্চলে পুলিশী তাণ্ডব শুরু হয়।”

কি বসু দাশগুপ্ত মহাশয়গণ। উপরের এই উদ্ধৃতিগুলি কি চিনতে অসুবিধা বোধ করছেন? হ্যাঁ, আপনাদের মুখপত্র দৈনিক ‘গণশক্তি’তেই এই তথ্যগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও খুব সঙ্গত কারণেই গণশক্তিতে এই ধরনের সংগ্রামের যথাযথ বিবরণ অসম্ভব, তবুও নকশালবাড়ীর আন্দোলনের সূত্রপাত এবং এ বিষয়ে আপনাদের মিথ্যাচার ও অপপ্রচার বোঝার জন্য যে কোন সৎ পাঠকের পক্ষে এই অসম্পূর্ণ তথ্যাবলীই যথেষ্ট।

কিন্তু একদা যে আন্দোলনকে সাধুবাদ না জানালেও তথাকথিত মার্কসবাদী নেতারা প্রকাশ্যে বিরোধিতা করার জন্য সাহস সঞ্চয় করতে পারেননি, সেই আন্দোলনটিই কি করে পরবর্তীকালে তাদের দৃষ্টিতে “বাম-হঠকারী আন্দোলন”, “সি. আই. এ.-র কাজ” হিসাবে পরিগণিত হল? ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে নকশালবাড়ীর ঘটনার তাৎপর্যই বা কি? আসলে সি. পি. আই. (এম) নামক পার্টিটির প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই পার্টির অভ্যন্তরে একটি বিপ্লবী অংশ অবস্থান করছিলেন, যাঁরা সেই সময়েই উপলব্ধি করেন যে দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টির মত এটিও একটি সংশোধনবাদী পার্টি, যার অভীষ্ট লক্ষ্য নির্বাচনের মাধ্যমে মন্ত্রীত্ব দখল, সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল নয়। ১৯৬৭ সালে সি. পি. এম.-এর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় যোগদান এঁদের এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবে প্রমাণ করে। তথাকথিত মার্কসবাদী পার্টিটি সংসদীয় মোহবৃদ্ধির জন্য যে “যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা—শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার” নামক তাসের ঘর তৈরী করেছিল তা কিন্তু নকশালবাড়ীর একটি ঘটনাতেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সর্বকালের সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটদের মত সি. পি. এম.-ও এই অবস্থায় দুমুখো নীতি অনুসরণ করে। মন্ত্রীত্ব হারাবার ভয়ে আতঙ্কিত সি. পি. এম. একদিকে শাসকশ্রেণীর আস্থা অর্জন করার জন্য তাদের ‘বিপ্লবী’ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মারফৎ নকশালবাড়ীতে পুলিশ প্রেরণ ক’রে কৃষকদের হত্যা করে, আর অপরদিকে পার্টি কর্মী ও বিপ্লবী জনগণকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করতে থাকে। ‘গণশক্তি’র উক্তিগুলি পার্টি কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত। প্রত্যেক সংশোধনবাদীর

বৈশিষ্ট্য হল সাধারণভাবে গণসংগ্রাম সম্পর্কে বাকচাতুরী করা এবং সংগ্রামের মুহূর্তে পিছু হঠা ও শাসকশ্রেণীর সঙ্গে আপোষরফার মাধ্যমে সংগ্রামকে বিনষ্ট করা। সংশোধনবাদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ওই 'মহাবিপ্লবী' পার্টিটির অন্যতম কর্ণধার হরেকৃষ্ণ কোঙার মহাশয় তাঁর সংশোধনবাদী সহচর বিশ্বনাথ মুখার্জীর সাহচর্যে সংগ্রামকে স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যে কি পরিমাণ 'মীমাংসা'র (না শ্রেণী-সমন্বয়ের?) প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, তা আমরা গণশক্তির পৃষ্ঠাতেই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সংশোধনবাদীদের পক্ষে দুঃখজনক হলেও সত্য যে নকশালবাড়ীর আন্দোলন তাদের পরিকল্পিত পথে অগ্রসর না হয়ে, শ্রেণী সমন্বয়ের নীতির পরিবর্তে ঊর্দ্ধে তুলে ধরল সশস্ত্র ক্ষমতার মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চিরন্তন মার্কসবাদী সত্যটিকে। নকশালবাড়ীর কৃষক সংগ্রামের একটিমাত্র আঘাতেই বিপ্লবী কর্মীদের সামনে সংসদীয় রাজনীতি ও ভারতীয় সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের প্রকৃত স্বরূপটি উন্মোচিত হয়ে পড়ল। একথা ঠিকই যে গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে তেলেঙ্গানার সংগ্রাম নকশালবাড়ীর তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল, কিন্তু সে সংগ্রাম সংশোধনবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতায় পরিশেষে **আঞ্চলিক** পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়। অপরপক্ষে নকশালবাড়ীর ঘটনা তেলেঙ্গানার তুলনায় একটি ক্ষুদ্র এলাকার সংগ্রাম হলেও, এ আন্দোলন নকশালবাড়ীতে সীমাবদ্ধ না থেকে, **সর্বভারতীয়** ক্ষেত্রে যেভাবে মার্কসবাদ লেনিনবাদ মাও সে তুং চিন্তাধারার ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদ (সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ সহ) সামন্তবাদ বিরোধী ভারতীয় নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব (যার অন্তর্বস্তু কৃষি বিপ্লব) সম্পর্কে একটি সঠিক **সাধারণ লাইন** (জেনারেল লাইন) উপস্থাপিত করে, তা ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে একটি অভূতপূর্ব ঘটনারূপেই চিহ্নিত হয়ে রইল। এইখানেই নকশালবাড়ীর ঘটনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব। আর ঠিক এই কারণেই সংশোধনবাদী দৃষ্টিতে এটি একটি "বাম হঠকারী আন্দোলন" "সি. আই. এ.-র কাজ" প্রভৃতি। ১৯৬৭-৬৮র দিনগুলির দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যাবে যে নকশালবাড়ীর আন্দোলন যতই সঠিক বিপ্লবী লাইনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, সংশোধনবাদীদের উন্মত্ত আক্রমণের তীব্রতাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। নকশালবাড়ীর

আন্দোলনের ফলে ভারতীয় বিপ্লবীরা যে বিপ্লবী লাইন উপস্থিত করেন সেটি কিন্তু ভারতীয় বিপ্লব সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ( ফিনিস্‌ড ) বিপ্লবী তত্ত্ব ছিল না, আর তা হওয়াও সম্ভব ছিল না। কারণ ভারতীয় বিপ্লবের মত একটি জটিল বিষয়ের প্রত্যেকটি প্রশ্নের সমাধান দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময়ব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন বাস্তব বিপ্লবী কাজ ( রেভোলিউশনারী প্র্যাক্‌টিস ) এবং তত্ত্বগত সংগ্রাম। তাই নকশালবাড়ীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিপ্লবীরা যে লাইনটি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন তার মধ্যে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল, এবং সেগুলি হয়ত বা কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুতররূপও গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তা'হলে কি করে ঐ লাইনকে একটি সঠিক লাইন বলা যেতে পারে ? এটি একটি সঠিক লাইন বলার অর্থ হচ্ছে যে, নকশালবাড়ীর আন্দোলন সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংশোধনবাদী রাজনীতির পাশাপাশি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সে-তুং চিন্তাধারার মূল সত্যগুলিকে তুলে ধরেছিল ও ভারতীয় বিপ্লবের মূল চরিত্রটি উদ্‌ঘাটিত করেছিল। সেদিনের বিপ্লবীরা ভারতীয় বিপ্লব সম্পর্কে যে লাইনটি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল—(১) সশস্ত্র সংগ্রামই হল রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের একমাত্র পথ ; (২) ভারতবর্ষ মার্কিন-বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ( ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ )-এর নয়া উপনিবেশ ; (৩) ভারতীয় সমাজ হচ্ছে আধা-ঔপনিবেশিক, নয়া-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ; (৪) ভারতীয় রাষ্ট্র হল হৎ-বুমুৎসুদ্দী পুঁজিপতি ও সামন্তপ্রভু পরিচালিত রাষ্ট্র ; (৫) ভারতীয় বিপ্লবের চরিত্র হল সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী ( অর্থাৎ নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব, যার অন্তর্বস্তু হল কৃষিবিপ্লব )। ভারতীয় বিপ্লবীরা খুব সঠিকভাবেই ভারতীয় বিপ্লবের শত্রু ও চরিত্রকে চিহ্নিতকরণ করেছিলেন বলেই তাঁদের লাইন ছিল একটি সঠিক লাইন ; কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে **এটি অবশ্যই একটি সাধারণ লাইন মাত্র।** আর এই কারণেই সেই বিপ্লবী লাইনের মধ্যে ভারতীয় বিপ্লবের বহু খুঁটিনাটি প্রশ্নের সমাধান অনুপস্থিত ছিল।

তাই নকশালবাড়ীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তার যথার্থ মূল্যায়ন হল এই যে, এই আন্দোলনটি নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ভারতীয় বিপ্লব সম্পর্কে একটি সঠিক **সাধারণ** রাজনৈতিক লাইন উপস্থিত

করতে সমর্থ হয়েছিল, এবং এটি ছিল ভারতীয় বিপ্লব সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ বিপ্লবী লাইন ( অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও সামাজিক ) প্রতিষ্ঠার দিকে প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বা প্রারম্ভিক বিন্দু, যা উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে একটি সাচ্চা বিপ্লবী নেতৃত্ব ও ভারতীয় বিপ্লবের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হত।

তদানীন্তন বিপ্লবীরা যে মোটামুটি একটি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন, তার ফলে এই আন্দোলনটি শুরুতে সম্পূর্ণ নৈরাষ্ট্রবাদী প্রভাবমুক্ত ছিল। সে সময়ে বিপ্লবীরা 'বিপ্লবী আন্দোলনে গণসংগঠন ও গণসংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করেননি ত' বটেই, এবং গণসংগঠন মারফৎ সাধারণ মানুষের উপর বিপ্লবী রাজনীতির প্রভাব অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তখনও পর্যন্ত বিপ্লবীরা বিশ্বাস করতেন যে সশস্ত্র সংগ্রাম দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল মুক্তির একমাত্র পথ হলেও, সশস্ত্র সংগ্রাম হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের উচ্চতম রূপ, এবং সমস্ত প্রকারের অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রাম অপরিহার্য। তাই তারা যেমন বিভিন্ন গণসংগঠনে অংশগ্রহণ করতেন, তেমনি সঠিকভাবেই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে অর্থনীতিবাদ থেকে মুক্ত করে অর্থনৈতিক সংগ্রামকে বিপ্লবী চরিত্র দেওয়ার জন্য চেষ্টা চালাতেন। সে সময়ে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে নৈরাষ্ট্রবাদ বা বাম হঠকারী লাইনের কোন সংশ্রব ছিল না বলেই বিপ্লবীদের অন্যতম বৃহৎ সংগঠন, কো-অর্ডিনেশন কমিটির দলিলে লেখা হয়েছিল, "চেয়ারম্যান মাও-এর চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসারই হচ্ছে সমস্ত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সর্বপ্রথম কাজ। ষড়যন্ত্রমূলক পদ্ধতি দ্বারা নয়, একমাত্র গণকর্মনীতির ( mass line ) দ্বারাই ভারতীয় জনগণের শত্রুদের উৎখাত করা সম্ভব।"[৩১]

যে চারু মজুমদার পরবর্তীকালে সি. পি. আই. ( এম-এল )-এর নৈরাষ্ট্রবাদী কার্যকলাপের অন্যতম তাত্ত্বিকে পরিণত হন, তিনিও কিন্তু ১৯৬৭-৬৯-এ গণকর্মনীতি, গণসংগঠন, গণসংগ্রাম প্রভৃতিতে বিশ্বাস করতেন। এ কারণে তিনি সঠিকভাবেই বলেছিলেন, "বিপ্লবী পার্টি গড়ার কাজে প্রথম কাজ বিপ্লবী রাজনীতির প্রচার ও প্রসার। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষি-বিপ্লবের পথে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী সংগ্রামের এলাকা গড়ে তোলা এবং সেই বিপ্লবী সংগ্রামের এলাকাকে প্রসারিত করে শহরকে

ঘিরে ফেলা। কৃষক গেরিলাবাহিনী থেকে গণমুক্তি সেনা গড়ে তোলা এবং শহর দখল করে বিপ্লবকে জয়যুক্ত করা অর্থাৎ চেয়ারম্যান মাও-এর জনযুদ্ধের কৌশলকে পুরো কাজে লাগানো। এই হল ভারতবর্ষের মুক্তির একমাত্র সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পথ। এই পথের ব্যাপক প্রচার করতে হবে শুধু পার্টিসভ্য ও দরদীদের মধ্যেই নয়, ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে—তবেই বিপ্লবী সংগ্রাম ও তার সাথে বিপ্লবী পার্টি গড়ে উঠবে। পার্টির এই গণ-লাইন ( mass line ) প্রচারের মারফতেই আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল দলিলগুলির অসারতা জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো এবং সংগ্রামী জনতার ভিতর এই প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের প্রভাব কাটাতে পারবো। চেয়াবম্যান মাও-এর শিক্ষা এই গণ-লাইন সবদা সমস্ত ফ্রণ্টে প্রচার করতে হবে।"৩০

সে সময়ে চারু মজুমদারের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী কিরকম ছিল ? ১৯১৯ -এ বিপ্লবীবা যে অর্থনৈতিক সংগ্রামকে প্রয়োজনীয় মনে করতেন, তার প্রমাণও আমরা চারুবাবুর রচনার মধ্যেই পেতে পারি। ১৯১৯ সালেব ১লা আগষ্ট "কমরেডদের প্রতি" রচনায় তিনি লিখলেন, "ব্যাপক কৃষক সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নতা বিপ্লবীদের পক্ষে একটা মারাত্মক রাজনৈতিক দুর্বলতা, সংগ্রামের প্রতিটি স্তরে এই বিপদ থাকে, তাই গেরিলা যুদ্ধের কৌশল বলতে গিয়ে চেয়ারম্যান বলেছেন, 'জনগণকে জাগিয়ে তোলার জন্য তোমাদেব শক্তিকে তোমবা ভাগ করে দাও, শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য তোমাদের শক্তিকে একত্রে জড়ো করো।' .... এটাই হল প্রথম সূত্র। এই জনগণকে জাগিয়ে তোলা (arousing the masses) কোনদিন সম্পূর্ণ হয় না। দ্বিতীয় যে শিক্ষা তা হোল, **গেরিলাযুদ্ধ মূলতঃ শ্রেণীসংগ্রামের উন্নত স্তর এবং শ্রেণীসংগ্রাম, অর্থনীতিক ও রাজনীতিক দুটি সংগ্রামের যোগফল।**"৩৩ ( বড় হরফ আমাদের ) ১৭ই অক্টোবর, ১৯১৯তে তিনি লিখলেন, "বিপ্লবী শ্রেণীগুলির মধ্যেও অগ্রণী অংশ ও পশ্চাদপদ অংশ থাকে। অগ্রণী অংশ তাড়াতাড়ি বিপ্লবী নীতি গ্রহণ করে এবং পশ্চাদপদ অংশের রাজনৈতিক প্রচার গ্রহণ করতে স্বভাবতঃই দেরী হয়। এবং এইজন্যেই সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।"৩৪

এমনকি ১৯১৯ সালের শেষদিকে যখন তিনি সবেমাত্র নতুন 'বিপ্লবী' তত্ত্ব 'আবিষ্কার' করতে শুরু করেছেন, তখনও তাঁকে বলতে শোনা যায়, "অর্থনৈতিক দাবীর আন্দোলন আমরা করব না, একথা আমরা বলছি না ;"[৩৫]

বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান স্রোতটি যে প্রথম থেকেই সংকীর্ণতাবাদ-বিরোধী ছিল, এবং বিভিন্ন বামহঠকারী লাইন সম্পর্কে হুঁসিয়ারী দিয়েছিল তার প্রমাণ কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও নানা বিপ্লবী গ্রুপগুলির প্রচারপত্রের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে সি. পি. আই. (এম-এল) যে কাযকলাপ চালায় তা ছিল এই মূল বিপ্লবী লাইনের সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে আমরা চারু মজুমদারের আরও দুটি উদ্ধৃতি তুলে দিলাম, যার মধ্যে এই সত্যের প্রমাণ মেলে। ১৭ই অক্টোবর, ১৯১৯তে "শ্রেণীবিশ্লেষণ, অনুসন্ধান ও অনুশীলনের সাহায্যে কৃষকের শ্রেণী-সংগ্রাম গড়ে তুলুন" শীর্ষক প্রবন্ধে চারু মজুমদার লিখলেন, "তাহলে প্রথম কথা হোল, জনতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা কোন কিছু চাপিয়ে দেব না। এই নীতি ভুলে গেলে আমরা অনেকগুলো বিচ্যুতির মধ্যে পড়বো, সেগুলোকে সংকীর্ণতাবাদ, কাস্ত্রোবাদ ইত্যাদি অনেক নাম দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং এই বিচ্যুতিগুলির হাত থেকে বাঁচতে গেলে আমাদের অবিরাম কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার চালিয়ে যেতে হবে।" এই প্রবন্ধেই তিনি আরও বললেন, "কৃষকের ব্যাপক গণ-আন্দোলনের চেষ্টা না করলে এবং ব্যাপক জনতাকে আন্দোলনে সামিল করতে না পারলে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি কৃষক সাধারণের চেতনায় দৃঢ়মূল হতে স্বভাবতই দেরী হবে। তার ফলে সংগ্রামের উপর রাজনীতির প্রাধান্য কমে এসে অস্ত্রের প্রাধান্য বাড়াবার ঝোঁক দেখা দিতে পারে। রাজনৈতিক নেতৃত্বে কৃষকের শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর রূপ হচ্ছে গেরিলা যুদ্ধ। তাই শ্রেণীবিশ্লেষণ, শ্রেণীসংগ্রাম, অনুসন্ধান ও অনুশীলন—এই চারটি হাতিয়ারকে সফল প্রয়োগ করতে পারলে তবেই কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রামের এলাকা গড়ে তোলা যায়।"[৩৬]

অনেকের কাছেই হয়ত এই উদ্ধৃতিগুলির প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু যখন সি. পি. এম. সহ সাম্রাজ্যবাদের অনুচররা আজ প্রমাণ করতে বদ্ধ পরিকর যে সি. পি. আই. (এম-এল) প্রতিষ্ঠা-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী

কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়, তা সকলেরই স্মরণে আছে। ১৯৬৮-৬৯ সালের নৈরাষ্ট্রবাদীদের এই হঠাৎ দ্রুত প্রসার কি কোন বিশেষ ইঙ্গিত বহন করে না? মার্কসবাদীদের মধ্যেও কিছু কিছু ব্যক্তি আছেন, যাঁরা নৈরাষ্ট্রবাদকে শুধুমাত্র বিপ্লবী আন্দোলনের বামপন্থী বিচ্যুতি বলেই মনে করেন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন রুশ বিপ্লবের পরবর্তীকালে নৈরাষ্ট্রবাদ হল বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট একটি বিপ্লব বিরোধী মতবাদ। কারণ সংশোধনবাদ নয়, একমাত্র নৈরাষ্ট্রবাদই তার বাগাড়ম্বর ও রোমাঞ্চকর কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সবথেকে জঙ্গী অথচ কম সচেতন বিপ্লবীদের আকৃষ্ট কবার ক্ষমতা ধারণ করে। এ কারণেই সাম্রাজ্যবাদীরা বিপ্লবী আন্দোলনকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রায়শঃই এই হাতিয়ারটিকে ব্যবহার করে থাকে। ট্রটস্কী ও ট্রটস্কীপন্থীরা যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি দালাল ছিল এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাকে ভিতর থেকে ধ্বংস করার জন্য প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী দেশই যে তাদের প্রভূত অর্থসাহায্য করত আজ তা প্রমাণিত। বর্তমানে অনেকেই ট্রটস্কীবাদ সম্পর্কে স্তালিনের মূল্যায়নটি ভুলে যান: "কোন কোন বলশেভিক মনে করেন যে, ট্রটস্কীবাদ সাম্যবাদের একটি অংশ—যা কিনা ভুলভ্রান্তি করে এটা ঠিক, এটাও সত্যি যে এরা অনেক বেওকুফিও করে, এমনকি এরা কোন কোন সময়ে সোভিয়েত বিরোধীও হয়, কিন্তু তবুও এটি সাম্যবাদেরই একটি অংশ। এই কারণে ট্রটস্কীবাদীদের প্রতি ও ট্রটস্কীবাদী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা উদারনৈতিক। এটি প্রমাণ করার কোন প্রয়োজনই হয় না যে, এ ধরনের চিন্তাধারা গুরুতর ভ্রান্ত এবং ক্ষতিকর। সত্যি কথা বলতে গেলে দীর্ঘদিন ধরেই ট্রটস্কীবাদকে সাম্যবাদের একটি অংশ রূপে আর গণ্য করা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে **ট্রটস্কীবাদ হল বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবীদের অগ্রবাহিনী** (advanced detachment of the counter-revolutionary bourgeoisie) যা কিনা সাম্যবাদ, সোভিয়েত-রাজ এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র গঠনের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে।"[৪১] (বড় হরফ আমাদের)

আজও ট্রটস্কীপন্থীদের সংগঠন চতুর্থ আন্তর্জাতিকের ব্যয়ভার অনেকাংশেই এই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বহন করে থাকে। তাই যখন সারা দুনিয়ার বিপ্লবী জনগণ মাও সে-তুং চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন এবং বিশ্বব্যাপী

এক অভূতপূর্ব বিপ্লবী জোয়ারের সৃষ্টি হচ্ছে, সে সময়ে যে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সহযোগিতায় প্রকৃত বিপ্লবী আন্দোলনকে বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে তাদের নৈরাষ্ট্রবাদ নামক হাতিয়ারটিকে ব্যবহার করবে—সেটি ভাবা অমূলক নয়। বিশেষ করে যখন চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় দেখা গেছে যে অতিবাম ১৬ই মে গ্রুপটি ছিল সরাসরি সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদেরই সাহায্যপুষ্ট একটি সংগঠন, তখন এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, আধুনিককালের এই বিশ্বব্যাপী নৈরাষ্ট্রবাদী কার্যকলাপ হচ্ছে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির চক্রান্তেরই ফল।

বিশ্বব্যাপী নৈরাষ্ট্রবাদী কার্যকলাপের যে নতুন পর্যায় শুরু হল, ভারতীয় যুবসমাজের একটি অংশও তা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে ব্যর্থ হলেন। বিশেষতঃ চে গুয়েভারার দুঃসাহসিক কার্যকলাপ ও রোমাঞ্চকর মৃত্যু বহু তরুণ বিপ্লবীর মনে এই ধরনের নৈরাষ্ট্রবাদী কার্যকলাপের প্রতি গভীর আকর্ষণের সৃষ্টি করে। অনেকেরই হয়ত স্মরণে আছে যে চে-র উজ্জ্বল ভাবমূর্তির প্রভাবেই কলকাতায় কতিপয় ছাত্র প্রচার করেছিল—'গ্রামে মাও, শহরে চে', এবং তারা কখনও কখনও বাস-ট্রাম পুড়িয়ে চে-বাদী এ্যাকশন সৃষ্টির চেষ্টাও করত। ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের মূল স্রোতটি সঠিকপথে অগ্রসর হলেও আন্তর্জাতিকভাবে নৈরাষ্ট্রবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী গ্রুপগুলির মধ্যেও এই মতবাদ ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে। এরই ফলে, সারাভারত কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ বেশ কয়েকটি গ্রুপের কিছু কিছু সদস্যও এই নৈরাষ্ট্রবাদী মতবাদের শিকারে পরিণত হন। এই সময়ে বিপ্লবী গ্রুপ-গুলির চিন্তাধারার ক্ষেত্রে নৈরাষ্ট্রবাদী প্রভাবের যে লক্ষণগুলি প্রকাশিত হতে থাকে তার মধ্যে অন্যতম ছিল ক্রমে ক্রমে শ্রমিক নেতৃত্বের বিষয় সম্পর্কে উদাসীনতা। নৈরাষ্ট্রবাদী প্রভাবের ফলস্বরূপ বিভিন্ন বিপ্লবী পত্র-পত্রিকা-গুলিতে শ্রমিক সংগ্রাম ও বিপ্লবী আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর বাস্তব অংশগ্রহণের বিষয়টি ক্রমশঃ কম গুরুত্ব পেতে থাকে, এবং তার স্থান দখল করে কৃষক সংগ্রাম সম্পর্কে অতিরঞ্জিত বর্ণনা ও অস্বাভাবিক গুরুত্ব। এই একই কারণে ১৯৬৯ সালে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে বিপ্লবীরা রণনীতিগত ও

**সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে নৈরাষ্ট্রবাদী প্রভাব**

রণকৌশলগত ভাবে যে সংসদীয় নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন, সে সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্য বিপ্লবীদের একটি মুষ্টিমেয় অংশ প্রচার আন্দোলনের পরিবর্তে নির্বাচন বানচাল করার পথ গ্রহণ করেন। এইভাবে, সীমীত পরিমাণে হলেও, ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে নৈরাষ্ট্রবাদী মতবাদের অনুপ্রবেশের কাজটি শুরু হয়। যেহেতু ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সূত্রপাত থেকে এই আন্দোলনের প্রধান প্রবণতা ছিল দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি, তাই খুব স্বাভাবিকভাবে বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে 'বাম' বিচ্যুতির প্রবণতা সৃষ্টি হওয়ার কাবণও বর্তমান ছিল। অবশ্য স্মরণ বাখা প্রয়োজন, তাই বলে কিন্তু বামবিচ্যুতি ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে অবশ্যম্ভাবী ছিল না। কারণ ১৯৬৮-৬৯-এ বিপ্লবী আন্দোলনে 'বাম' বিচ্যুতির যে প্রকাশগুলি ঘটতে থাকে সেগুলি ছিল 'বাম' বিচ্যুতির প্রাবম্ভিক বিন্দুমাত্র, এবং তখনও পর্যন্ত নৈরাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারা ভারতীয় বিপ্লবীদের একটি ক্ষুদ্রাংশকেই প্রভাবান্বিত করেছিল। এ কারণে যে পদ্ধতিতে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান স্রোতটি অগ্রসর হচ্ছিল, তাতে মতাদর্শগত সংগ্রাম ও বাস্তবকাজের মাধ্যমে এই 'বাম'বিচ্যুতির ঝোঁকটি সংশোধন করা সম্পূর্ণ সম্ভব ছিল। কিন্তু (কোন অদৃশ্য শক্তির হস্তক্ষেপেব ফলে কিনা জানা যায়নি) সারা ভারত কো-অর্ডিনেশন কমিটি যেভাবে সি. পি. আই. (এম-এল) গঠনের কথা ঘোবণা করলেন, তার ফলে এই সম্ভাবনাকে সার্থক করার পরিবর্তে বিপ্লবীদের মধ্যে নৈরাষ্ট্রবাদী কার্যকলাপের প্রতি আকর্ষণকেই বাড়িয়ে তোলা হল। আব সর্বাধিক চমকপ্রদ বিষয় হল, একদিকে যেমন নৈরাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারার দোষে ধিক্কৃত ব্যক্তিদের এই নবপ্রতিষ্ঠিত পার্টির নেতৃত্বের আসনে দেখা গেল, তেমনি অপরদিকে সঠিক লাইনের অনুগামী ব্যক্তিদের সমালোচনার দোষে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হল।[১২] মতাদর্শগত সংগ্রাম ও তত্ত্বগত আলোচনা স্তব্ধ করে দিয়ে, শ্রমিক শ্রেণীব প্রকৃত প্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে, সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপ্লবীদের মতাদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ না করে যে পার্টিটি জন্মলাভ করল, তার রাজনৈতিক প্রস্তাবেই বামপন্থী হঠকারী লাইনের সুস্পষ্ট প্রকাশ পরিলক্ষিত হল।

১৯৬৯ সালের রাজনৈতিক প্রস্তাবে সি. পি. আই. (এম-এল)-এর বাম-বিচ্যুতির যে প্রকাশ দেখা যায় সে'টিই অনতিকাল পরে গুণগতভাবে পরিবর্তিত

হয়ে নৈরাষ্ট্রবাদী চরিত্র গ্রহণ করে। এর ফলে দেখা যায় ১৯৬১ এর মধ্যে সমস্ত বিপ্লবীরা যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, সি. পি. আই. (এম-এল) ঠিক তার বিপরীত কর্মসূচীই গ্রহণ করতে থাকে। সি. পি. আই. (এম-এল) পার্টিটির নেতৃত্ব নৈরাষ্ট্রবাদীদের করায়ত্ত হওয়ার পর থেকেই গণসংগঠন গণআন্দোলন, অর্থনৈতিক সংগ্রাম প্রভৃতি গণকর্মনীতিকে বর্জন করে ষড়যন্ত্র-মূলক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। যে চারু মজুমদার একসময়ে রাজনীতির প্রচার ও গণকর্মনীতির উপর জোর দিয়েছিলেন, তাঁকেই বলতে শোনা যায়, "এই (গেরিলা-লেখক) দল গঠন করার পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে **চক্রান্তমূলক**। রাজনৈতিক পার্টি ইউনিটগুলোর মিটিং-এও এই চক্রান্তের কোন রূপ দেওয়া চলবে না। এটা হওয়া উচিত **ব্যক্তিগত ও জনে জনে চক্রান্ত। বুদ্ধিজীবী কমরেডকেই** এ ব্যাপারে যথাসম্ভব উদ্যোগ নিতে হবে। সেই কমরেডটি, তার ধারণায় সবচেয়ে সম্ভাবনা আছে, এমন একটি গরীব কৃষকের কাছে যাবে ও কানে কানে বলবে, **'এ রকম জোতদারকে খতম করলে কি ভাল হয় না**?' এইভাবে গেরিলাদের একজন একজন করে গোপনে বেছে একটি দলে সংগঠিত করতে হবে।"[৪৩] (বড় হরফ আমাদের) এই প্রবন্ধেই চারুবাবু বললেন, "বস্তুতঃ একটা সময় আওয়াজ উঠবে, 'যে শ্রেণীশত্রুর রক্তে নিজের হাত রাঙায়নি, সে কমিউনিষ্ট নামের উপযুক্ত নয়'।"[৪৪] তিনি অন্যত্র বললেন, "বিপ্লবী কৃষকশ্রেণী তার সংগ্রামের মারফৎ একথা প্রমাণ করেছেন, গেরিলা যুদ্ধের জন্য গণআন্দোলন বা গণসংগঠন কোনটিই অপরিহার্য নয়।"[৪৫]

বলা বাহুল্য, চারু মজুমদারের এই রাজনৈতিক ডিগবাজী বিস্ময়কর হলেও ভারতীয় কমিউনিষ্ট আন্দোলনে কোন বিরল ঘটনা নয়।

বিপ্লবী রাজনীতি ক্রমশঃ অন্তর্হিত হতে থাকল, আর মার্কসবাদ-লেনিনবাদের স্থান নিল শুধুমাত্র 'খতম' অভিযান। প্রথমে গণসংগঠন গণ-সংগ্রাম বর্জন, পরে 'গেরিলাযুদ্ধ একমাত্র কৌশল' অবলম্বন এবং 'যে যত পড়ে সে তত মূর্খ হয়', ও সালের মধ্যে ভারতবর্ষ মুক্ত হবেই' ইত্যাদি প্রচারের মধ্য দিয়ে সি. পি. আই. (এম-এল) পার্টিটি একটি সম্পূর্ণ নৈরাষ্ট্রবাদী পার্টিতে পরিণত হয়। মুখে মাও সে-তুং-চিন্তাধারার নাম করলেও বাস্তবে এই পার্টিটি যত্রতত্র 'অ্যাকশন' এবং 'শ্রেণীশত্রু খতম'-এর

মধ্য দিয়ে শহুরে গেরিলাযুদ্ধ সম্পর্কে চে-বাদী কর্মপদ্ধতিই অনুসরণ করে। চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় ১৬ই মে গ্রুপটি জনগণের কাছে চেয়ারম্যান মাও-এর প্রতি যে নিঃসর্ত আনুগত্যের দাবী জানাত, তাদেরই প্রতিধ্বনি করে চারু মজুমদার বললেন, "চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান"। এই নৈরাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারার ফলে কমিউনিষ্ট পার্টির অন্তঃসার ত' বটেই, এমনকি তার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যগুলিও সি. পি. আই. (এম-এল) থেকে অতি-দ্রুত অবলুপ্ত হয়, এবং সর্বকালের নৈরাষ্ট্রবাদীদের মত পার্টি-নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা বর্জন ক'রে প্রতিটি ইউনিটকে যথেচ্ছ ভাবে চলার অধিকার দেয়। আর এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে লুম্পেন প্রলেতারিয়েত ও পুলিশের অনুচররা পার্টির মধ্যে বৃহৎ সংখ্যায় প্রবেশ ক'রে প্রকৃত বিপ্লবীদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য পুলিশের নির্দেশ অনুযায়ী উস্কানীমূলক কাজ ক'রে বেড়াতে থাকে। বলা বাহুল্য, লুম্পেন প্রলেতারিয়েত ও পুলিশী অনুচরেরা এইভাবেই রঞ্জিৎ গুপ্তর 'পাল্টা বিদ্রোহের তত্ত্ব'কে সফল করে তোলে।

যদিও সি. পি. আই (এম-এল) পার্টিটি আজ বহুধাবিভক্ত, এবং বাস্তবে এই পার্টির কোন অস্তিত্বই নেই, কিন্তু যে নৈরাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারা এই পার্টিটি সৃষ্টি করেছিল আজও তা বিপ্লবীদের এক বৃহৎ অংশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই কারণেই একদিকে যেমন কিছু কিছু গ্রুপ এখনও সি. পি. আই. (এম-এল)-এর পুরানো লাইন অনুসরণ করে চলেছে, তেমনি আর একদিকে বহু সং-বিপ্লবী, যাঁরা অভিজ্ঞতা থেকে পার্টির ভুল লাইন বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরাও, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণভাবে নৈরাষ্ট্রবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হচ্ছেন না। এ বিষয়ে দু'একটি দৃষ্টান্ত হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। ১৯৭১ সালে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা সীমান্ত আঞ্চলিক কমিটি, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পক্ষ থেকে প্রকাশিত "বর্তমান পার্টি লাইন ও আমাদের অভিজ্ঞতার সার সংকলন" শীর্ষক পুস্তিকায় যদিও সি পি. আই. (এম-এল)-এর বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি খুব সঠিকভাবেই চিহ্নিত করা হয়েছিল, কিন্তু তখনও পর্যন্ত তাঁরা সি. পি. আই (এম-এল) অনুসৃত শ্রেণীশত্রু খতমের প্রকৃত চে-বাদী চরিত্রটি বুঝতে সক্ষম হননি বলে এই কমিটি গণআন্দোলন, গণসংগ্রাম প্রভৃতি সুপারিশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীশত্রু খতম, অর্থাৎ ব্যক্তি হত্যার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলছেন: "শহরে আমাদের

কাজ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হল ঃ

১। **শহরে আমরা গেরিলা কায়দায় শ্রেণীশত্রু খতম করবো।**

২। ধর্মঘট, বন্ধ ইত্যাদি জাতীয় গণআন্দোলন গড়ে তুলবো।

৩। পুলিশের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলবো।...

"কমরেডস, আমরা শহরে জনগণের বিদ্রোহ করার অধিকার কেড়ে নিতে রাজী নই। তাই আমরা শহরে সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে। এখানে এ্যাকশন নিয়ন্ত্রণ করারও আমরা পক্ষপাতী নই। আবার শুধু এ্যাকশন করে গেলেই সকল সমস্যার সমাধান আপসেই হয়ে যাবে, এ চিন্তা ঠিক নয়।" ( পৃঃ ২৪, বড় হরফ আমাদের ) এই দলিলে পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে যে উক্ত কমিটির কমরেডরা পার্টি লাইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেকটা ধরতে পারলেও, অন্ততঃ উক্ত পুস্তিকা প্রকাশের সময় পর্যন্ত চে-বাদী এ্যাকশনকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেননি।

আবার কোন কোন গ্রুপ, যাঁরা পার্টির ভুল-ত্রুটিগুলি সংশোধন করে পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চান, তাঁরাও এখনও বুঝতে অসমর্থ হচ্ছেন যে সি. পি. আই. ( এম-এল ) ১৯৬৯ সালে যে রাজনৈতিক প্রস্তাবটি গ্রহণ করে তার মধ্যেই 'বাম'বিচ্যুতির বীজটি নিহিত ছিল। এ'রকমই একটি গ্রুপ, ১৯৬৯ সালে লিখেছেন, "পার্টির রাজনৈতিক প্রস্তাব হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সে-তুং চিন্তাধারার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রকৃত পার্টির ঘোষণাপত্র। সি. পি. আই ( এম-এল ) সেই পদচিহ্ন বহন করছে।

"যারা একে গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে বা নিন্দা করছে তাদের সি. পি. আই. ( এম-এল )-এর সদস্য বা কাডার-রূপে গণ্য করা যায়না।"[৪৬]

কোন কোন ব্যক্তি একথা মনে করতেও দ্বিধা বোধ করছেন না যে সি. পি. আই ( এম-এল )-এর প্রধান ত্রুটিটা ছিল গণমুক্তি ফৌজ গড়ে না তোলা, এ ছাড়া সব কিছুই ঠিক। তাই তাঁদের ধারণা বিপ্লবীদের আশু কর্তব্য গণমুক্তি ফৌজ গঠন। এমনকি বর্তমানে যে মূর্তিভাঙা চলছে, সেই মূর্তিভাঙাকে যাঁরা সমর্থন করছেন না, তাঁদের মধ্যেও একটি বেশ বড় অংশ এখনও পর্যন্ত এই মূর্তিভাঙা যে একটি বিপ্লবী কাজ নয়, একটি নৈরাষ্ট্রবাদী কাজ, তা মনে করেন না। তাঁরা যে মূর্তিভাঙার কাজে অংশগ্রহণ করছেন না

তার কারণ হল—বর্তমানে নাকি মূর্তিভাঙার উপযুক্ত অবস্থা নেই। সুতরাং অনুমান করা দোষনীয় নয় যে তাঁদের কথামত 'উপযুক্ত অবস্থা' সৃষ্ট হলেই তাঁরা আবার এ কাজে মেতে উঠবেন। এ কারণেই বর্তমান অবস্থা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে এখনও ভারতীয় বিপ্লবীদের উপর নৈরাষ্ট্রবাদের প্রভাব যথেষ্ট।

আবার বেশ কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা শুধুমাত্র সংশোধনবাদকেই ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের একমাত্র বিপদ হিসাবে চিহ্নিত করেন, এবং তাই তাঁরা সংশোধনবাদ ও নৈরাষ্ট্রবাদ—এই উভয় ঝোঁকের বিরুদ্ধেই যে সমান জোরে আদর্শগত সংগ্রামেব প্রয়োজনীয়তা আছে, একথা মনে করেন না। শুধু তাই নয়, বরং নৈরাষ্ট্রবাদকে একটু প্রশ্রয়ের সঙ্গেই দেখেন। মণি গুহ একজন প্রবীণ বিপ্লবী, এবং তিনি কোন সময়েই সি. পি আই (এম-এল)-এর নৈরাষ্ট্রবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তিনিও যে ইদানীং নৈরাষ্ট্রবাদকে একটু স্নেহের চোখেই দেখছেন, তা তাঁর ১৯৬১ সালের "মূর্তি ভাঙাগড়ার ইতিকথা" শীর্ষক প্রবন্ধটিই ইঙ্গিত দিচ্ছে। তা না হলে, কেন তিনি মূর্তিভাঙার রাজনীতির স্বরূপ উন্মোচন না করে, একজন পক্ষপাতহীন (!) বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর মত কোথায় কোথায় জনগণ বিপ্লবী আবেগে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে মূর্তি ভেঙেছে তার একটি নিরবয়ব বর্ণনা দিতে যাবেন? তিনি যে মূর্তি-ভাঙাকে সমর্থন করেন না, তা উল্লেখ করে লিখলেন, "মূর্তি ভাঙ্গার রাজনৈতিক লাইন কোন সচেতন পার্টির রাজনৈতিক লাইন হতে পারে না—যেমন হতে পারে না ব্যক্তি হত্যার লাইন।" কিন্তু এর পরেই তিনি লিখলেন, "কিন্তু নীতিবাগীশদের নীতির জন্য তা হতে পারে না, তা নয়। হতে পারে না যথেষ্ট উপযোগীতার চাইতে অনেকবেশী ক্ষতিকারক বলে। তাই এব তত্ত্বগত ও লাইনগত সমালোচনা হতে পারে, কিন্তু তা বলে এ সমাজবিরোধী, সভ্যতা-সংস্কৃতি বিরোধীও নয়, রাজনীতি, শ্রেণী-সংগ্রাম বিবর্জিতও নয়; যে ক্ষুদিরামের মূর্তি সেদিন ঘটা করে বসানো হোল, তার রাজনৈতিক লাইনও তো ভুল ছিল, কিন্তু তাঁর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতা, তাঁর দেশপ্রেম কারু থেকে একতিলও কম ছিল কি?......তবে?"[৪৭]

শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধির এ কোন্ ধরনের শ্রেণী দৃষ্টীভঙ্গী? একি শুধু লেখার জন্যই লেখা? নীতিবাগীশ বলতে তিনি নিশ্চয়ই বুর্জোয়া নীতিবাগীশদেরই

বোঝাতে চেয়েছেন; কিন্তু শুধুমাত্র 'যথেষ্ট উপযোগিতার চাইতে অনেক বেশী ক্ষতিকারক বলে'ই কি মূর্তিভাঙা বর্জনীয়? নাকি শ্রমিকশ্রেণী নীতিগত-ভাবেই এই ধরনের কার্যকলাপের বিরোধী? মূর্তিভাঙা যে রাজনীতি বা শ্রেণীসংগ্রাম বিবর্জিত নয় সে ত' ঠিকই, কিন্তু এর পিছনে কোন্ রাজনীতি কাজ করছে—শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি, না কি অস্থিরমতি পাতিবুর্জোয়া বা ভবঘুরেদের রাজনীতি? মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনীতি, না কি নৈরাষ্ট্র-বাদী রাজনীতি? মণিবাবুর মত প্রবীণ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে এ সমস্ত বিষয়ে সদুত্তর আশা করা অন্যায় নয়। কিন্তু বলতে সঙ্কোচ হয় যে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী মূর্তিভাঙাকে দেখছেন না বলেই এ প্রশ্নগুলির উত্তর এড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

**ক্ষুদিরাম প্রসঙ্গে**

ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ইতিহাসে লিখিত আছে ও থাকবে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতির প্রচারকদের কাছে শিক্ষার বিষয় হিসাবে ক্ষুদিরামের দেশপ্রেম থেকে তাঁর ভ্রান্ত রাজ-নৈতিক লাইনও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু সম্প্রতি কোন কোন মহলে ক্ষুদিরামের এই ভ্রান্ত রাজনৈতিক লাইন সম্পর্কে যে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হচ্ছে তাতে বিপ্লবী বিচারের ক্ষেত্রে আত্মত্যাগকেই একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে গণ্য করার এক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। শুধুমাত্র আত্মত্যাগই যদি এ'ক্ষেত্রে একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তা'হলে হয়ত লেনিন-অগ্রজ আলেকজাণ্ডার লেনিনের থেকেও বেশী বিপ্লবী ছিলেন, কারণ লেনিনকে ত' আর ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণদান করতে হয়নি! কিন্তু সকলেই জানেন আলেকজাণ্ডারকে রুশ ইতিহাসে সে স্থান দেওয়া হয়নি, আর সম্ভবতঃ লেনিন নিজেও অগ্রজের আত্মবলিদান সত্ত্বেও তাঁকে সেই স্থান দেননি। বরং তিনি যেমন আলেকজাণ্ডারকে সাহসিকতার দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি রাজনীতির ক্ষেত্রে আলেকজাণ্ডার ছিলেন লেনিনের একজন **নেতিবাচক শিক্ষক** (নেগেটিভ টিচার)। বর্তমানে মূর্তিভাঙার যে সব প্রচারকরা ক্ষুদিরামের মূর্তি প্রতিষ্ঠার দাবী করেছেন, তাঁদের এই লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের জন্যই তাঁরা আত্মত্যাগকে বিপ্লবীদের একমাত্র প্রয়োজনীয় গুণ বলে মনে করে ক্ষুদিরামকে নিঃসর্তভাবে গ্রহণ করেছেন। বর্তমান আলোচনীয় ক্ষুদিরাম-

প্রসঙ্গ অবতারণার কোন অভিলাষ আমাদের নেই, কিন্তু যখন ক্ষুদিরাম সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তখন সম্ভবতঃ সামান্য দু'একটি কথা অপ্রাসঙ্গিকে হবে না।

ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয় ১১ই অগাষ্ট, ১৯০৮, আর বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে। এই আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ বা 'শ্রীঅরবিন্দ', যাঁর মতবাদ হল ধর্মের উপর স্থাপিত নৈরাষ্ট্রবাদ। বাংলার এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন যে কয়েকজন সক্রিয় বিদেশী নৈরাষ্ট্রবাদীর প্রত্যক্ষ সাহায্য লাভ করে তার মধ্যে অন্যতম হলেন মিস মার্গারেট নোবেল বা 'ভগিনী নিবেদিতা'। নিবেদিতা ছিলেন নৈরাষ্ট্রবাদী ক্রপোট্‌কিনের একজন বিশ্বস্ত অনুগামী। তিনি ভারতবর্ষের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে কতটা সক্রিয় ছিলেন তা বোঝা যায়, যখন অনুশীলন সমিতির প্রথম কার্যকরী সমিতিতে (বরোদা গ্রুপের সঙ্গে মিলনের পর) অরবিন্দের নামের পাশে নিবেদিতার নামও দেখা যায়। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি বাংলার এই আন্দোলনকে নৈরাষ্ট্রবাদী পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যেই নৈরাষ্ট্রবাদী মাৎসিনির আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডটি অনুশীলন সমিতিকে দান করেন। বোধহয় তাঁরই পরামর্শমত সে সময়ে সন্ত্রাসবাদীদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই পুস্তকের 'গেরিলাযুদ্ধ' পরিচ্ছেদটি টাইপ করে বাংলার সর্বত্র প্রচার করা হত। এই ভদ্রমহিলাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে মাৎসিনির আত্মজীবনীর বাকী পাঁচখণ্ড এবং ক্রপোট্‌কিনের ***"Memoirs of a Revolutionist"*** এবং ***"In Russian & French Prisons"*** নামক দুইটি গ্রন্থ উপহার দেন, এবং ভূপেন্দ্রনাথকে বোঝান যে ১৯০৫-এর রুশ-বিপ্লব হল ধনীদের বিরুদ্ধে গরীবের যুদ্ধ; অর্থাৎ এটি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব নয়।[৪৮] ক্ষুদিরাম যে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তা যে শুধু সন্ত্রাসবাদী ছিল তা নয়, এটি ছিল জঘন্য ধরনের নৈরাষ্ট্রবাদের প্রবক্তা ক্রপোট্‌কিন ও মাৎসিনির ভাবাদর্শে পরিচালিত একটি নৈরাষ্ট্রবাদী আন্দোলন।

উগ্র হিন্দু-জাতীয়তাবাদ প্রচারের মাধ্যমে অরবিন্দ পরিচালিত এই নৈরাষ্ট্রবাদী আন্দোলন যেমন চরম মুসলমান-বিদ্বেষ সৃষ্টি মারফৎ বহু ক্ষেত্রে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের উপর বর্ণহিন্দুদের অত্যাচারের পথকে সুগম করে তোলে, তেমনি এটি তদানীন্তন ভারতীয় গণআন্দোলন, বিশেষতঃ শ্রমিক

আন্দোলনেরও অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে।

গান্ধীবাদীদের প্রতিধ্বনি করে অনেকেই আজকাল বলে থাকেন যে গান্ধীই নাকি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে গণআন্দোলনের সূচনা করেন। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস হল, বালগঙ্গাধর তিলকই প্রথম ভারতীয়, যিনি তাঁর সতীর্থদের সহযোগিতায় একদিকে গণআন্দোলন, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে মনোনিবেশ করেন এবং অপরদিকে বৃটিশ সৃষ্ট জাতীয় কংগ্রেসকে একটি প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা করেন। তিলকের এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী সে সময়ে বহু আন্দোলনই গড়ে তোলেন। তিলকের ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধির চেষ্টা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছিল এবং তিলক নিজে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কতখানি জনপ্রিয় ছিলেন তা বোঝা যায় ১৯০৮ সালে তিলকের সশ্রম কারাদণ্ডকে কেন্দ্র করে বম্বে শহরের শ্রমিকদের জোরদার রাজনৈতিক আন্দোলনে। ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর এই গণআন্দোলন এত উল্লেখযোগ্য ছিল যে এটি মহান লেনিনেরও দৃষ্টি এড়ায়নি। লেনিন এই আন্দোলনকে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন রাজনৈতিক গণআন্দোলন নামে অভিহিত করে বলেছিলেন, "কিন্তু ভারতের জনতা পথেঘাটে তাঁদের লেখক সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক নেতাদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রুখে দাঁড়াতে শুরু করেছেন। ভারতীয় গণতন্ত্রী তিলকের বিরুদ্ধে বৃটিশ শৃগালেরা যে কুখ্যাত কারাদণ্ড ঘোষণা করেছিল,……তার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা পথবিক্ষোভ ও বম্বেতে ধর্মঘটের ডাক দিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ভারতবর্ষেও সর্বহারাশ্রেণী ইতিমধ্যেই সচেতন রাজনৈতিক গণসংগ্রামের স্তরে উন্নীত হয়েছেন।"[৪৯]

বালগঙ্গাধর তিলকের বৃটিশ-বিরোধী ভূমিকার প্রভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কংগ্রেস নেতৃত্ব কার্যতঃ তিলকের করায়ত্ত হয় এবং কংগ্রেস-নেতৃত্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রকৃত বৃটিশ-বিরোধী গণআন্দোলনের সূচনাও হয়। আর তখন কংগ্রেসের গোখ্‌লেপন্থী রক্ষণশীল অংশের প্রধান শক্তি নিয়োজিত হয় তিলকপন্থী গণতন্ত্রীদের কবল থেকে কংগ্রেসকে পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায়। অবশ্য উত্তরোত্তর তিলকের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং কংগ্রেসে বৃটিশ-বিরোধী গণতন্ত্রীদের প্রাধান্য গোখ্‌লেপন্থীদের প্রতিটি চেষ্টাই ব্যর্থ করে। কিন্তু যখন তিলক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতি সমমর্মীতা প্রদর্শন করে বাস্তব

কর্মসূচী গ্রহণ করেন, এবং এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে বাংলার সন্ত্রাসবাদীদে সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হন, তখনই গোখ্‌লেপন্থীরা তিলক-বিরোধিতার পূর্ণ সুযোগ পায়। কারণ সন্ত্রাসবাদীরা তিলকের সংস্পর্শে এসেও যেমন জনমত এবং গণচেতনা গঠনের চেষ্টা না ক'রে তাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অব্যাহত রাখে, তেমনি এই আন্দোলনের প্রতি সমমর্মী বহু গণতন্ত্রীকেই শত্রুতে পরিণত ক'রে তিলক পরিচালিত ব্যাপক বৃটিশ-বিরোধী গণমোর্চা গঠনের উদ্দেশ্যটিকে ব্যর্থ করে দেয়। তিলক খুব সঠিকভাবেই তদানীন্তন ভারতবর্ষের সব থেকে জঙ্গী বৃটিশ-বিরোধীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা ও নৈরাষ্ট্রবাদ সম্পর্কে বাস্তবজ্ঞানের অভাবের ফলে তিনি সন্ত্রাসবাদের ক্ষতিকারক দিকটি দেখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আর বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে তিলকের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্যই গোখ্‌লে-পন্থীরা তিলককে অবশেষে সন্ত্রাসবাদীদের গণবিরোধী কার্যকলাপের জন্য দায়ী ক'রে তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার সুযোগ পেয়েছিল। গোখ্‌লেপন্থীদের এই চেষ্টা অবশেষে সফল হয় ১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেসে, যে কংগ্রেস বিখ্যাত হয়ে রয়েছে বিপ্লবী বাহাদুর অরবিন্দর জুতো ছোঁড়াছুঁড়ির জন্য। ১৯০৭ সালে বৃটিশপন্থীরা যে তিলককে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হয় এবং কংগ্রেসকে বিভক্ত করে, তারও প্রধান কারণ হল অরবিন্দর নেতৃত্বে বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের চরমপন্থী কার্যকলাপ ও নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। এর পরের ইতিহাস সবারই জানা—১৯০৮ সালে তিলক এবং অরবিন্দ উভয়েই কারারুদ্ধ হন। অরবিন্দ মুক্ত হন ৬ই মে, ১৯০৯। আর তিলককে ছ'বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

এইভাবে কুখ্যাত নৈরাষ্ট্রবাদী অরবিন্দ, শ্রমিক-সোভিয়েতে নৈরাষ্ট্রবাদীদের প্রবেশাধিকার সম্পর্কে লেনিনের সেই ঐতিহাসিক উক্তির সত্যতা বাস্তবে-প্রমাণ ক'রে, মাত্র দু'বছরের (১৯০৬-০৮) সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে কংগ্রেসকে বিভক্ত ক'রে ও তদানীন্তন সম্ভাবনাপূর্ণ গণআন্দোলন বিনষ্ট ক'রে পরিণত হলেন 'দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন' শ্রীঅরবিন্দে। সন্ত্রাসবাদীরা তিলকের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কংগ্রেস বিভাগ করে কি পরিমাণ ক্ষতি করেছিল সে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই; তবে গোখ্‌লেপন্থীরা তিলকের কারারুদ্ধ হওয়ার সুযোগে নেতৃত্ব দখল করে কংগ্রেসকে পুনরায় পরিণত করল বৃটিশ তোষণের

সংগঠনে। তিলক ও তিলকপন্থীদের অনুপস্থিতিতে গণআন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ল। আর গণআন্দোলনের ভাটার সুযোগে বেড়ে চলল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ঠিক এই মুহূর্তটিকেই বেছে নিল ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে তাদের বিশ্বস্ত ভৃত্য মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সময় হিসাবে।

সুতরাং ক্ষুদিরামের লাইন ভুল এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। ক্ষুদিরামের মত অসংখ্য সৎ ও সাহসী ভারতবাসী এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও, বস্তুতঃ এই আন্দোলনটি ছিল সম্পূর্ণ নৈরাষ্ট্রবাদী চরিত্রের, যা সে সময়ের সম্ভাবনাপূর্ণ গণআন্দোলনের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছিল ; এবং এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে সে আন্দোলনের নেতারা ছিল সচেতন নৈরাষ্ট্রবাদী। ভারতে নৈরাষ্ট্রবাদী আন্দোলনের সূত্রপাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাওয়া গেলেও নির্দ্বিধায় বলা যায় যে মিস মার্গারেট নোবলের ভূমিকাটি ইঙ্গিতপূর্ণ।

আজ ভারতবর্ষের সমস্ত কমিউনিষ্ট বিরোধীরা বিপ্লবী সম্পর্কে মার্কসবাদী ধারণাটিকে বিকৃত করার উদ্দেশ্যেই একযোগে প্রচার করে চলেছে যে সন্ত্রাস-বাদীরাই প্রকৃত বিপ্লবী এবং তারা কোনমতেই নৈরাষ্ট্রবাদী ছিলেন না। এই কারণেই তথাকথিত গান্ধী-বিরোধী ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে বলতে শোনা যায়, "ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনকে সরকারী রিপোর্টে সন্ত্রাসবাদী ও নৈরাষ্ট্রবাদীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ নিশ্চিতভাবেই এই আন্দোলনের অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু নৈরাষ্ট্রবাদ বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায় তার সঙ্গে এই আন্দোলনের মতাদর্শের কোন সংস্রব ছিল না। বিপ্লবীরা কখনই একটি নৈরাষ্ট্রবাদী অবস্থার অনুকূলে মত প্রকাশ করেননি ত' বটেই এমনকি এই ধরনের অবস্থার স্বপক্ষে আদৌ কোন কাজও করেননি, যে অবস্থায় বিশৃঙ্খলা ও সংশয়ের সৃষ্টি হয়, যেমনটি ঘটেছিল রাশিয়ার নিহিলিষ্টদের ক্ষেত্রে।"[৫০]

শুধু তথাকথিত গান্ধী বিরোধীরাই নয়, গান্ধীবাদীরাও গান্ধীর সরাসরি সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কৌশলের পরিবর্তন করেছে। যে গান্ধীবাদীরা একসময়ে গান্ধীর নেতৃত্বে ভগৎ সিং-এর নিঃসর্ত আত্মদান সম্পর্কে নীরবতার কৌশল অবলম্বন করেছিল, তারাই আজ সন্ত্রাসবাদীদের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

করছে। আর শাসকশ্রেণীর এই সুপরিকল্পিত প্রচারের দ্বারা ভারতীয় বিপ্লবীদের এক অংশও প্রভাবিত হয়ে পড়ছেন। এই কারণে অনেকেই বাংলার এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিশ্লেষণ করার সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী—সাধারণ কর্মীদের আত্মত্যাগ ও সাহসিকতাকে স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনের প্রকৃত নৈরাষ্ট্রবাদী চরিত্র উন্মোচনের পরিবর্তে নিঃসর্তভাবে ক্ষুদিরাম প্রমুখ ব্যক্তিদের গ্রহণ ক'রে অচেতনভাবে নৈরাষ্ট্রবাদের প্রতি আনুগত্যই জ্ঞাপন করছেন। সুতরাং যখন শাসকশ্রেণী সুপরিকল্পিতভাবে নৈরাষ্ট্রবাদকে বিপ্লবী মতবাদ বলে প্রচার করে চলেছে, এবং ভারতীয় বিপ্লবীদের একটি বৃহৎ অংশ এখনও পর্যন্ত নৈরাষ্ট্রবাদী মতবাদ দ্বারা আচ্ছন্ন, তখন ক্ষুদিরামের রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা ব্যক্ত না করে ক্ষুদিরামের ভাবমূর্তি গঠন পরোক্ষভাবে নৈরাষ্ট্রবাদী প্রভাবকেই শক্তিশালী করে।

বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন যেভাবে গণসংগ্রামের পথকে রুদ্ধ করে গান্ধীর আবির্ভাবের পথকে প্রশস্ত করেছিল, আজ সেইভাবেই সি. পি. আই. (এম-এল)-এর নৈরাষ্ট্রবাদী কার্যকলাপ ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে চরম সুবিধাবাদের জন্ম দিচ্ছে। বিপ্লবী বলে পরিচিত কিছু কিছু ব্যক্তি যারা একসময়ে সঠিক লাইনকে পরিত্যাগ করে সচেতনভাবে নৈরাষ্ট্রবাদী কার্য-কলাপে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারাই আজ আত্মসমালোচনার নাম করে চারু মজুমদারকে দায়ী করে মুক্তি পেতে চাইছেন। যে কানু সান্যাল বলেছিলেন, "কমরেড চারু মজুমদারেব কর্তৃত্ব যারা ভাঙতে চায়, তাদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার", তিনিই পরবর্তীকালে প্রকৃতপক্ষে নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সি পি. আই. (এম-এল)-এর বামহঠকারিতার জন্য এককভাবে চারুবাবুকে দায়ী করেছেন। ১৯৬১ সালে কানু সান্যাল লিখেছিলেন, "কিন্তু কমরেড চারু মজুমদারই প্রথম নকশালবাড়ী, তারপর শ্রীকাকুলাম, মুশাহারি, লখিমপুর খেরী, মেদিনীপুর ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে গেরিলা সংগ্রাম গড়ে তোলাব জন্য ভারতের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নির্দিষ্টভাবে শ্রেণীশত্রু খতম অভিযান গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এই শ্রেণীশত্রু খতম অভিযানই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গেরিলা সংগ্রামের জোয়ারের দ্বারমুক্ত করে দিয়েছে।"[৫১] তাই নকশালবাড়ীর আন্দোলনে চারু মজুমদারের ভূমিকা সম্পর্কে কমঃ

সান্যালের সিদ্ধান্ত হল : "এই চারটি পর্যায়ে কমরেড চারু মজুমদারের সারা ভারতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব গড়ে উঠেছে। তাই সি. পি. আই. ( এম এল )-এর প্রথম ( অষ্টম ) কংগ্রেস তার গৃহীত রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রস্তাবে কমরেড চারু মজুমদারের বিশেষ ভূমিকার উল্লেখ করেছে। **একথা আমি জোর দিয়ে বলতে চাই** কোন রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছাড়া কোন কেন্দ্রীয় বা রাজনৈতিক টীম গড়ে উঠতে পারে না। ...ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব গড়ে উঠেছে কমরেড চারু মজুমদারকে কেন্দ্র করে। **কমরেড চারু মজুমদারের এই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়, বরং দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিকশিত হয়েছে।** তাই রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে 'কর্তৃত্ববাদের' অপবাদে অভিযুক্ত করা মাও চিন্তাধারার বিরোধী।"[৫২] ( বড় হরফ আমাদের )

কিন্তু মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে চারু মজুমদারের ভূমিকা সম্পর্কে কানু সান্যালের মতামত কি দাঁড়াল ? জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে কমঃ সান্যালের যে চৈতন্যোদয় হল, তার ফলে তিনি দেখতে পেলেন, নকশালবাড়ীর আন্দোলনের সূত্রপাত থেকে যে 'রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী' গোষ্ঠী পর্দার আড়ালে কাজ করে আসছিল তারাই, চারু মজুমদারের কোন বিশেষ ভূমিকা না থাকা সত্ত্বেও কমঃ মজুমদারকে নকশালবাড়ীর আন্দোলনের নেতা সাজিয়ে দেয়। তাই এই নতুন সত্যান্বেষণের আলোকে আলোকিত হয়ে তিনি ১৯৬১ সালে লিখলেন, "তার ফল স্বরূপ এই রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী নকশালবাড়ীর কৃষক অভ্যুত্থানের গৌরবময় ভূমিকাকে ব্যবহার করে কো-অর্ডিনেশন কমিটির মধ্যে একটি মাত্র ব্যক্তিকে নকশালবাড়ীর স্রষ্টা বলে চিত্রিত করতে পেরেছিল। দার্জিলিং জেলার কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের জেলবাস, আত্মগোপন থাকার এবং সারা ভারত কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে না থাকার সুযোগে 'নকশালবাড়ীর শিক্ষা' ও 'নকশালবাড়ীর মূল্যায়ন' নামে **এই রাজনৈতিক গোষ্ঠী নকশালবাড়ীর স্রষ্টা চারু মজুমদার বলে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।**"[৫৩] ( বড় হরফ আমাদের ) আর একদা মনুমেণ্ট ময়দানে তিনি নিজে যে পার্টির প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেছিলেন, সত্য দর্শনের নতুন আলোয় সেই পার্টির গঠন সম্বন্ধে কমঃ সান্যালের দৃষ্টিভঙ্গী কি রকম হল ? "সেই সুযোগে এই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী

গেরিলা যুদ্ধ একমাত্র পথ ও খতম একমাত্র রণনীতি ও রণকৌশলের আওয়াজের ভিত্তিতে সাত তাড়াতাড়ি C. P. I. (M.L.) প্রতিষ্ঠা করে সেই ভাঙনকে চিরস্থায়ী করার চক্রান্তে সফল হলো।''[৫৪] চমৎকার! চমৎকার! এই কি আত্মসমালোচনার পদ্ধতি? যদি এ প্রবন্ধ সত্যসত্যই কানু সান্যাল লিখিত হয়, তা'হলে আমাদের বলতেই হবে যে এটি ভুল সংশোধনের উদ্দেশ্যে বিগত আন্দোলনের বাস্তব বিশ্লেষণের কোন চেষ্টা নয়, এ হল তাঁর চরম সুবিধাবাদ। আজ অতিবামবিচ্যুতির ফলে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ মাথাচাড়া দিয়েছে বলেই সত্যনারায়ণ সিংহ নামক নকশালপন্থী বলে পরিচিত ব্যক্তিটি যেমন 'জনতা'র কোলে আশ্রয় নিয়েছেন, তেমনি কিছু কিছু ব্যক্তি আবার প্রতিবিপ্লবী ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী পার্টিগুলির বামফ্রন্টের মধ্যেও প্রগতিশীলতার পরিচয় পেয়ে বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই প্রতিবিপ্লবী ফ্রন্টের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করতে দ্বিধা করেননি। এই দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা ভারতীয় বিপ্লবীদের নির্বাচন বয়কটের সঠিক রণনীতি ও রণকৌশলকে বর্জন করে বিপ্লবীদের আবার পার্লামেণ্টারী রাজনীতির মধ্যে নিয়ে যেতে চাইছেন। এইভাবেই এই সুবিধাবাদী নেতারা একসময়ে যেমন সি. পি. আই (এম-এল)-এর নৈরাষ্ট্রবাদী কার্যকলাপকে সমর্থন ক'রে প্রকৃত বিপ্লবী লাইনকে বিপথগামী করেছিল, আজ তেমনি তারা আবার মুখোশ পরিবর্তন করে সঠিক বিপ্লবী লাইনকে পরিমার্জিত করে সংশোধনবাদী লাইনে পরিণত করতে চাইছে।

সুতরাং, আজ যাঁরা ভারতবর্ষে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সে-তুং চিন্তাধারায় প্রকৃত বিপ্লবী লাইন ও সাচ্চা বিপ্লবী নেতৃত্ব গঠন করতে চান, তাঁদের অবশ্যই এই চরম দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ ও বামপন্থী সুবিধাবাদের প্রতিটি ঝোঁকের বিরুদ্ধে নিরলস আদর্শগত সংগ্রাম করতে হবে। কারণ এই দুই ধরনের সুবিধাবাদই হল একই বৃন্তের দুই বিষাক্ত ফল। ভুলে গেলে

উপসংহার

চলবে না মহান লেনিনের সেই বিখ্যাত উক্তি: "অর্থনীতিবাদীরা আর সন্ত্রাসবাদীরা স্বতঃস্ফূর্ততারই দুটি প্রান্তবিন্দুতে মাথা নোয়ায়: অর্থনীতিবাদীরা মাথা নোয়ায় বিশুদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততার পায়ে; **সন্ত্রাসবাদীরা মাথা নোয়ায় বুদ্ধিজীবীদের আবেগময়ী রোষের স্বতঃস্ফূর্ততার পায়ে।** বৈপ্লবিক আন্দোলনের সাথে শ্রমিক

শ্রেণীর আন্দোলনের গাঁটছড়া বেঁধে একটা অখণ্ড সামগ্রিকতা সৃষ্টি করবার ক্ষমতা এইসব বুদ্ধিজীবীর নেই। **বিশ্বাস যারা হারিয়ে ফেলেছে, কিম্বা সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস যাদের কোনকালেই ছিল না, তাদের পক্ষে সন্ত্রাসসৃষ্টির পথ ছাড়া রোষ এবং বৈপ্লবিক উদ্যম প্রকাশের অন্য কোন পথ বেছে নেওয়া শক্ত।"**[৫৫] (বড় হরফ আমাদের)

তাই যেমন আমাদের কোন অন্ধ মতবাদকে আঁকড়ে না থেকে সামাজিক কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করতে হবে, তেমনি নৈরাষ্ট্রবাদের প্রবক্তা এইসব অস্থিরমতি বুদ্ধিজীবী প্রচারিত ভারতীয় সমাজবিকাশ সম্পর্কে আবেগপ্রবণ ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা অনুসরণ না করে, মার্কস-বাদ-লেনিনবাদ-মাও সে-তুং বিচারধারার আলোকে, যুক্তি-তর্ক-ঐতিহাসিক প্রমাণের ভিত্তিতে আমাদের নতুন করে ভারতীয় সমাজের বিকাশ ও বিভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকার মূল্যায়ন করতে হবে। বলাবাহুল্য, এই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিতর্ক থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তা সমাধান করতে হবে সুস্থ মতাদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমে। নৈরাষ্ট্রবাদের বিরুদ্ধে এই আদর্শগত সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে, যে অসংখ্য সৎ বিপ্লবী বিগত আন্দোলনে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তাঁরা ক্ষুদিরামের মত অচেতনভাবেই এই ভ্রান্ত মত-বাদের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন, এবং তাঁদের অসীম সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ তাই ক্ষুদিরামের মতই ভারতীয় জনগণের কাছে আদর্শ হয়ে থাকবে। এই একই ভাবে যে সমস্ত সাধারণ কর্মীরা এখনও তাঁদের ভুলগুলি উপলব্ধি করতে পারছেন না, তাঁদের মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালালেও, তাঁদের প্রতি যথেষ্ট নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে ভুলগুলি শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। নেতা ও কর্মী, সচেতন ভুল ও অচেতন ভুলের মধ্যে অবশ্যই আমাদের সীমারেখা টানতে হবে—এটাই হল সমালোচনার সঠিক মার্কসবাদী-লেনিন-বাদী পদ্ধতি। এই সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে আবার আমরা প্রকৃত নকশালবাড়ীর পথকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব, ভারতীয় বিপ্লবের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হব, এবং অদূর ভবিষ্যতে একটি মহাপরাক্রান্ত সঠিক শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গঠন করতে সক্ষম হব। সুতরাং সংশোধনবাদের সঙ্গে সঙ্গে নৈরাষ্ট্রবাদের বিরুদ্ধে এক তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নৈরাষ্ট্রবাদের সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

এটা হল বিপ্লবীদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব। তা' না হলে কিন্তু নারদনিকদেব মতই ইতিহাসে বিপ্লবীদের স্থান নৈরাষ্ট্রবাদী হিসাবেই চিহ্নিত হবে থাকবে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসাবে নয়। অই আমাদের লেনিনের মতই ঘোষণা করতে হবে—পুলিশের উস্কানীদাতারা ও শাসকশ্রেণীর অনুচররা আজ যতই প্রচার করুক না কেন যে নকশালবাড়ীর আন্দোলন প্রথম থেকেই নৈরাষ্ট্রবাদী চরিত্রের, কিন্তু প্রকৃত নকশালপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে সি. পি. আই. ( এম-এল ) ও অন্যান্য যে কোন গ্রুপের নৈরাষ্ট্রবাদী কার্যকলাপের কোন সংশ্রবই নেই ; তা ছিল একটা সাময়িক বিচ্যুতি মাত্র।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# রামমোহন রায়ঃ বৃটিশ অনুচর না বস্তুবাদী স্বদেশপ্রেমিক ?

সাধারণভাবে নৈরাষ্ট্রবাদীরা ইতিহাস ও সমাজবিকাশের ধারা সম্পর্কে যে চূড়ান্ত অজ্ঞতা ও অবিবেচনার প্রমাণ যেন তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় আধুনিক ভারতীয় নৈরাষ্ট্রবাদীদের চিন্তাধারায়। ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞানতাবশতঃই ভারতীয় নৈরাষ্ট্রবাদীরা যুগ-কাল-ক্ষেত্র বিচার না করে, তাঁদের একপেশে অদ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যে কোন ব্যক্তিকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়ে থাকেন। আজ নৈরাষ্ট্রবাদীরা যে সমস্ত ভারতীয় ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। এ বিষয়ে অবশ্য তাঁদের খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। কারণ বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত কিছু ব্যক্তি এই নৈরাষ্ট্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রস্তুত করেছেন। এঁরা আবার তাঁদের অস্ত্রগুলো সংগ্রহ করেন বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের অস্ত্রাগার থেকে। এ জন্যই গান্ধী থেকে রমেশচন্দ্র মজুমদার পর্যন্ত বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের মূল্যায়নের সঙ্গে এই সব তথাকথিত বিপ্লবীদের বক্তব্যের অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীযুত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী রামমোহনকে বামন আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন—"যদি তিলক ও রামমোহনের ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শ না লাগত, তাহলে তাঁরা আরও মহান ব্যক্তি হতে পারতেন। চৈতন্য, শঙ্কর, কবীর ও নানকের তুলনায় রামমোহন ও তিলক এতই বামন, যাঁদের জনসাধারণের ওপর কোন প্রভাবই ছিল না। এই সব বৃহৎকায় পুরুষের সামনে

**আধুনিক নৈরাষ্ট্রবাদীদের রামমোহন বিরোধিতা**

রামমোহন ও তিলক **বামন** মাত্র।"[৫৬] (বড় হরফ আমাদের) আর বিগত দশকে সম্ভবতঃ গান্ধীর এই সত্যদর্শন (!) দ্বারা উদ্দীপিত হয়েই একালের প্রথিতযশা ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় রামমোহন সম্পর্কে তাঁর পূর্বমূল্যায়নের পরিবর্তন করে "ঘুষখোর", "সুদখোর", "কল্পনাবাদী"[৫৭] রামমোহনের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের পরিচয় পেয়েছেন। আর বিস্ময়কর হলেও সত্য যে তথাকথিত বিপ্লবীরা সর্বাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর নামে এই প্রতিবিপ্লবীদের বক্তব্যের মধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু কি কারণে এই সব বিপ্লবীর দল বামমোহন প্রমুখ ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়াশীল বলেন? কি এঁদের যুক্তি?

এঁদের যুক্তিগুলো হল সেইরকম, যাকে লেনিন বলেছেন—"*general platitudes against exploitation*", অর্থাৎ শোষণের বিরুদ্ধে নিছক মামুলী মন্তব্য, যার পুনরাবৃত্তি বিগত দু'হাজার বছরেব মানব ইতিহাসে বারবার শোনা গেছে। সাম্রাজ্যবাদ, নিপীডন, শোষণ, পবজাতি কর্তৃক শাসন প্রভৃতি মামুলী শব্দাবলী প্রয়োগ করে, এই সমস্ত নৈরাষ্ট্রবাদীরা বলেন—যেহেতু বামমোহন বৃটিশ শাসনকে সমর্থন করেছিলেন, বৃটিশ বাজপুরুষদের প্রশংসাভাজন ছিলেন, বৃটিশ আনুকূল্যে ব্যবসা করতেন, অথবা বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে বৃটিশ পণ্য অর্থনীতিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, সেইহেতু রামমোহন হলেন 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদেব দালাল'। আর একজন সাম্রাজ্যবাদের দালালকে ত' প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবেই ইতিহাসে স্থান করে নিতে হবে! এই রকমই একজন লেখক "প্রচলিত ইতিহাস ও অবহেলিত তিতুমীর" শীর্ষক পুস্তকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন—রামমোহন প্রতিক্রিয়াশীল এবং তিতুমীর বিপ্লবী। কিন্তু ইতিহাস সম্পর্কে এঁদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা যে কি পরিমাণ, তা যে কোন সচেতন পাঠকেরই চোখে পড়তে বাধ্য। উক্ত পুস্তকের লেখক তিতুমীরের বিপ্লবী গুণের প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেছেন—"অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী নিরবচ্ছিন্ন সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের ঝড় তাঁকে বিদ্রোহী বীরে পরিণত কোরেছিল।"[৫৮] তিতুমীরের বিদ্রোহী ভূমিকা সম্পর্কে আমরা নিঃসংশয়। কিন্তু এই বাক্যটি থেকে কি মনে হয় না যে লেখকের ধারণা উনবিংশ শতাব্দী, এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বৃটেন সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়েছে? প্রকৃতই কি তাই?

যাঁরা লেনিনের 'সাম্রাজ্যবাদ' গ্রন্থখানি পাঠ করেছেন ( এমন কি যাঁরা করেনও নি ), সবাই জানেন যে মার্কসবাদী সাহিত্যে সাম্রাজ্যবাদ শব্দটি একটি বিশেষ অর্থ বহন করে এবং তা' হল পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়। লেনিন দেখিয়েছেন আন্তর্জাতিকভাবে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয় ১৯০০ সাল্ নাগাদ। অবশ্য লেনিন বলেছেন পুঁজিবাদ আন্তর্জাতিকভাবে ১৯০০ সাল নাগাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হলেও, বৃটেনের ক্ষেত্রে এই রূপান্তরটি কিছু আগেই শুরু হয়েছে। তাই লেনিন বলছেন, "বিশ্বধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদী কালটি, যা ১৮৯৮-১৯০০ সালের আগে শুরু হয়নি, তা মার্কস বা এঙ্গেলস কেউই দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এমনকি উনবিংশ শতকের মধ্যভাগেই সে সাম্রাজ্যবাদের অন্ততঃ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য-সূচক গুণাবলী প্রকাশ করেছিল : (১) বিপুল উপনিবেশ এবং (২) একচেটিয়া মুনাফা ( বিশ্ববাজারে তার একচেটিয়া অবস্থানের জন্য )। উভয়ক্ষেত্রেই সে সময়ে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে ইংল্যাণ্ড ছিল একটি **ব্যতিক্রম**......"৫৯ ( বড় হরফ আমাদের )

অবশ্য লেনিনের উপরোক্ত উক্তি থেকে এই সিদ্ধান্তগ্রহণ ভুল হবে যে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগেই বৃটেন একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হয়েছিল। মনে রাখা প্রয়োজন, বৃটেন সাম্রাজ্যবাদেব দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করলেও তৎকালীন বৃটিশ আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ছিল সম্পূর্ণ অবাধ-প্রতিযোগিতা স্তরের। এই কারণেই ১৮৪০-৬০ সালের বৃটিশ অর্থনীতিকে লেনিন "অবাধ-প্রতিযোগিতার সর্বাপেক্ষা বর্ধিষ্ণু" যুগ ৬০ বলে বর্ণনা করেছেন। লেনিন কর্তৃক উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বৃটেনের এই দুটি সাম্রাজ্যবাদী বৈশিষ্ট্য উল্লেখের অর্থ হল—যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজি একচেটিয়া পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়, অন্য ধনতান্ত্রিক দেশের তুলনায় বৃটেনের ক্ষেত্রে সেই প্রক্রিয়াটি কিছু আগেই শুরু হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই সময়কার বৃটেনকে কিছুতেই একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ বলা যাবে না। লেনিনও তা বলেন নি। এই জন্যই তিনি আন্তর্জাতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের কালকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের সময়কাল বলে গণ্য করেছেন; বৃটেনের জন্য অন্য কোন বিশেষ সময়কালের নির্দেশ দেন নি। তবে এই বৈশিষ্ট্য দুটিই ক্রমে ক্রমে পরিণত হয়ে উনবিংশ শতকের সপ্তম

দশকের শেষ দিক থেকে বৃটেনকে বেশ কিছুটা সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র দিয়েছিল।

কিন্তু এই সমস্ত বুদ্ধিজীবী, যাঁরা নাকি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ইতিহাস বিচার করছেন বলে দাবী করেন, তাঁদের মার্কসবাদের ন্যূনতম জ্ঞানটুকুও যে নেই, তাব প্রমাণ হল তাঁরা সাম্রাজ্যবাদেব বিকাশ সম্পর্কে মার্কসবাদী ব্যাখ্যা না জেনেই যথেচ্ছভাবে সাম্রাজ্যবাদ শব্দটি ব্যবহার করে যান—তা উনবিংশ শতকেই হোক আর অষ্টাদশ শতকেই হোক। আর তাঁদের কাছে এই বিকৃত মার্কসবাদী ভাষ্যের পরিবেশনই হল জনগণের মধ্যে মার্কসবাদের প্রচার! মার্কসবাদ সম্পর্কে এই অজ্ঞানতাব ফলেই এঁরা পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকাটিকে গণ্য করার প্রয়োজনবোধ করেন না, এবং সাধারণভাবে যে কোন সময়ে পুঁজিবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রকেই প্রতি-ক্রিয়াশীল লেবেল এঁটে দেন। কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে সামান্যতম পরিচিত ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে পুঁজিবাদের বিকাশেব সময়, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামে পুঁজিবাদ কি অভূতপূর্ব প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অন্ধ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজে রূপান্তর কোন শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে হয় নি। উঠতি বুর্জোয়াদের একদিকে যেমন সামন্তশ্রেণীর হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হয়েছিল, তেমনি অপরদিকে ধর্ম, কুসংস্কাব থেকে শুরু কবে সমস্ত প্রকাবের সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতিব বিরুদ্ধে তাদের দীর্ঘ সাংস্কৃতিক আক্রমণও চালাতে হয়েছিল। উঠতি বুর্জোয়াশ্রেণী ধর্ম, অন্ধতা, কুসংস্কার, বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করেই জন্ম দিয়েছিল আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার। প্রকৃতি বিজ্ঞান থেকে সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান পর্যন্ত সমস্ত আধুনিক বিজ্ঞানেরই সৃষ্টি এই উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্যোগে। উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণীই নিজেদের স্বার্থে নিজ নিজ দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে থাকা, বিচ্ছিন্ন অধি-বাসীদের ঐক্যবদ্ধ করে আধুনিক জাতি বা নেশান তৈরী করেছিল। একথা ঠিকই যে এই বুর্জোয়াসৃষ্ট জাতিই পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলে এই জাতি গঠন ছিল পুঁজিবাদের বিকাশের পূর্বসর্ত এবং বিচ্ছিন্ন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের তুলনায় এক বিরাট বিপ্লবী পদক্ষেপ। 'অবাধ বাণিজ্য' বা লেই সে ফেয়ার অর্থনীতির স্বার্থেই

উঠতি বুর্জোয়ারা প্রথম সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা প্রচার করেছিল, এবং ফিউডাল এ্যাব্‌সলিউটিজম্‌ বা সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের পরিবর্তে বুর্জোয়া গণতন্ত্র সৃষ্টি করেছিল। মার্কসবাদ এই কারণেই মনে করে যে বুর্জোয়াশ্রেণী এবং ধনতন্ত্র একসময়ে ঐতিহাসিকভাবে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু বিশ্বধনতন্ত্র তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে, একচেটিয়া পুঁজিবাদে, রূপান্তরিত হয়ে এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করল এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্থান দখল করল সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া। লেনিন তাই বললেন, "এই নতুন অর্থনীতির, অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজিবাদের (সাম্রাজ্যবাদ হল একচেটিয়া পুঁজিবাদ), রাজনৈতিক উপরি কাঠামো হল গণতন্ত্র থেকে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় পরিবর্তন। অবাধ প্রতিযোগিতার সঙ্গে খাপ খায় গণতন্ত্র; আর একচেটিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া।"৬১

বিশ্বধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়ে যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিল, তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশের বুর্জোয়ারাও তাদের প্রগতিশীল চরিত্র হারিয়ে ফেলে অর্জন করল প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র। যদিও ঐতিহাসিকভাবে দেখলে সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়াশ্রেণীর আর প্রগতিশীল ভূমিকা রইল না, কিন্তু বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে বলা যায় বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল চরিত্র আন্তর্জাতিকভাবে আরও কিছু দিন অক্ষুণ্ণ রইল। তাই সঠিকভাবে বললে বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রেণীগতভাবে ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের পরই আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করে। বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের উত্থানের পরও বিশেষ বিশেষ দেশের, বিশেষতঃ এশিয়ার মত পশ্চাৎপদ অঞ্চলের বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল চরিত্র ছিল বলেই ১৯১২ সালে লেনিন এশীয় বুর্জোয়াদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "কিন্তু এশিয়ায় **এখনও** আন্তরিক, জঙ্গী ও সুসঙ্গত গণতন্ত্র রক্ষা করতে সক্ষম এমন এক বুর্জোয়াশ্রেণী বর্তমান যারা হল ফরাসী এনসাইটেনমেণ্টের মহান ব্যক্তিগণ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই মহান নেতৃবৃন্দের সুযোগ্য কমরেড হওয়ার উপযুক্ত।"৬২

লেনিন যে দৃষ্টিভঙ্গীতে পুঁজিবাদের বিকাশ ব্যাখ্যা করেছেন তা'হল মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু নৈরাষ্ট্রবাদীদের মধ্যে সমাজবিকাশ সম্পর্কে এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুপস্থিতির জন্যই তাঁরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ যুগ—অবাধ

প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া পুঁজিবাদের মধ্যে যে কোন মৌলিক পার্থক্য আছে, তা স্মরণ রাখার আবশ্যকতা বোধ করেন না, এবং সে কারণেই তাঁরা উনবিংশ শতাব্দী, এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর বুর্জোয়াদেরও প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে করেন। আর এই অজ্ঞতার দরুনই এঁরা রামমোহনের মত ব্যক্তিদের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে উপেক্ষা করতে কোন সংকোচ অনুভব করেন না। বাস্তবিক পক্ষে এঁরা যখন রামমোহন প্রমুখ ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়াশীল বলেন, তখন যেন তাঁদের এই সুপ্ত বাসনাই ব্যক্ত হয় যে, সেই উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে, ভারতের মত পশ্চাৎপদ দেশে যখন সবেমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে, সেই সময়েই রামমোহনের মত ভারতীয়দের পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন অনুযায়ী কাজ করা যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু রামমোহনের সময়কালটি কি? বামমোহনেব জন্ম ১৭৭২ সালে ( মতান্তরে ১৭৭৪ ) আর মৃত্যু ১৮৩৩। ১৭৯৭ সালে বামমোহনের কলকাতায় বসবাসকেই বলা যেতে পারে তাঁর কর্মজীবনের শুরু, যদিও তাব বহু আগেই, মাত্র যোল বছর বয়সে, তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম পুস্তক রচনা করেন। অর্থাৎ যখন তাঁর কর্মজীবনের শুরু, তার কিছু আগে ফরাসী বিপ্লবের সূচনা হলেও ফরাসী বুর্জোয়ারা শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে ব্যর্থ হয়েছে; ইউরোপের ১৮৪৮ সালের বিপ্লব সম্পন্ন হতে একান্ন বছর দেরী, এবং মার্কসবাদের জনক কার্ল মার্কস-এর জন্ম তার একুশ বছর পরে। সেই সময়ে যদি রামমোহনকে বুর্জোয়া চিন্তাধারার দোষে প্রতিক্রিয়াশীল বলে দায়ী করা হয়, তা'হলে কি এই সমস্ত ব্যক্তিদের অজ্ঞতাই প্রমাণিত হয় না? এই অজ্ঞতারই তাঁরা চূড়ান্ত প্রমাণ দেন, যখন তাঁরা রামমোহনের সময়ের বৃটিশ ধনতন্ত্রকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে বর্ণনা ক'রে বিপ্লবী ভাবভঙ্গী প্রদর্শন করেন। এ প্রসঙ্গে স্বর্ণ মিত্রব মত 'মার্কসবাদী তাত্ত্বিক'দের বোধ হয় স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে যে ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লব পশ্চিম ইউরোপে ( বৃটেন ব্যতীত ) বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা করলেও, কন্টিনেণ্টাল ইউরোপেব গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়টি ১৮৭১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; আর পূর্ব ইউরোপ ও এশিয়ায় এর সূত্রপাত মাত্র ১৯০৫ সালের প্রথম রুশ-বিপ্লবে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে পরিচিত এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের অজ্ঞতা

এমনই অবস্থায় পৌঁছেছে যে এঁরা হয়ত কোনদিন লেনিনকেও প্রতিক্রিয়াশীল বলে বসবেন, যদি তাঁরা দেখেন যে লেনিন লিখেছেন, "বৃটেনে অবাধ প্রতিযোগিতার সর্বাপেক্ষা বর্ধিষ্ণু যুগে, অর্থাৎ ১৮৪০-১৮৬০ সালে তার নেতৃস্থানীয় বুর্জোয়া রাজনীতিকেরা ছিলেন উপনিবেশিক নীতির **বিরোধী,** তাঁদের মত ছিল, উপনিবেশগুলির মুক্তি, বৃটেন থেকে তাদের পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ অনিবার্য ও হিতকর। ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত 'আধুনিক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ' বিষয়ে এক প্রবন্ধে ম বের দেখিয়েছেন, ডিজরেলির মতো সাধারণভাবেই সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপাতী বৃটিশ রাজনীতিকও ১৮৫২ সালে ঘোষণা করেন: 'উপনিবেশগুলি হল আমাদের গলায় ঝোলান জাঁতাকল'।"৬৩

সুতরাং যে সময়ে বৃটিশ শাসনকে সমর্থনের জন্য রামমোহনকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে দায়ী করা হচ্ছে, সে যুগেও, এমন কি রামমোহনের মৃত্যুর প্রায় ত্রিশ বছর পরেও দেখা যাচ্ছে—অবাধ প্রতিযোগিতার যুগে, বৃটিশ বুর্জোয়াদের অগ্রণী রাজনীতিবিদরা উপনিবেশবাদের বিরোধিতা করতেন এবং তাঁদের কাছে উপনিবেশগুলোর মুক্তিই কাম্য ছিল।

প্রকৃতপক্ষে এত মার্কসবাদ অধ্যয়ন ( ! ) সত্ত্বেও আধুনিক নৈরাষ্ট্রবাদী ও তথাকথিত বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের যা এখনও বোধগম্য হচ্ছে না, রামমোহন সেই যুগে তাঁর বস্তুবাদী চিন্তা ও দূরদৃষ্টির সাহায্যে তা বুঝতে পেরেছিলেন, এবং সে যুগের সর্বাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী, অর্থাৎ বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন।

**প্রাক্-বৃটিশ ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে রামমোহন ও মার্কস**

আর সে কারণেই রামমোহন প্রগতিশীল। আর সেদিন যে সমস্ত ভারতীয় সামন্তপ্রভুরা বৃটেনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বলেছিল, তারা কোন স্বদেশ প্রেমের তাড়নায় তা করেনি, করেছিল বৃটিশ পণ্য অর্থনীতির সর্বগ্রাসী ক্ষুধার হাত থেকে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য। এজন্যই তারা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। অনেকেই মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে, শুধুমাত্র ভাবাবেগদ্বারা পরিচালিত হয়ে বৃটিশ কর্তৃক ভারত অধিকারের বিষয়টি বিচার করে থাকেন, এবং স্বভাবতঃই ভারতের পরাধীনতার বিষয়টি তাঁদের ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির কাছে পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তাঁরা দাবী করে বসেন যে রামমোহন-সময়ে প্রকৃত প্রগতিশীল ব্যক্তি তিনিই, যিনি বৃটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু সত্যই কি ভারত প্রথম বৃটিশ

কর্তৃক বিজিত হল? এ প্রশ্নের উত্তর মার্কসের ভাষাতেই দেওয়া যাক্। "দেশটা শুধু হিন্দু আর মুসলমানেই বিভক্ত নয়, বিভক্ত উপজাতিতে, বর্ণাশ্রম-জাতিভেদে: এমন একটা স্থিতিসাম্যের ভিত্তিতে সমাজের কাঠামো গড়া যা এসেছে সমাজের মধ্যস্থ একটা পারস্পরিক বিরাগ ও প্রথাবদ্ধ বিচ্ছিন্নতা থেকে;—এমন একটা দেশ ও এমন একটা সমাজ, সে কি বিজয়ের অবধারিত শিকার হয়েই ছিল না? হিন্দুস্থানের অতীত ইতিহাস না জানলেও অন্তত এই একটি মস্ত ও অবিসংবাদী তথ্য তো রয়েছে যে এমন কি এই মুহূর্তেও ভারত ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়ে আছে ভারতেরই খরচে এক ভারতীয় সৈন্য-বাহিনী দ্বারাই? বিজিত হবার- নিয়তি ভাবত তাই এড়াতে পারত না; তার অতীত ইতিহাস বলতে যদি কিছু থাকে তো তার সবখানি হল পরপর বিজিত হবার ইতিহাস। ভারত সমাজের কোন ইতিহাসই নেই—অন্তত জানা কোন ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস বলে যা বলি, সে শুধু একের পর এক বহিরাক্রমণকারীর ইতিহাস, যারা ঐ অপ্রতিরোধী ও অপরিবর্তমান সমাজের নিষ্ক্রিয় ভিত্তিতে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গেছে।"[৬৪]

যে কোন স্কুল ইতিহাসেই মার্কসের উক্তির সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সত্যিই বৃটিশের ভারত দখলের আগে গোটা দেশটার বৈশিষ্ট্যই ছিল অনৈক্য। জাতিতে-জাতিতে, উপজাতিতে-উপজাতিতে, রাজায়-রাজায় লড়াইটা যেন তদানীন্তন ভারতবর্ষের একটা প্রাত্যহিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে মোঘলরা যে সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রর পত্তন করেছিল, সেটি মোঘলপূর্ব দিনের তুলনায় অনেক বেশী রাজনৈতিক ঐক্য আনলেও, কোনদিনই সর্বভারতীয় ঐক্য সৃষ্টি করতে পারেনি। বৃটিশ আসার প্রাক্কালে শুধুমাত্র মারাঠা শক্তিই নয়, বিভিন্ন শক্তি বা সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগ্রামে সমগ্র দেশটাই যেন খণ্ড খণ্ড হয়ে যেতে চাইছিল। সেই শক্তিগুলো ছিল আবার নিজেদের মধ্যে বিবদমান। আর ভারতীয়দের পারস্পরিক বিবাদের সুযোগেই অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ শক্তির পক্ষে দেশীয় নৃপতিদের পদানত করা সম্ভব হয়েছিল। একটি দেশের রাজনৈতিক ঐক্য দেশীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণ করলেই বোঝা যাবে। সকলেই জানেন যে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে শত বৎসরের (১৩৩৭-১৪৫৩) যুদ্ধ চলেছিল তাতে জোয়ান অফ

মার্ক নামে একজন ক্লার্ক রমণী ফ্রান্সের পক্ষে কি অসীম শৌর্য-বীর্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু ফ্রান্স তখন বার বার চেষ্টা করেও এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে সক্ষম হচ্ছিল না। তার কারণ হল ইংল্যাণ্ডের সামন্ততন্ত্র ছিল ফরাসী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে অনেক বেশী উন্নত। আর এই সামাজিক অগ্রগতির ফলেই ইংল্যাণ্ডের ব্যারণরা একটা ঐক্যবদ্ধ ছিল, সেই ঐক্য ফ্রান্সে ছিল না। অবশ্য এই যুদ্ধের একেবারে শেষ দিকে, একাদশ লুই এর (১৪৬১ ১৪৮৩) রাজত্বকালে ফ্রান্সের রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে ওঠে, অবশেষে যা ফ্রান্সকে ইংল্যাণ্ডের কর্তৃত্বের হাত থেকে রক্ষা করে। স্বাধীনতা রক্ষার অবশ্য প্রয়োজনীয় সর্ত, এই রাজনৈতিক ঐক্য ভারতবর্ষে ছিল না বলেই মার্কসকে বলতে হয়েছে, "বিজিত হবার নিয়তি ভারত তাই এড়াতে পারত না।" তাই যখন বাস্তব অবস্থা হল স্বাধীনতা রক্ষার কোন ক্ষমতাই ভারতবর্ষের নেই, আর বিভিন্ন রাষ্ট্রই ভারতবর্ষকে গ্রাস করতে চাইছে, তখন প্রশ্নটা ভারত বিজিত হবে কি হবে না তা নয়, প্রশ্ন হল কোন দেশ কর্তৃক ভারত অধিকার আমাদের কাছে সুবিধাজনক হবে? মার্কস অত্যন্ত সুস্পষ্টভাষায় বলেছেন, 'ভারত বিজয়ের অধিকার ইংরাজের ছিল কি না, এটা তাত প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন এই, আমরা কি চাই তুর্কী, পারসীক কি রুশদের দ্বারা ভারতবিজয় নাকি বৃটনদের দ্বারা ভারত বিজয়?"[৬৫]

কিন্তু রামমোহন কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বৃটেনের ভারত বিজয়কে মেনে নিয়েছিলেন? প্রাক বৃটিশ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঐক্য সম্পর্কে রামমোহনের ধারণাই বা কিরকম ছিল? রামমোহন এ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তা থেকে একটি অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি:

"১৭১২ সালে মোঘল উদয়-নক্ষত্র নিম্নাভিমুখী হয়ে পড়ল, আর সেই থেকে তা ক্রমশঃ দিকচক্রবালের নীচে ডুবতেই থাকে। প্রাদেশিকই রাজপুত্ররা রাষ্ট্রের কল্যাণের থেকে নিজস্ব আরামপ্রিয়তাকেই অগ্রাধিকার দিতেন এবং সফলতার জন্য নির্ভুল নীতি ও সামরিক শৌর্যের পরিবর্তে তারা রাজবংশীয় খ্যাতির ওপরই নির্ভর করতেন। শুধুমাত্র রাজপদ নয়, তাদের জীবনযাত্রাও নির্ভর করত অভিজাতদের সদিচ্ছার ওপর এবং এই সব অভিজাতরা কার্যতঃ সার্বভৌম ক্ষমতা থেকে স্বাধীনতাও অর্জন করেছিল, আর এদের প্রত্যেকেরই

প্রচেষ্টা ছিল ব্যক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধির।

"বর্তমানে সাম্রাজ্যের সমগ্র দক্ষিণ ও পূর্বাংশ এবং পশ্চিমী প্রদেশগুলির অনেকগুলিই ক্রমশঃ ইংরেজ অধিকারভুক্ত হয়ে পড়েছে। একটা দেশে **যেখানে স্বদেশ প্রেমের ধারণা কখনই পথ খুঁজে পায় নি,** সেখানে ইংরেজরা যে সেনাবাহিনী নিয়োগ করেছে তা প্রধানতঃ ভারতীয় দ্বারা গঠিত। বাস্তবে বহু বিদ্রোহী অভিজাতদের শাসন থেকেই এই সব অঞ্চলগুলো বৃটিশ সম্পদে পরিণত হয়েছে।"

বৃটিশের পক্ষে ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার কি করে সম্ভব হল, সে সম্পর্কে রামমোহন আরও বললেন, "...হিন্দুস্তান বাদশা জাহাঙ্গীর ও তাঁর বহু উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে বৃটিশের এদেশে বাণিজ্যিক কারখানা স্থাপনের অনুমতি সংগ্রহে এবং নিরাপত্তা উপভোগ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অর্জনে তাদের সফলতার পুঙ্খানুপুঙ্খতায়; বৃটিশের যে বিজয় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে ভারতের বৃহত্তর অংশে বিস্তৃত হয়েছে, সেক্ষেত্রেও— বিজয়গুলোর **প্রধান কারণ যেমন দেশীয় রাজা ও প্রধানদের অনৈক্য** ও নীচমনা ব্যবহার, তেমনি যুদ্ধ বিদ্যার আধুনিক উন্নতি সম্পর্কে প্রাচ্যের অজ্ঞতা,..." (বড় হরফ আমাদের) আর রাজনৈতিক ঐক্যের এই অনুপস্থিতিই যে ভারতবর্ষকে বার বার বিদেশী শক্তির কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য করেছে, তা উল্লেখ করে রামমোহন সবশেষে মন্তব্য করলেন, "**দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতিটি বুনন ধ্বংস করে বিপুল সংখ্যক জাতি ও গোষ্ঠীর ধারাবাহিক প্রচলনের ফলে** বিভিন্ন যুগে দেশটি বার বার আক্রান্ত হয়েছে এবং সাময়িকভাবে বিদেশী রাজাদের পদানতও হয়েছে।"৬৬

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে ১৮৩১ সালে যখন কার্ল মার্কসের বয়স মাত্র পনের, তখনই 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুচর ও ভারতীয় সামন্তপ্রভু' রামমোহন এই উক্তিগুলি বৃটিশ পার্লামেণ্ট নিয়োজিত সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্যদানের সময় করেছিলেন। কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নয়, রামমোহনের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী রামমোহনকে প্রবৃত্ত করেছিল এই বাস্তব বিশ্লেষণে। আর সে বিশ্লেষণ যে এ বিষয়ে মার্কসের বিশ্লেষণের অনুরূপ, তা ত' দেখাই গেল। রামমোহন-চরিত্রের অন্যতম

বৈশিষ্ট্য এই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই, রামমোহন ব্যক্তিগত ভাবাবেগদ্বারা বিচলিত না হয়ে, 'পরাধীনতার গ্লানি' প্রভৃতি শব্দকে উপেক্ষা করে বাস্তব সত্যকে মেনে নিয়েছিলেন—'বিজিত হবার নিয়তি ভারত তাই এড়াতে পারত না।' শুধু তাই নয়, তাঁর এ উপলব্ধিও হয়েছিল যে রুশ, পারসীক কিংবা তুর্কী শাসনের অর্থ দাঁড়াবে আর এক অর্ধ-বর্বর সাম্রাজ্য কর্তৃক শাসন। অবশ্য রামমোহন প্রথম দিকে এই সত্যটিকে চিনতে পারেন নি। তাই তাঁর মনে হয়েছিল যে বৃটিশের বিরোধিতা করাই তৎকালীন ভারতবাসীর কর্তব্য। পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরিদর্শন করার পরই এ বিষয়ে তাঁর সম্যক জ্ঞান গড়ে ওঠে। ১৮৩২ সালে রামমোহন গর্ডনকে পত্রাকারে লিখিত তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনীতে লিখেছেনঃ "·····ভাবতে বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠার প্রতি চরম বিদ্বেষের মনোভাব থেকে আমি আমার যাত্রারম্ভ করলাম, এবং প্রধানতঃ আভ্যন্তরীণ হলেও কিছু কিছু হিন্দুস্তান বহির্ভূত দেশও অতিক্রম করলাম। আমি যখন কুড়ি বছর বয়সে পৌছুলাম, বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর আনুকূল্যে পুনঃস্থাপন করলেন। তারপর আমি ইউরোপীয়দের সঙ্গে পরিচিত হলাম ও তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করতে শুরু করলাম, এবং অনতিবিলম্বে তাঁদের আইন ও শাসনপ্রণালী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হলাম। তাঁদের অধিকতর বুদ্ধি-বৃত্তি, অবিচল পরিমিত ব্যবহার দেখে আমি তাঁদের বিরুদ্ধে আমার প্রতিকূল ধারণা পরিত্যাগ করলাম এবং এই ভেবে তাঁদের প্রতি অনুরক্ত হলাম যে তাঁদের শাসন, যদিও একটা **দাসত্বের চিহ্ন**, কিন্তু তা আরও ক্ষিপ্রগতিতে ও নিশ্চিতভাবে দেশীয়দের উন্নতি সাধনের দিকে ধাবিত হবে।"৬৭ ( বড় হরফ আমাদের )

সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিমে যখন ফরাসী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সবেমাত্র শুরু হয়েছে, আর কন্টিনেণ্টাল ইউরোপের অন্যত্র প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তপ্রভুরা শাসন ক্ষমতা চালাচ্ছে, সেই অবস্থায় এইটাই কি একমাত্র বস্তুবাদী বিচার নয় যে বৃটেনই হচ্ছে সে যুগের সর্বাধুনিক রাষ্ট্র, যেখানে পুঁজিবাদের প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রান্ত? এখানেই রামমোহনের প্রগতিশীলতা।

রামমোহনের এই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর তৎকালীন

ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে মূল্যায়নে। রামমোহন যে সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই সমাজের চরিত্রটি কিরূপ ছিল ? অনেকেই বলবেন যে সেই সমাজটি ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। কিন্তু শুধু সামন্ততান্ত্রিক বলাটাই যথেষ্ট নয়, ভারতীয় সমাজ ছিল এশীয় স্বৈরাচারের এক দুর্ভেদ্য দুর্গ, অপরিবর্তনীয়—স্থিতিশীল সমাজের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষে কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পর ঘরোয়া বন্ধন, যা গ্রামগুলোকে স্বয়ংনির্ভর চরিত্র দিয়েছিল, সেইটাই ছিল এশীয় স্বৈরাচারের বাস্তব ভিত্তি। ভারতবর্ষে এই এশীয় স্বৈরাচারের এক প্রধান অস্ত্র ছিল হিন্দুধর্ম, যার সাহায্যে ভারতীয় সংস্কৃতি রুদ্ধ করেছিল উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ; আর এরই ফলে ভারতীয় জাতিভেদ-প্রথা, জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদের মাধ্যমে সমস্ত মানুষের কর্মোদ্যম ও আত্মবিশ্বাস হরণ করে, মানুষকে পরিণত করেছিল ঈশ্বর ও প্রকৃতির অচেতন ক্রীতদাসে। এই গ্রামসমাজগুলির স্বয়ংনির্ভরতাই বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করেছিল। প্রাক্-বৃটিশ ভারতীয় সমাজের এই বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে রামমোহনের সময়ও প্রায় পুরোমাত্রায়ই ছিল ; সবেমাত্র পরিবর্তনের পদধ্বনি শোনা যচ্ছে। তাই রামমোহনের মৃত্যুর বিশ বছর পরেও কার্ল মার্কস ভারতীয় সমাজের বর্ণনা করে বলেছেন, "…এ কথা যেন না ভুলি যে এই সব শান্ত-সরল ( idyllic ) গ্রাম-গোষ্ঠীগুলি যতই নিরীহ মনে হোক, প্রাচ্য স্বৈরাচারের তারাই ভিত্তি হয়ে এসেছে চিরকাল, মনুষ্য মানসকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কুসংস্কারের অবাধ ক্রীড়নক, তাকে করেছে চিরাচরিত নিয়মের ক্রীতদাস, হরণ করেছে তার সমস্ত কিছু মহিমা ও ঐতিহাসিক কর্মদ্যোতনা।… যেন না ভুলি যে ছোট ছোট এই সব গোষ্ঠী ছিল জাতিভেদপ্রথা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত, অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে বাহিরের অবস্থার অধীন, স্বয়ংবিকশিত একটি সমাজ-ব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্তমান প্রাকৃতিক নিয়তিরূপে এবং এই ভাবে আমদানি করেছে প্রকৃতির পশুবৎ পূজা, প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে হনুমানদেবরূপী বানর এবং শবলাদেবীরূপী গরুর অর্চনায় ভূলুণ্ঠিত করে অধঃপতনের প্রমাণ দিয়েছে।"[৬৮]

প্রাচ্য স্বৈরাচারের বিষয়টির উল্লেখ না করলেও ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে

রামমোহনের মূল্যায়নটি কিন্তু মার্কসের বক্তব্যেরই অনুরূপ। তাই তিনি ১৮২৮ সালে জন ডিগবিকে যে পত্র দেন, তার একস্থানে ভারতীয় সমাজের মূল চরিত্রটির উল্লেখ করে বললেন: "জাতিগত পার্থক্য তার অসংখ্য বিভাগ ও উপবিভাগের সূত্রপাত করে তাদের (ভারতীয়দের—লেখক) **স্বদেশপ্রেমিক মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করেছে** এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও পবিত্রীকরণ সংক্রান্ত সূত্রাবলীর আধিক্য তাদের কোন কঠিন সংকল্পের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত করে তুলেছে।"[১৯] (বড় হরফ আমাদের)

এই রকম একটি সামাজিক অবস্থা কি পুঁজিবাদের বিকাশ ভিন্ন ধ্বংস করা সম্ভব ছিল? প্রাক্-বৃটিশ এই ভারতীয় সমাজব্যবস্থা ধ্বংসের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের প্রয়োজনীয়তা মেনে নিয়েও অনেকে মনে করেন যে সমাজ-বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মেই ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় পুঁজিবাদের বিকাশ সম্ভব ছিল, এর জন্য কোন বৃটিশ হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ছিল না। এ কথা অবশ্যই ঠিক যে সমাজবিকাশের অমোঘ নিয়মেই ভারতবর্ষে কোন এক দিন পুঁজিবাদ বিকশিত হত। কিন্তু আলোচ্য সময়ে কি ভারতে পুঁজিবাদ বিকাশের লক্ষণগুলো প্রকটভাবে দেখা দিয়েছিল? বর্তমান পুস্তকের মূল লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এ আলোচনার যথেষ্ট গুরুত্ব থাকলেও এই স্বল্প পরিসরে তদানীন্তন ভারতীয় অর্থনীতির বাস্তব বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। মার্কস-এঙ্গেলস এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। তাই আমাদের আলোচনা প্রধানতঃ ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলস-এর মূল্যায়নেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কার্ল মার্কস ভারতীয় গ্রামগোষ্ঠীগুলির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হল:

**প্রাক্-বৃটিশ ভারতীয় সমাজের স্বনির্ভর স্বাভাবিক অর্থনীতি: (১) জমি মালিকানা**

"সেই সমস্ত ছোট ছোট অতি প্রাচীন ভারতীয় গোষ্ঠীগুলি, যেগুলির মধ্যে কিছু কিছু আজও বর্তমান, সেগুলির ভিত্তি হল জমির সমষ্টিগত ভোগ দখল, কৃষি ও হস্তশিল্পের সম্মিলন এবং অপরিবর্তনীয় শ্রম-বিভাজন, যা যখনই কোন নতুন গোষ্ঠীর পত্তন হয় তার একটা রেডিমেড পরিকল্পনা হিসাবে কাজ করে। একশ থেকে কয়েক হাজার একর পর্যন্ত জায়গা দখল ক'রে প্রতিটি গোষ্ঠী এক একটা ঠাসবুনন অখণ্ডতা (Compact whole) তৈরী করে যা তাদের প্রয়োজনীয় সব জিনিষই উৎপাদন করে। উৎপাদিত দ্রব্যের প্রধান অংশ গোষ্ঠীর নিজস্ব ভোগের জন্যই নির্দিষ্ট এবং তা পণ্যের রূপ গ্রহণ

করে না। ফলে বিনিময় প্রথা যে শ্রম-বিভাজনের প্রচলন করে, সমগ্র ভারতীয় উৎপাদন তার ওপর নির্ভর করে না। এখানে কেবলমাত্র উদ্বৃত্ত অংশই পণ্যে রূপান্তরিত হয়, এবং তা'ও আবার এমন কি যতক্ষণ পর্যন্ত না রাষ্ট্রের হাতে পৌঁছোয়; যে রাষ্ট্রের হাতে অবিস্মরণীয় কাল থেকে খাজনার আকারে এই সব উৎপাদিত দ্রব্যের কিছু অংশ পৌঁছে থাকে।"[১০]

ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে মার্কস-এর এই নিখুঁত বিবরণ থেকে স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় সমাজে জমিতে সামন্ততান্ত্রিক মালিকানার কোন লক্ষণই ছিল না। প্রাক্-বৃটিশ ভারতীয় জমি মালিকানার আঞ্চলিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও জমি মালিকানার মৌলিক রূপ হল গোষ্ঠী মালিকানা, ব্যক্তিগত মালিকানা নয়। এমন কি বংশানুক্রমিক শ্রম-বিভাজনের উপর স্থাপিত এই পশ্চাৎপদ ভারতীয় সমাজে যে কিছু কিছু উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময় প্রচলিত ছিল, সেই বিনিময় প্রথাও পুঁজিবাদী অর্থনীতির সর্বনিম্ন স্তরের পণ্য-বিনিময়-প্রথা ছিল না। কেবলমাত্র উৎপাদিত দ্রব্যের উদ্বৃত্ত অংশই বিনিময় করা হত। অর্থাৎ ভারতীয় সমাজে তখনও সঠিক অর্থে পণ্য উৎপাদিত হত না।

কেবলমাত্র ভারতবর্ষই নয়, গোটা প্রাচ্য সমাজ-ব্যবস্থারই একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি। কি ভাবে এই অবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকল, সে বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে এঙ্গেলস মার্কসকে প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু প্রাচ্যবাসীরা ভূমি মালিকানার এমন কি সামন্তরূপেও যে পৌঁছল না, তা ঘটল কি করে?" এই প্রশ্নর উত্তরে মার্কস এঙ্গেলসকে যে পত্র দিলেন, তার এক জায়গায় লিখলেন, "**মালিকানার ব্যাপারে,** ভারত বিষয়ে যে সব ইংরেজ লেখেন, তাঁদের মধ্যে এটা এখনো অতি **বিতর্কমূলক প্রশ্ন।** কৃষ্ণার দক্ষিণে বিচ্ছিন্ন পাহাড়ে এলাকায় ভূমিতে মালিকানা বর্তমান ছিল বলে মনে হয়।...অন্ততঃপক্ষে সারা এশিয়ায় 'জমির মালিকানা নেই', এ নীতি মহম্মদীয়রাই প্রথম প্রতিষ্ঠা করে বলে মনে হয়।"[১১]

ভারতবর্ষের জমি-মালিকানার ব্যাপারে ইংরেজ লেখকদের মধ্যে বিতর্ক থাকলেও, এ বিষয়ে মার্কস এঙ্গেলস-এর কোনরকম বিভ্রান্তি ছিল না। এ কারণেই অন্যান্য প্রবন্ধাবলীর কথা বাদ দিলেও মার্কস *Capital* গ্রন্থে 'ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত জমিমালিকানা নেই'—এ সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত

রেখেছিলেন। অনেক সময় ইউরোপীয় সামন্তপ্রভুর সমতুল্য জ্ঞানে ভ্রান্তভাবে প্রাক্-বৃটিশ ভারতীয় জমিদারশ্রেণীকে জমির প্রকৃত মালিক বলে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিরায়ত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় যে ইউরোপীয় অর্থে কোন জমিদার (ল্যাণ্ডলর্ড) ছিল না, তা এঙ্গেলস তাঁর 'এ্যান্টি-ডুরিং'-এও উল্লেখ করেছেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে এঙ্গেলস 'এ্যান্টি-ডুরিং'-এর ১৮৯৪ সালের জার্মান সংস্করণেও এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের প্রয়োজনবোধ করেন নি। এ বিষয়ে তিনি লিখছেন, "গোটা প্রাচ্যে যেখানে গ্রাম-গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র ভূমির মালিক, সেখানে ভূ-মালিক (ল্যাণ্ডলর্ড) এই শব্দটি বিভিন্ন ভাষায় দেখতে পাওয়া যাবে না। এ বিষয়ে হের ডুরিং ইংরেজ আইনজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ কবতে পারেন, যাদের **ভারতবর্ষে কে জমির মালিক?**— এই প্রশ্ন সমাধানের প্রচেষ্টা, প্রয়াত রাজা ৪২তম হেররিশ-এর ..রাত প্রহরী কে—এই প্রশ্ন সমাবানের প্রচেষ্টার মতই **ব্যর্থ হয়েছিল**।"৭২ (বড় হরফ আমাদের)

প্রশ্ন করা যেতে পারে, চিরাচরিত ভারতীয় সমাজে যদি জমিদারও জমির মালিক না হয়, তা'হলে ভারতবর্ষের যে ভূসম্পত্তি ছিল, তার প্রকৃত মালিক কি সাধারণ কৃষক? যদি বলা যায় জমিদার অথবা কৃষক কেউই সঠিক অর্থে ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিল না, তাতে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করতে পারেন। কারণ আমরা সাধারণভাবে কোন নির্দিষ্ট সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকারকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি-অধিকার বলে মনে করি। আসলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রধান ও একমাত্র বৈশিষ্ট্য হল নিয়ন্ত্রণগত অধিকার, ব্যবহারগত অধিকার নয়। অন্ততঃ মার্কসীয় অর্থনীতিতে 'নিয়ন্ত্রণগত অধিকার'—এই অর্থেই ব্যক্তিগত মালিকানা বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফলে সেই অর্থে কোন ব্যক্তি কোন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা সম্পত্তি দীর্ঘকাল, এমন কি আজীবন ব্যবহার করে আসছে বলেই উক্ত সম্পত্তিকে সেই ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলা যাবে, তা নয়। আসলে এখানে যা বিচার করতে হবে, তা'হল ব্যক্তিগত মালিকানার ওই নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্য, উক্ত সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণের অধিকার, সেটি কিভাবে পালিত হচ্ছে। কিন্তু যদি কোন একটি নির্দিষ্ট সম্পত্তির দীর্ঘকাল, এমন কি আজীবন ব্যবহারও নিয়ন্ত্রণগত অধিকার না বোঝায়, তবে এই বিশেষ অধিকারের

আসল রহস্যটি কি? এই নিয়ন্ত্রণগত অধিকারের প্রধান এবং একমাত্র সর্ত হল—যে ব্যক্তি ওই সম্পত্তি ব্যবহার করে আসছেন, তাঁর নিজের ইচ্ছানুযায়ী, প্রয়োজন অনুযায়ী, এমন কি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত খেয়ালকে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে অন্য কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি বা কর্তৃত্বের অনুমতি ব্যতিরেকেই তিনি ওই সম্পত্তির হস্তান্তর, ব্যবহারের রকমফের, পরিশেষে বিক্রয় করতে পারছেন কি না। যে কোন সম্পত্তির প্রকৃত মালিকের এই অধিকার সব সময় থাকে, এমন কি সে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োজনে তাঁর নিজ-পরিবারের সদস্যদেরও ওই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গীতে যদি চিরাচরিত ভারতীয় ভূসম্পত্তির বিচার করা যায় তা'হলে এ সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলস যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, এবিষয়ে সেই সিদ্ধান্তকেই **নির্দেশসূচক** বলে গ্রহণ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে যত ভূসম্পত্তি ছিল, তা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার কৃষক বা জমিদারের ছিল না, তারা ছিল কেবলমাত্র স্বত্বভোগী, সেই অধিকার একমাত্র ছিল রাষ্ট্রের। তাই প্রাক্-বৃটিশ ভারতীয় সমাজের সমস্ত ভূসম্পত্তির একমাত্র মালিক ছিলেন দিল্লীশ্বর (অবস্থাবিশেষে অন্য কোন সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব)। ভারতীয় ভূসম্পত্তির এই ন্যায়সঙ্গত *(de jure)* অধিকার কেবলমাত্র সার্বভৌম কর্তৃত্বের হাতে ন্যস্ত ছিল বলেই স্বত্বভোগীদের স্বত্বভোগকারী সম্পত্তি বিক্রয় করার আইনতান্ত্রিক অধিকার ছিল না। মোঘল ভারতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সম্পত্তি হস্তান্তর বা বিক্রয়ের যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সেগুলিকে ব্যতিক্রম বলেই ধরতে হবে। সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণগত. অধিকারের ক্ষেত্রে এই ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভিন্ন বাস্তব *(de facto)* অধিকারও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তরের এই ন্যায়সঙ্গত অধিকার ব্যতিরেকেই যদি কোন সমাজে দেখা যায় যে সম্পত্তির স্বত্বভোগীরা বাস্তব অধিকারবলে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করে **নিয়মিতভাবে** তাঁদের স্বত্বভোগী সম্পত্তি বিক্রয় করেন, তা'হলে সেই বাস্তব অধিকারকেও ব্যক্তি মালিকানার লক্ষণ বলেই গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে উক্ত সমাজে যদিও আইনতান্ত্রিক দিক থেকে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হয় নি, কিন্তু বাস্তবে সেই মালিকানা ইতিমধ্যেই প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু মোঘল ভারতবর্ষে স্বত্বভোগীরা যে ভূসম্পত্তির এই বাস্তব অধিকার অর্জন করেছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া

যায় না, তা'হলে জমি হস্তান্তর বা বিক্রয়ের বিক্ষিপ্ত ঘটনার পরিবর্তে জমি বিক্রয়ের নিয়মিত প্রচলন দেখতে পাওয়া যেত। স্বত্বভোগীদের এই অধিকারের অনুপস্থিতির জন্যই মার্কস-এঙ্গেলস বলেছেন ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত জমি-মালিকানা ছিল না। ভারতসহ এশিয়াব এই অবস্থার কথা বর্ণনা করে মার্কস লিখছেন: "প্রত্যক্ষ উৎপাদকবা যদি ব্যক্তিগত ভূমি-মালিকেব সম্মুখীন না হয়, বরং এশিয়ার ক্ষেত্রে যেমন উৎপাদকরা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রাধীন, যে বাষ্ট্র তাদেব শীর্ষে ভূমি-মালিক ও একই সঙ্গে সাবভৌমরূপে বিরাজ করে, তা'হলে খাজনা ও কর হল সদৃশ। অথবা বরঞ্চ বলা যায় সেখানে এই ধরনেব ভূ-খাজনার থেকে পৃথক কোন করের অস্তিত্ব নেই। এ ধবনেব অবস্থায় বাষ্ট্র কর্তৃক অবদমনের ক্ষমতা থেকে অধিকতব কোন শক্তিশালী ও অর্থনৈতিক চাপেব প্রয়োজন নেই। তখন রাষ্ট্র হয় সর্বোচ্চ প্রভু। এক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব জাতীযস্তরে ভূমি-মালিকানাব কেন্দ্রীভবনে অধিষ্ঠিত। অপর পক্ষে এখানে যদিও জমির ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার ও ভোগ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু জমিতে কোন ব্যক্তি-মালিকানা নেই।"[১১]

তা'হলে মোঘল ভারতবর্ষে জমি-মালিকানার মৌলিক রূপটিকে কি বলা যাবে? মার্কসীয় অর্থে তৎকালীন ভারতের জমি-মালিকানার মৌলিক রূপকে সমষ্টিগত সম্পত্তি বা কালেক্টিভ প্রপার্টি নামে অভিহিত করা যায়। সমষ্টিগত সম্পত্তি বলতে ঠিক কি বোঝান হয়? প্রখ্যাত মার্কসবাদী পল ল্যাফার্গ সমষ্টিগত সম্পত্তির মূল বৈশিষ্ট্যটি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেন, "সমষ্টিগত সম্পত্তি পিতার নয়, এমনকি এটা সমষ্টিগত সত্তারূপ যে পরিবার আবহমান ও এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষ ধরে চলে, তার পৃথক পৃথক সদস্যদেরও নয়। সম্পত্তিটা হল অতীত, বর্তমান, এমনকি ভবিষ্যৎ পরিবারেরও; যে সব পূর্বপুরুষের পূজাবেদী ও স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে এ হল তাদের, যে সমস্ত জীবিত সদস্য নিছক স্বত্বভোগী এবং যাঁদের দায়িত্ব হল সম্পত্তি তাঁদের বংশধরদের হস্তান্তর করার উদ্দেশ্যে পারিবারিক পারম্পয বহন করা ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করা, এ সম্পত্তি হল তাদেরই। পরিবারের প্রধান যিনি পিতা, সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে মাতাও হতে পারেন, তিনিই হলেন সম্পত্তির প্রশাসক (administrator)। সমষ্টির প্রত্যেক সদস্যের চাহিদা মেটানো হল তাঁরই দায়িত্ব। জমি যথাযথ চাষ হচ্ছে কি না এবং বাড়ীর

রক্ষণাবেক্ষণ ঠিক ঠিক হচ্ছে কি না তা দেখা তাঁরই দায়িত্ব। যাতে করে পূর্ব-পুরুষের মৃত্যুর সময় শ্রীবৃদ্ধির যে অবস্থায় পৈতৃক সম্পত্তিটি অধিকার করেছিলেন, সেই অবস্থাতেই তিনি তা উত্তরপুরুষের হাতে অর্পণ করতে পারেন। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য পরিবারের কর্তা হয়ে ওঠেন স্বৈরাচারী ক্ষমতাসম্পন্ন। তিনিই একাধারে বিচারক ও নির্বাহক ( **judge and exe-cutioner** )। তাঁর আয়ত্বাধীন পরিবারের সদস্যদের তিনিই বিচার করেন, অপরাধী বলে সাব্যস্ত করেন এবং প্রয়োজনে দৈহিক শাস্তিও দেন। তাঁর কর্তৃত্ব এতদূর বিস্তৃত যে তিনি তাঁর সন্তানাদিকে ক্রীতদাসত্বের জন্য বিক্রয় করার এবং তাঁর স্ত্রীসহ সমস্ত অধীনদের মৃত্যুযন্ত্রণা প্রদান করার জন্য ক্ষমতা-প্রাপ্ত, অবশ্য তাঁর স্ত্রী যে নিজ পরিবারে বেশ খানিকটা অনিশ্চিত নিরাপত্তা ভোগ করেন তা সত্যি।"৭৪

ল্যাফার্গ সমষ্টিগত সম্পত্তির যে চিত্র এঁকেছেন, তা দেখে কি মনে হয় না যে এ যেন ভারতীয় সম্পত্তিরই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ? সমষ্টিগত সম্পত্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য—সম্পত্তির যৌথ উপভোগ ও তার বংশপরম্পরায় হস্তান্তর, তা ত' চিরাযত ভারতীয় সম্পত্তিরও প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোন রাজা বা উচ্চ কর্তৃত্বের মহানুভবতার নিদর্শনস্বরূপ পারিতোষিকতুল্য যে ভূখণ্ড সমাজ পত্তনের কোন এক বিশেষ মুহূর্তে কোন এক পূর্বপুরুষের হস্তগত হয়েছিল, সেই ভূখণ্ডই পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী বংশতালিকার নির্দিষ্ট ক্রম-অনুসারে বর্তমান কোন এক সুযোগ্য বংশধরের অধিকারভুক্ত হয়ে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর প্রতীক্ষায় রয়েছে—এ ত' চিরাচরিত ভারতীয় সম্পত্তি উত্তরাধিকারীর প্রকৃত চিত্র। আর যেহেতু শাস্ত্রের বিধান-অনুযায়ীই এই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ হয়, তাই বংশ-পরম্পবায় সে সম্পত্তি অপরিবর্তিতই থাকে। ফলে রাজরোষ বা অন্য কোন দৈবদুর্বিপাক ভিন্ন এ সম্পত্তি থেকে নিষ্ক্রমণের পথও রুদ্ধ। এই কারণেই মার্কসের মনে হয়েছে যে সম্পত্তির এই স্থায়িত্ব প্রদানকারী ভারতীয় গ্রাম গোষ্ঠীগুলি 'অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে বাহিরের ব্যবস্থার অধীন, স্বয়ং-বিকশিত একটি সমাজব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্তমান প্রাকৃতিক-নিয়তিরূপে'।

এ বিষয়ে অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতীয় বা এশীয় সমাজের এই সমষ্টিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব সমাজ বিকাশের ধারায় কোন বিরল ঘটনা নয়।

এই সমষ্টিগত সম্পত্তির উপস্থিতি জার্মানী বা ফ্রান্সের মত ধনতান্ত্রিক দেশের ইতিবৃত্তেও দেখতে পাওয়া যায়। তবে ভারতবর্ষের সঙ্গে সেই দেশগুলির পার্থক্য এই যে জার্মান 'মার্ক'ই হোক বা ফরাসী সমষ্টিগত সম্পত্তিই হোক, সেগুলি কোন সময়েই সেই দেশগুলির স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠতে পারে নি; এই সমস্ত দেশের সমষ্টিগত সম্পত্তি সমাজ বিকাশের অমোঘ নিয়মেব কাছে নতি-স্বীকার ক'রে সমাজবিকাশের ভবিষ্যৎ পর্যায়ের জন্য পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। এই কারণেই দেখা যায় যে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের একটি ধারার সৃষ্টি এই সমষ্টিগত মালিকানাভিত্তিক গ্রামগোষ্ঠী থেকে। কিন্তু ভারতবর্ষের বিশেষত্ব হল যে এই সমষ্টিগত সম্পত্তি প্রকৃত সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার পরিবর্তে জলবায়ুগুণে এবং নানা ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে স্থায়ী ও অপরিবর্তিত চরিত্র অর্জন করেছিল। তাই এঙ্গেলস মার্কসকে লিখলেন, "কিন্তু প্রাচ্যবাসীরা ভূমি-মালিকানার এমন কি সামন্তরূপেও যে পৌঁছল না, তা ঘটল কি করে? আমার ধারণা তা প্রধানত আবহাওয়ার সঙ্গে জমির প্রকৃতি মিলে,......"[১৫] ল্যাফার্গ-এর বিবরণ থেকে আরও একটি বিষয়ও লক্ষ্যণীয়। ভারতীয় জমিদার ও কৃষকের বংশপরম্পরায় সম্পত্তির স্বত্বভোগকে অনেকসময় ভ্রান্তভাবে সম্পত্তিতুল্য অধিকার (প্রোপ্রাইটরী রাইট) রূপে অভিহিত করা হয়। যেখানে অরণ্য ও পশুচারণ ভূমি সহ যে সমস্ত ভূসম্পত্তি সরাসরি গ্রামগোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে ছিল, স্পষ্টতঃই সেগুলি হল সমষ্টিগত সম্পত্তি। এমন কি প্রাক্-বৃটিশ ভারতীয় সমাজে যে এক একটি ভূ-অংশ (ল্যাণ্ড পার্সেল) কোন একটি পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট থাকত তাও ছিল সমষ্টিগত সম্পত্তি। কারণ এই ভূ-অংশগুলি পারিবারিক ভিত্তিতে নির্দিষ্ট থাকলেও, এগুলির আসল পরিচালক ছিল সমবেতভাবে গ্রামগোষ্ঠী। এছাড়া এই সমস্ত পরিবারের স্বত্বভোগের ধরনটা যে ল্যাফার্গ বর্ণিত স্বত্ব-ভোগকারী (উজুফ্র্যাকচারিস)-র স্বত্বভোগের অনুরূপ তাও এই বিবরণ থেকে স্পষ্ট।

ভারতীয় জমি মালিকানার বিষয়টি বাদ দিলেও চিরাচরিত ভারতীয় শিল্পের প্রকৃত চরিত্রটি কিরকম ছিল? অনেকসময় এই দেশীয় শিল্পকে শুধু-মাত্র ইণ্ডাষ্ট্রি বা কখনও কখনও ম্যানুফ্যাকচাররূপে উল্লেখ করা হয়। ইও দেশীয় শিল্পকে যে আধুনিক অর্থে ইণ্ডাষ্ট্রি হিসাবে গণ্য করা যায় না,

তা উল্লেখ না করলেও চলে। কিন্তু প্রকৃতই কি ভারতীয় দেশীয় শিল্প কোন অবস্থাতেই ম্যানুফ্যাকচার স্তরভুক্ত ছিল? লেনিন ম্যানুফ্যাকচার-এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা হলঃ "আমরা জানি যে ম্যানুফ্যাকচার বলতে শ্রম-বিভাজনের উপর নির্ভরশীল সহযোগিতা বোঝায়।

(২) দেশীয় শিল্প

উৎপত্তিগতভাবে ম্যানুফ্যাকচার সরাসরি 'শিল্পে পুঁজিবাদের প্রথম স্তর'ভুক্ত। একদিকে মোটামুটি সংখ্যক শ্রমিক সম্বলিত কারখানাগুলি ক্রমশঃ শ্রম-বিভাজনের প্রচলন করে এবং এইভাবে পুঁজিবাদী সবল সহযোগিতা পুঁজিবাদী ম্যানুফ্যাকচারে পরিণত হয়।"[৭৬]

ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পকে আধুনিক শিল্পেব ঠিক পূর্ববর্তী স্তর হিসাবেই গণ্য করা হয়। যদিও এই পর্যায়ের ভিত্তি হল হস্তচালিত শিল্প, কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শ্রম-বিভাজনের প্রচলন যা প্রকৃত পক্ষে পূর্ববর্তী পর্যায়গুলির স্বাধীন কারিগরের একক প্রচেষ্টায় উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্যকে ( the individual product of an independent artificer') সমষ্টিবদ্ধ কারিগর দ্বারা উৎপাদিত সামাজিক দ্রব্যে রূপান্তরিত করে। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল শিল্পের কেন্দ্রীভবন, যার ফলে মাত্র একজন পুঁজিপতির কর্তৃত্বে একই শিল্পালয়ে বহুসংখ্যক কারিগর উৎপাদনে অংশগ্রহণ কবে। ম্যানুফ্যাকচার যে সুনির্দিষ্ট শ্রম-বিভাজনের সৃষ্টি করে তার দ্বারা ব্যক্তিগত উৎপাদন সামাজিক উৎপাদনে রূপান্তরিত হয়। বলা বাহুল্য, এই ধরনের শিল্প-কেন্দ্রীভবন ও শ্রম-বিভাজন দ্বারা পরিচালিত শিল্পের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত ভোগের জন্য দ্রব্য উৎপাদন নয়, ব্যাপক বাজারের জন্য পণ্য উৎপাদন। আর অবশ্যই এই প্রথার অনিবার্য ফল হল কৃষি থেকে শিল্পের বিযুক্তিকরণ। ম্যানুফ্যাকচার-কারিগররা উৎপাদনে যে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেন, তার ফলে উৎপাদন-হার যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি উৎপাদন-যন্ত্রের পৃথকীকরণ ( ডিফারেন্সিয়েশন ) ঘটে। মার্কস এই উৎপাদন-যন্ত্রের পৃথকীকরণ উল্লেখ করে বলছেন, "একমাত্র বারমিংহামেই ৫০০ রকমের হাতুড়ি উৎপাদিত হয়। প্রত্যেকটি যে কেবলমাত্র একটি বিশেষ প্রক্রিয়ারই উপযুক্ত তাই নয়, বরং নানা প্রকার হাতুড়ি কখনও কখনও শুধু একই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে (operation) ববহৃত হয়। এগুলিকে সম্পূর্ণরূপে এক একজন বিশদ শ্রমিকের বিশেষ বিশেষ কার্যাবলীর ( special functions of each

detail labourer) উপযুক্ত ক'রে উৎপাদনের সময়কাল শ্রমের যন্ত্রকে সরল করে, উন্নত করে, এমন কি তার বহুগুণ বৃদ্ধিও করে। এইভাবে এটি একই সময়ে মেশিনের অস্তিত্বের অন্যতম বাস্তব ভিত্তি সৃষ্টি করে, যে মেশিনগুলি হল সরল যন্ত্রেরই সমাহার বিশেষ।"৭৭

এই আলোকে যদি বিচার করা যায় তা'হলে কি ভারতীয় দেশীয় শিল্পকে ম্যানুফ্যাকচারের অন্তর্ভুক্ত করা যায়? আবহমানকাল ধরে ভারতবর্ষে যে শিল্প প্রচলিত ছিল, সেগুলি ছিল সম্পূর্ণ পারিবারিক শিল্প। তাই প্রাক্-বৃটিশ ভারতবর্ষে কখনও ম্যানুফ্যাকচারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য একজন পুঁজিপতির পরিচালনায় বহুসংখ্যক কারিগরের কেন্দ্রীভবন দেখা যায় না। ম্যানুফ্যাক-চারের তুলনায় ভারতীয় হস্তচালিত শিল্প যে কতটা নিম্নস্তরের ছিল, তা একটা দৃষ্টান্ত দিলেই স্পষ্ট হবে। ভারতের যে ঐতিহ্যপূর্ণ মসলিন সারা পৃথিবী-ব্যাপী বিস্ময়কর কলা-নৈপুণ্যের নিদর্শন, সেই মসলিন কিভাবে প্রস্তুত হত? এ সম্পর্কে "ঢাকাই মসলিন" গ্রন্থ থেকে দু' একটি উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া যাক্ঃ

"সূক্ষ্ম সুতা কাটার জন্য কিছুটা আর্দ্রতা দরকার। ঢাকার সূক্ষ্ম মসলিনের সুতা কাটুনীরা সেইজন্য এমন সময় সুতা কাটত যখন তাপমাত্রা ৮২ ডিগ্রি ফার্ণহিটের বেশী থাকত না। সূক্ষ্মতম সুতা কাটার জন্য উপযুক্ত সময় ছিল খুব ভোর থেকে আরম্ভ করে সূর্যতাপে সকাল বেলায় শিশির শুকানো পর্যন্ত।" (পৃঃ ২৩)

"ঐ রূপ তাপমাত্রার অভাব হলে কোন কোন সময় পানির উপর ভাসমান নৌকায়ও সুতা কাটার কাজ চালান হত।" (পৃঃ ২৪)

ভারতীয় মসলিন-উৎপাদনের হার কিরকম ছিল? এ সম্পর্কে ডঃ করিম বলছেন, "একজন মেয়ে সারা সকাল টাকুতে কাজ করে এক মাসে মসলিনের ব্যবহারোপযোগী মাত্র আধ তোলা সুতা কাটতে পারত।...১৮০০ সালে জন টেলর বলেছেন যে ঐ রকম নিপুণ কাটুনীর সংখ্যা খুব বেশী ছিল না; ঢাকায় মাত্র তিনজন, সোনার গাও-এ ৬।৭ জন এবং মঙ্গলবাড়ী ও বাজিতপুরে প্রায় ২০ জন সূক্ষ্মতম মসলিনের সুতা কাটার উপযুক্ত নিপুণ সুতা কাটুনী ছিল।" (পৃঃ ২৫)

"১৮০০ খৃষ্টাব্দে জন টেলর লিখেছেন যে ১ খানি পূর্ণখণ্ড (অর্থাৎ ২০ গজ

×১ গজ) মলবুস খাস তৈরী করতে একজন তাঁতি ও দুইজন সহকারীর পূর্ণ এক বৎসর সময় লাগত।" (পৃঃ ১১০)[৭৮]

এই ধরনের শিল্পকে যে কোনমতেই ম্যানুফ্যাকচার বলা যায় না, তা বলাই বাহুল্য। কার্ল মার্কসও তা বলেননি। মার্কস তাঁর ক্যাপিটাল গ্রন্থে মারে এবং উইলসনের ঢাকাই মসলিনের বিবরণ উদ্ধৃত করে লিখলেন, " 'সূক্ষ্মতায় ঢাকার মসলিন, উজ্জ্বল ও স্থায়ী রঙে রঞ্জিত করমণ্ডলের সূতী বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য-সমূহ উৎকর্ষে কখনও অতিক্রান্ত হয়নি। তৎসত্ত্বেও পুঁজি, মেশিন, শ্রম-বিভাজন অথবা যে সব উপায় ইউরোপের ম্যানুফ্যাকচার স্বার্থকে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে, সেগুলি ব্যতিরেকেই এইসব দ্রব্য উৎপন্ন হয়। তন্তুবায় হল নিছক একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি, যে ক্রেতার কাছ থেকে ফরমাস পেলে সব থেকে স্থূলভাবে নির্মিত তাঁতের সাহায্যে বস্ত্র তৈরী করে; কোন কোন সময় যে তাঁত হল কয়েকটি গাছের ডাল বা কাঠের দণ্ডকে কোনক্রমে জোড়া লাগান একটি বস্তুবিশেষ। সেখানে পাক খোলা সুতো গোটানোর কোন সুবিধাজনক কৌশল নেই; ফলে তাঁতটিকে তার পূর্ণ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত বিস্তৃত করে রাখতে হয় এবং এটি এতই অসুবিধাজনকভাবে বড় হয়ে পড়ে যে সেটির আর তাঁতীব কুটিরেব মধ্যে স্থান সংকুলান হয় না। যার ফলে তাঁতীটি উন্মুক্ত হাওয়ায় তার ব্যবসা চালাতে বাধ্য হয়, যেখানে আবার এ কাজটি আবহাওয়ার প্রতিটি পরিবর্তন দ্বারা ব্যাহত হয়।' **মাকড়শার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি হিন্দুদের ক্ষেত্রেও এটা হল তাদের বংশপরম্পরায় পুঞ্জীভূত, পিতা থেকে পুত্রে হস্তান্তরিত সেই বিশেষ নিপুণতা যা তাদের এই উৎকর্ষ প্রদান করে।** এবং তবুও এজাতীয় একজন হিন্দু তাঁতীর কার্যাবলী ম্যানুফ্যাকচার শ্রমিকের তুলনায় অনেক বেশী জটিল।"[৭৯] (বড হরফ আমাদের)

সুতরাং মার্কস-এর মত অনুযায়ী ভারতীয় মসলিন শিল্প ম্যানুফ্যাকচার স্তরভুক্ত ছিল না। শুধুমাত্র মসলিন শিল্প নয়, এমন কি অন্যান্য যে ভারতীয় শিল্প ছিল, তার কোনটিই এই ম্যানুফ্যাকচারিং পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি। প্রত্যেকটি ভারতীয় শিল্পের উৎপাদনই ছিল পরিবারভিত্তিক, তাই পূর্বোল্লিখিত শ্রম বিভাজনের কোন দৃষ্টান্তই ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না। ভারতীয় হস্তচালিত শিল্প যে শুধু ম্যানুফ্যাকচার পর্যায়ভুক্ত ছিল না তাই নয়। এই শিল্পগুলি এমন কি ম্যানুফ্যাকচার পূর্ববর্তী পুঁজিবাদী সরল

সহযোগিতামূলক শিল্প ( ক্যাপিটালিষ্ট সিম্পল কো-অপারেশন )-এর স্তরেও উন্নীত হয় নি। পুঁজিবাদী সরল সহযোগিতামূলক শিল্পের নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্য কি ? এ সম্পর্কে মার্কস বলছেন, "পুঁজিবাদী উৎপাদন তখনই শুরু হয়, যখন এক একটি পৃথক পুঁজি যুগপৎ তুলনামূলকভাবে বৃহৎ সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে ; যখন ফলস্বরূপ শ্রম-প্রক্রিয়া ( Labour Process ) ব্যাপক মাত্রায় করা হয় এবং উৎপাদিত দ্রব্য অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পরিমাণে উৎপাদিত হয়। একজন পুঁজিপতির কর্তৃত্বে একই রকম পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে একই সময়ে, একই স্থানে ( যদি বলতে চান ত' শ্রমের একই ক্ষেত্রে ) অধিক সংখ্যক শ্রমিকের একত্রে কাজ হল ঐতিহাসিকভাবে ও যৌক্তিকভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রারম্ভিক বিন্দু।"৮০

এই পুঁজিবাদী সরল সহযোগিতামূলক শিল্পে নিযুক্ত কারিগররা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শিল্পালয়ে যে বৃহৎ পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করেন, তার জন্য বিস্তৃত বাজারেরও প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই বিস্তৃত বাজারে পণ্য বিক্রয় পণ্য উৎপাদকের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই এই পর্যায়ে এমন এক শ্রেণীব পেশাদার ব্যবসায়ীর সৃষ্টি হয়, যারা নিজেরা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত না থেকে শুধুমাত্র পণ্য বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং পণ্য-বিক্রয়কে নিয়মিত ব্যবসায় পরিণত করে। কিন্তু ভারতীয় শিল্পগুলিতে যেমন পুঁজি নিয়োজিত হত না, তেমনি একই শিল্পালয়ে বহু সংখ্যক কারিগরও নিযুক্ত হত না। ফলে ভারতবর্ষে কখনই একটি নিয়মিত পণ্য বাজারও সৃষ্ট হয়নি, আর স্বভাবতঃই পণ্য বিক্রয়ের দায়িত্বসম্পন্ন কোন ব্যবসায়ী শ্রেণীও গড়ে ওঠেনি।

প্রকৃতপক্ষে যে ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন ( স্মল কমোডিটি প্রোডাকশন ) পুঁজিবাদী সরল সহযোগিতামূলক শিল্পের জন্ম দেয়, ভারতীয় শিল্প কখনও সেই ক্ষুদ্র পণ্য-উৎপাদন স্তরেও উন্নীত হয়নি। কারণ ভারতীয় হস্তচালিত শিল্পের মত যদিও এই ক্ষুদ্র উৎপাদনের ভিত্তি ছিল পারিবারিক সহযোগিতা ( ফ্যামিলিয়াল কো-অপারেশন ), কিন্তু ক্ষুদ্র পণ্য-উৎপাদনের আরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বাজারের জন্য পণ্য-উৎপাদন এবং কৃষি ও শিল্পের বিযুক্তিকরণ। ভারতীয় শিল্পের প্রধান প্রকৃতি যেমন কৃষির সঙ্গে ঘরোয়া বন্ধন, তেমনি চিরাচরিত ভারতীয় হস্তচালিত শিল্পীরা বাজারের জন্য

উৎপাদনের পরিবর্তে নির্দিষ্ট গ্রামগোষ্ঠীর সদস্যের ভোগের জন্য দ্রব্য উৎপাদন করতেন।

সুতরাং কোনভাবেই ভারতীয় প্রাচীন শিল্পগুলিকে ম্যানুফ্যাকচার বা পুঁজিবাদী সরল সহযোগিতামূলক শিল্প, এমন কি ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন স্তর-ভুক্তও করা যায় না। আসলে ভারতীয় দেশীয় শিল্পের সঙ্গে কারিগরী উৎপাদন ( আর্টিজান প্রোডাক্শন )-এর বেশ কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। কারিগরী উৎপাদনে উৎপাদক ব্যবহারকারী-ক্রেতা ( কাষ্টমার কন্সিউমার )-এর ফরমাস ( অর্ডার ) অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে এবং এক্ষেত্রে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল যেমন কোন কোন সময় ক্রেতাই সরবরাহ করে থাকে, তেমনি অনেক সময় কারিগর নিজেই হয় কাঁচামালের মালিক। এই ধরনের উৎপাদনে ব্যবহারকারী-ক্রেতা কখনও নগদ মুদ্রায়, আবার কখনও মুদ্রার পরিবর্তে অন্য কোন বস্তুদ্বারা কারিগরের পারিশ্রমিক দান করে। যদিও এক্ষেত্রে কারিগরের উদ্দেশ্য হল নিজ প্রয়োজন মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারকারী-ক্রেতার ভোগের জন্য দ্রব্য উৎপাদন, কিন্তু যেহেতু দ্রব্য উৎপাদন বাজারের উদ্দেশ্যে হচ্ছে না এবং উৎপাদিত দ্রব্য নিয়মিত বাজারেও আবির্ভূত হতে সক্ষম হয় না, তাই লেনিন কারিগরী উৎপাদনকে পণ্য-উৎপাদনের মর্যাদা দেন নি। তবে এই শিল্প-স্তরে পণ্য-উৎপাদনের সূচনা না হলেও পণ্য-সঞ্চালন ( কমোডিটি সার্কুলেশন )-এর সূত্রপাত হয়। প্রকৃতপক্ষে অবিস্মরণীয় কাল থেকে ভারতবর্ষে যে বংশানু-ক্রমিক জাতিভেদ প্রথার ভিত্তিতে শ্রমবিভাজন প্রচলিত ছিল, তা ভারতীয় সমাজে শ্রমের বিভাগ সৃষ্টি করলেও, শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোনরকম শ্রমবিভাজনের প্রচলন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাই পারিবারিক সহযোগিতা দ্বারা পরিচালিত এই দেশীয় শিল্পগুলির চরিত্র ছিল ব্যক্তিগত উৎপাদন, সামাজিক উৎপাদন নয়। চিরাচরিত ভারতীয় গ্রামে হিন্দু জাতিভেদ প্রথার ফলে যে সকল কারিগর জাতি ( আর্টিজান কাস্ট ) বংশ-পরম্পরায় নিত্যব্যবহার্য শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত থাকত, তাঁদের উৎপাদিত দ্রব্য গ্রামের অন্যান্য অ-কারিগর জাতির ভোগ্য হিসাবেই ব্যবহৃত হত। এই সমস্ত অ-কারিগর জাতির ভূমিকা যেমন কারিগরী-উৎপাদনের ব্যবহারকারী-ক্রেতার ভূমিকার অনুরূপ, কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ভারতীয় সমাজের

শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ হিন্দু অ-কারিগরী জাতিগুলিকে ব্যবহারকারী-ক্রেতার ভূমিকা অবলম্বনে প্রবৃত্ত করেনি। ভারতবর্ষে আবহমানকাল ধরে যে জাতিভেদ প্রথার প্রচলন রয়েছে, সেই জাতিভেদ প্রথাই সমাজে বংশানুক্রমিক পেশার ভিত্তিতে অ-কারিগরী ও কারিগরী জাতির জন্ম দিয়েছে। এই কারণেই দেখা যায় চিরায়ত গ্রাম ব্যবস্থায় প্রতিটি গ্রাম (কখনও কখনও একাধিক গ্রাম) পত্তনের সময় পত্তনকারীরা অ-কারিগরী জাতির সঙ্গে কারিগরী জাতিগুলিকে ভরণ-পোষণের জন্য নির্দিষ্ট জমি প্রদান করে তাদের বসতি স্থাপন করত। এই ব্যবস্থায় যে অলিখিত চুক্তি থাকত, তার বলে যেমন কারিগরী জাতিগুলি গ্রামের অন্যান্য সদস্যের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের কাঁচামাল দ্বারা নিত্যব্যবহার্য শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করতে বাধ্য থাকত, তেমনি ব্যবহারকারী-ক্রেতাস্বরূপ অ-কারিগরী জাতিগুলি কারিগরের পারিশ্রমিকরূপে (কোন কোন ক্ষেত্রে নিছক দান) অন্য কোন বস্তু সরবরাহ করত। শুধুমাত্র হিন্দুরাই নয়, প্রতিটি বহিরাক্রমণকারীই ভারতীয় উৎপাদনব্যবস্থার এই বিশেষ চরিত্র অক্ষুন্ন রেখে, ভারতীয় সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করেছে। এই কারণেই মার্কস বলছেন, "আরবী, তুর্কী, তাতার, মোগল যারা একের পর এক ভারত প্লাবিত করেছে তারা অচিরেই **হিন্দু-ভূত হয়ে গেছে ;** ইতিহাসের এক চিরন্তন নিয়ম অনুসারে বর্বর বিজয়ীরা নিজেরাই বিজিত হয়েছে তাদের প্রজাদের উন্নততর সভ্যতায়।"[৮১]

সুতরাং কারিগরী উৎপাদনের সঙ্গে ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও, ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবহারকারী-ক্রেতা (অ-কারিগরী জাতি) কারিগরী উৎপাদনের ব্যবহারকারী-ক্রেতার সমতুল্য নয়। আর এই আদর্শ ব্যবহারকারী-ক্রেতার অনুপস্থিতির ফলে ভারতীয় সমাজে কারিগরী উৎপাদন স্তরের পণ্য-সঞ্চালনও নিয়মিত চরিত্র অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় শিল্প-কারিগরনির্মিত যে সমস্ত দ্রব্য তাদের নির্দিষ্ট গ্রাম-গোষ্ঠীর বাইরে আত্মপ্রকাশ করত, তা প্রধানতঃ খাজনা বা নজরানারূপে রাজা বা অন্য কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরই ভোগ্য হিসাবে ব্যবহৃত হত, এবং সেগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ছিল উৎপাদনের উদ্বৃত্ত অংশ। অবশ্য এ ভিন্ন স্বল্প পরিমাণে হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামগোষ্ঠীর বাইরেও

উৎপাদকরা ব্যবহারকারী-ক্রেতার ভোগের উদ্দেশ্যে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করত এবং সেক্ষেত্রে পণ্য-সঞ্চালনের সীমিত প্রচলনও দেখা যায়। বিশেষতঃ সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ওলন্দাজ, ফরাসী সহ বিদেশী ব্যবসাদারের আগমনের ফলে ভারতবর্ষে পণ্য-সঞ্চালন বিশেষ ব্যাপ্তি পায়। কারিগরী-উৎপাদন ও ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের আর একটি বৈসাদৃশ্যের বিষয় হল কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্ক। পারিবারিক শিল্প (ডোমেষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্রি)তে কৃষি ও শিল্প যে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকত, কারিগরী উৎপাদন সেই বন্ধন সর্বপ্রথম বিযুক্ত করে। তাই বলা হয় যে কারিগরী উৎপাদন হল কৃষি থেকে বিযুক্ত প্রথম শিল্প। কিন্তু ভারতীয় শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল এই কৃষি ও শিল্পের পারিবারিক বন্ধন যা প্রতিটি গ্রামগোষ্ঠীকে দিত স্বয়ংনির্ভর চরিত্র। তাই ভারতীয় চিরাচরিত শিল্পে কিছু কিছু কারিগরী উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গেলেও, আক্ষরিক অর্থে এই শিল্পকে কারিগবী উৎপাদন নামে অভিহিত করা যায় না। কার্ল মার্কসও ভারতীয় গ্রামগোষ্ঠীব এই বিশেষত্বের উল্লেখ করে বলেছেন, "ঐ সব পারিবারিক গ্রামগোষ্ঠীগুলিব ভিত্তি ছিল হাতে কাটা সুতা, হাতে বোনা কাপড ও হাতে করা চাষের এক বিশিষ্ট সমন্বয়ের কুটির শিল্প, যা থেকে তারা পেত আত্মনির্ভর শক্তি।"[৩২]

সম্প্রতি কোন কোন ভারতীয মার্কসবাদী ঐতিহাসিক মনে করেন যে মার্কস-এঙ্গেলস উল্লিখিত 'এশীয় স্বৈরাচার'কে কোন বিশেষ ধরনের উৎপাদন প্রথা হিসাবে গণ্য করার পরিবর্তে সামন্ততন্ত্রের এক বিশেষ রূপ হিসাবে গ্রহণ করাই সমীচীন। কারণ এঁদের মত অনুযায়ী মার্কস-এঙ্গেলস নাকি শেষ জীবনে এই এশীয় স্বৈরাচারকে আর বিশেষ কোন উৎপাদন প্রথারূপে গণ্য না করে সামন্ততন্ত্রের অন্তর্গত বলেই মনে করতেন। যা হোক, এ বিষয়ে কোন বিতর্কে প্রবেশ করার অবকাশ এখানে নেই। কিন্তু যদি এশীয় স্বৈরাচারের বিষয়টি পরিত্যাগ করাও যায়, তা'হলেও কি প্রাক্-বৃটিশ ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে কোন ধরনের পুঁজিবাদ বিকাশের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছিল? কার্ল মার্কস তাঁব ক্যাপিটাল গ্রন্থেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভ্রান্ত মূল্যায়ন করেছিলেন—অন্ততঃ এখনও পর্যন্ত এ অভিযোগ উত্থাপিত হয় নি। তাই মার্কসের ভারতবর্ষ সম্পর্কে মূল্যায়ন অনুসরণ করে আমাদের এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, প্রাক্-বৃটিশ ভারতীয় সমাজ ছিল অতি নিম্নস্তরের সামন্ততান্ত্রিক

সমাজ, যে সমাজে পুঁজিবাদের লক্ষণ ত' দূরের কথা এমন কি নিম্নস্তরের পণ্য-অর্থনীতিও বিকশিত হয় নি; আর সে সমাজে পুঁজিবাদের বীজ হিসাবে যা দেখতে পাওয়া যায়, তা হল অনিয়মিত পণ্য-সঞ্চালন। এই সামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষের বিশেষত্ব ছিল—একদিকে আদর্শ সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তির পরিবর্তে সমষ্টিগত সম্পত্তি ও বংশপরম্পরায় সেই সম্পত্তির স্বত্বভোগ, এবং অন্যদিকে কৃষি ও শিল্পের পারিবারিক বন্ধন যা গ্রামগোষ্ঠীগুলিকে দিত স্বয়ংনির্ভর চরিত্র। এই চিরায়ত ভারতবর্ষের স্বয়ংনির্ভর চরিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই কার্ল মার্কস লিখেছিলেন, "পুরোদস্তুর স্বাভাবিক অর্থনীতিতে যখন একটা যৎসামান্য তুচ্ছ অংশ ভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের অন্য কোন অংশ সঞ্চালন **(circulation)** প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে না, তখন কেবলমাত্র উৎপাদিত দ্রব্যের যে অংশ ভূ-মালিকের রাজস্ব তার একটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাংশ,...... বৃহৎ এস্টেট-এর দ্রব্য ও উদ্বৃত্ত দ্রব্য কোনক্রমেই অবিমিশ্র ( purely ) কৃষিজাত শ্রমের উৎপাদিত দ্রব্য নয়। এটা সমভাবে শিল্পজাত শ্রমদ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যকেও অন্তর্ভূক্ত করে। প্রাচীন ইউরোপীয় সমাজে, মধ্যযুগে এবং বর্তমানে ভারতীয় সমাজেও যেখানে চিরায়ত সংগঠনগুলি এখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি —সব ক্ষেত্রেই যে কৃষি হল স্বাভাবিক অর্থনীতির ভিত্তি, তার গৌণ বৃত্তি হিসাবে পারিবারিক হস্তশিল্প এবং উৎপাদনকারী শ্রম হল সেই উৎপাদন প্রথার পূর্বসর্ত, যার উপর স্বাভাবিক অর্থনীতি নির্ভর করে।"[৮৩]

ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল সত্যি, কিন্তু মাও সে-তুং চীনা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের কি মূল্যায়ন করেছিলেন? মাও সে-তুং চীনা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তৎকালীন অর্থনীতি সম্পর্কে বলেছেন, "একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাভাবিক অর্থনীতিরই ছিল প্রাধান্য। শুধু কৃষিজাত দ্রব্যই নয়, নিজেদের প্রয়োজনের অধিকাংশ হস্তশিল্পজাত দ্রব্যও কৃষকরা উৎপাদন করতো। জমিদার ও অভিজাতবর্গ তাদের কাছ থেকে জমির খাজনা হিসেবে যা আদায় করতো তাও ছিল প্রধানতঃ ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের জন্য, বিনিময়ের জন্য নয়। কালক্রমে বিনিময় দেখা দিল বটে, কিন্তু সমগ্রভাবে অর্থনীতিতে তা কোনো নিয়ামক ভূমিকা পালন করলো না।"[৮৪]

সুতরাং যে সমাজে জমি-মালিকানা প্রকৃত সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র অর্জন করতে পারেনি, যে সমাজে গ্রামগোষ্ঠী এবং কৃষি ও হস্তশিল্পের পারিবারিক

বন্ধন মারফৎ স্বয়ংনির্ভর স্বাভাবিক অর্থনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সেই অর্থনীতির ভাঙনের চিহ্নও বিশেষ একটা চোখে পড়ছে না, সেই অবস্থায় একজন প্রকৃত বস্তুবাদীর কাজ কি সমস্ত কিছুকে ভবিতব্যের হাতে সমর্পণ করে নিষ্ক্রিয় হযে বসে থাকা, না বাস্তব অবস্থা যে সুযোগ এনে দিয়েছে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা? একমাত্র নৈরাষ্ট্রবাদী, উগ্রজাতীয়তাবাদী এবং স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন যে যত অসুবিধাই থাক একজন বস্তুবাদী এই সুযোগকে অবহেলা করবেন না। রামমোহনও সেই সুযোগকে অবহেলা করেন নি। রামমোহন সঠিকভাবেই অনুধাবন করেছিলেন যে ভারতবর্ষের হাতে দৈবাৎ যে সুযোগ এসে গেছে, তার সদ্ব্যবহার করা ভিন্ন সেই সময় ভারতীয় অচলায়তন সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করার আর কোন পথ নেই। এই কারণেই তিনি ভারতে বৃটিশ শাসনকে সমর্থন করতে বাধ্য হযে-ছিলেন। বৃটিশ ঔপনিবেশিকরা কোন্ স্বার্থে ভারতবর্ষকে অধীন করে রেখেছে, সে সম্পর্কে মার্কস-এর সম্যক জ্ঞান ছিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর ইতিহাসবোধ তাঁকে বলতে প্রবৃত্ত করেছে, "একথা সত্য যে, ইংলণ্ড হিন্দুস্তানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত হয়েছিল শুধু হীনতম স্বার্থবুদ্ধি থেকে, এবং সে স্বার্থসাধনে তার আচরণ ছিল নির্বোধের মতো। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল: এশিয়াব সামাজিক অবস্থায় মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মনুষ্যজাতি কি তার ভবিতব্য সাধন করতে পারে? যদি না পাবে, তাহলে **ইংলণ্ডের যত অপরাধই থাক, সে বিপ্লব সংঘটনে ইংলণ্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র।**"[৮৫] (বড হরফ আমাদেব) সুতরাং যে কারণে আজ রামমোহনকে প্রতিক্রিয়াশীলতার দায়ে দায়ী করা হচ্ছে, সে যুগে সেইটিই ছিল একমাত্র বস্তুবাদী বিচার।

রামমোহন যে চিন্তায় ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনেব সমর্থক ছিলেন, কার্ল মার্কস যে কারণে ভারতে বৃটিশ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তা কোন্

**ভারতীয় সমাজ ও বৃটিশ পুঁজিবাদ**

কারণে? তার একটিই কারণ—বৃটিশ শাসকবর্গ যদিও কেবলমাত্র শোষণ করার হীনস্বার্থেই ভারতকে অধীন করে রেখেছে, কিন্তু তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, অর্থাৎ পণ্য-ব্যবসা মারফৎ মুনাফা লোটার জন্য, তাদেব পক্ষে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের জন্ম দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই। অর্থাৎ একমাত্র শোষণের স্বার্থেই বৃটিশ

ধনতন্ত্র ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের জন্ম দিতে বাধ্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে বৃটেনের পুঁজিবাদী ব্যবসা যদিও ছিল বাণিজ্যিক পুঁজিপতিদের কর্তৃত্বাধীন, কিন্তু শৈল্পিক বুর্জোয়ারা (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল বুর্জোয়াজী) ছিল শ্রেণী হিসাবে বিকাশমান। তাই এ সময়ে ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিব ভারত ও চীনে একচেটিয়া ব্যবসার বিরোধিতা করছিল, তেমনি শৈল্পিক বুর্জোয়ারাও শিল্প-প্রসারের জন্য বাণিজ্যিক পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছিল। বৃটিশ শিল্পপতিদের এই অক্লান্ত সংগ্রামের ফলেই ১৮১৩ সালেব সনদে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত-ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, ১৮৩৩ সালের সনদে কোম্পানি চীন-বাণিজ্যর একচেটিয়া অধিকারও খোয়ায়, এবং অবশেষে ১৮৫৮ সালে ভিক্টোরিয়ার বিশেষ ফরমান বলে কোম্পানিকে ভারতের শাসন-পরিচালনা থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৮৫৩ সালে এই ঘটনা লক্ষ করে মার্কস লিখছেন, "কারখানা মালিকেরা ইংলণ্ডে তাদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের সচেতনতায় এবার দাবি করছে ভারতে এই প্রতিবন্ধক শক্তিগুলির ধ্বংস, ভারত শাসনের গোটা সাবেকি ব্যবস্থাটার বিনাশ ও ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির চূড়ান্ত বিলোপ।"[৮৬] উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এই শিল্পপতিরাই কবডেন ও ব্রাইটের নেতৃত্বে ম্যাঞ্চেস্টার স্কুল প্রভৃতি সংগঠনেব মাধ্যমে স্বদেশে ও বিদেশে শিল্পের প্রসারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই বৃটেনের শিল্প প্রসার সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে কি দ্রুত ঘটছিল তা একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। ১৮১২ সালে বারমিংহামের কাছে দশটা লোহার কারখানা (আয়রন ওয়ার্কস) ছিল এবং এগুলির প্রত্যেকটি তৈরী করতে খরচ হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড। কারখানাগুলোতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল তিন থেকে পাঁচশো। ১৭৭০ সালে ম্যাথু বুলটন নামে এক ব্যক্তির কারখানায় আটশো লোক[৮৭] পর্যন্ত উৎপাদনে অংশগ্রহণ করত। মার্কস জানতেন, এদেশে একবার আধুনিক শিল্পের প্রসার ঘটলে এশীয় স্বৈরাচারের বাস্তব ভিত্তিটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে বাধ্য। কোন শুভবুদ্ধির তাডনায় নয়, বিশ্বপুঁজিবাদ কি পৃথিবীর সমস্ত অনগ্রসর দেশগুলোতে এইভাবেই পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটাতে বাধ্য হয় নি? মার্কস তাই বলছেন, "কিন্তু যে দেশটায় লোহা আর কয়লা বর্তমান সে দেশের

যাত্রায় যদি একবার যন্ত্রের প্রবর্তন করা যায় তাহলে সে যন্ত্র তৈরীর ব্যবস্থা থেকে তাকে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। রেল চলাচলের আশু ও চলতি প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যা দরকার সেসব শিল্পকারখানার ব্যবস্থা না করে বিপুল এক দেশের ওপর রেলপথের জালবিস্তার চালু রাখা যাবে না এবং তার মধ্য থেকেই গড়ে উঠবে শিল্পের এমন সব শাখায় যন্ত্রশিল্পের প্রয়োগ, রেলপথের সঙ্গে যার আশু সম্পর্ক নেই। তাই এই রেলপথই হবে ভারতের সত্যকার আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত।...

"রেল ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত আধুনিক শিল্পের ফলে শ্রমের বংশানুক্রমিক যে ভাগাভাগির ওপর ভারতে জাতিভেদ প্রথার ভিত্তি, ভারতীয় প্রগতি ও ভারতীয় ক্ষমতার সেই চূড়ান্ত প্রতিবন্ধক ভেঙে পড়বে।"[৮৮]

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বৃটিশ পণ্য অর্থনীতি ভারতীয় সমাজে পুরানো উৎপাদন সম্পর্কের বিলোপ সাধন ক'রে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করছিল। বিশেষ করে ভারতবর্ষে রেলপথের প্রচলন এই প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত ও ব্যাপক করেছিল। ভারতবর্ষে এই পণ্য-অর্থনীতির প্রচলনেরই আরও একটি অনিবার্য ফল হল

**"স্বাধীন" কৃষকদের অবলুপ্তি না শ্রেণী পৃথকীভবন?**

দেশীয় হস্তশিল্পের ধ্বংস। এই সব দেশীয় শিল্প যে ধ্বংস-প্রাপ্ত হচ্ছিল তার প্রধান কারণ বৃটিশ শাসকদের অত্যাচার নয়। তার কারণ বৃটিশ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোতিায় দেশীয় শিল্পের সম্পূর্ণ পরাভব। "এই সব ছোট ছোট বাঁধিগৎ ধরনের সামাজিক সংস্থাগুলি বহুলাংশে ভেঙে গেছে ও অদৃশ্য হয়ে চলেছে, সেটা বৃটিশ ট্যাক্স সংগ্রাহক ও বৃটিশ সৈন্যের বর্বর হস্তক্ষেপের ফলে ততটা নয় যতটা ইংরেজদের বাষ্প ও ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যের প্রতিক্রিয়ার ফলেই।"[৮৯] বৃটিশ কর্তৃক এই দেশীয় শিল্পের ধ্বংসে প্রাচীন ও নবীন বহু বুদ্ধিজীবীই আহত হন। বিগত শতাব্দীর শেষার্ধের অগ্রণী অর্থনীতিবিদ শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় থেকে শুরু করে আধুনিক কালের অনেক বুদ্ধিজীবীই এ বিষয়টি বিচারের সময় শুধুমাত্র ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হন। কিন্তু ধনতান্ত্রিক বিকাশ সম্পর্কে তাঁদের ইতিহাসবোধের অভাবের ফলে তাঁরা দেখতে ব্যর্থ হন যে পুঁজিবাদী সমাজ বিকাশের ইতিহাসে এটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ভারতীয় সমাজে, যদি বিদেশী হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই পুঁজিবাদ

বিকশিত হত, তা'হলে কি ওই পণ্য-অর্থনীতিও দেশীয় শিল্পকে ধ্বংস করত না ? পৃথিবীতে এমন কোন পুঁজিবাদী সমাজ কি পাওয়া যায় যেখানে বুর্জোয়া শ্রেণী এই হস্তচালিত শিল্পকে ধ্বংস না করে এক পাও অগ্রসর হতে পেরেছে ? প্রাক্-পুঁজিবাদী এই সব হস্তচালিত শিল্পের ধ্বংসই হল পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অবশ্য প্রাথমিক সর্ত। আর এই ধ্বংসের মাধ্যমেই ত' বুর্জোয়া-শ্রেণী সংগ্রহ করে তার উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত উৎপাদকের মজুত বাহিনী, প্রলেতারিয়েত শ্রেণী। এই প্রক্রিয়ার মধ্য থেকেই গড়ে ওঠে দুটো পরস্পর বিরোধী শ্রেণী। একটি শ্রেণী হস্তগত করে উৎপাদনের সমস্ত উপায় ( মিন্‌স অব প্রোডাক্‌শন ), আর অপর একটি শ্রেণী, যারা একসময় উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক ছিল, তারা তাদের উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানা হারিয়ে আক্ষরিক অর্থে নিঃসম্বল হয়ে দাঁড়ায়। তাদের সম্পর্কেই ত' মার্কস বলেছেন—তাদের শৃঙ্খল ভিন্ন হারাবার কিছু নেই। এই প্রক্রিয়াটিই মার্কসবাদী সাহিত্যে ক্লাস ডিফারেন্সিয়েশন বা শ্রেণী-পৃথকীভবন নামে অভিহিত হয়ে আছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এই শ্রেণী-পৃথকীভবনের তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী-সংগ্রামও তীব্ররূপ ধারণ করে। শ্রেণী-পৃথকীভবনের বিষয়টি যে, যে কোন মার্কসবাদীর কাছে কি পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ তা একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়। ১৯০৬ সালের ৯ই নভেম্বর রাশিয়ায় স্টলিপিনকৃত এক কৃষি আইন বলে কৃষকরা গ্রামগোষ্ঠী থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার এবং নিজ নিজ সম্পত্তি বিক্রয়ের অধিকার পান। কিন্তু এর ফল কি হল ? রুশ ধনী কৃষকরা এই সুযোগে অত্যন্ত অল্প দামে গরীব কৃষকদের জমি অধিকার করে নিজেদের সম্পত্তির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি করল। ফলে স্টলিপিনের এই আইন জারী হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল লক্ষ লক্ষ গরীব কৃষক তাঁদের সমস্ত জমি-জমা বিক্রয় করে একেবারে নিঃস্ব হয়ে দাঁড়ালেন। গরীব কৃষকদের এই করুণ অবস্থায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে নারদ্‌নিকরা সুপারিশ করলেন যে এই সমস্ত গরীব কৃষকদের রক্ষা করার জন্য পুলিশের সাহায্যে কৃষকদের জমি বিক্রয় বন্ধ করা উচিৎ। গরীব কৃষকদের এই দুর্দশায় লেনিনও নিশ্চয় বিচলিত হয়েছিলেন। কিন্তু নারদ্‌নিকদের এই প্রস্তাবে লেনিনের প্রতিক্রিয়া কি রকম হল ? লেনিন নারদ্‌নিকদের এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে স্টলিপিনকৃত আইনের অর্থনৈতিক এবং

রাজনৈতিক কারণ ব্যাখ্যা করলেন। এবং তারপর তিনি নারদ্‌নিকদের উদ্দেশ্যে বললেন, "নারদ্‌নিকরা 'পরম বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলবে—'তা'হলে আপনারা কি স্টলিপিনকৃত কৃষি আইনের স্বপক্ষে?' আরে না, না। আপনারা শান্ত হন। খাস জমিদারির ( manorial ) ক্ষেত্রে হোক অথবা কৃষকদের ভূ-অংশের ক্ষেত্রেই হোক আমরা রুশ দেশের সব ধরনের পুরানো ভূমি মালিকানার অকপট বিরোধী। আমরা বরং এই পচাগলা ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীনত্ব, যা প্রতিটি নতুনত্বকে বিষাক্ত করছে, তা বলপ্রয়োগ মারফৎ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলার খোলাখুলি পক্ষপাতী। বুর্জোয়া বিপ্লবের একমাত্র দৃঢ় শ্লোগান অনুযায়ী আমরা জমির জাতীয়করণের স্বপক্ষে। এবং আমরা মনে করি যে এটাই হল একমাত্র বাস্তব ব্যবস্থা যা কৃষক দল ( mass of peasantry ) থেকে জমির মুক্ত মালিকদের পৃথক করতে সাহায্য ক'রে ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয় এই চূর্ণ-বিচূর্ণ করার বর্শা ফলকটা পরিপূর্ণভাবে জমিদারদের বিরুদ্ধেই চালিত হবে।"[৯০]

এই নারদ্‌নিকপ্রস্তাব সম্পর্কে লেনিন অন্যত্র বলেছেন, "...নারদ্‌নিকরা এতই অধঃপতিত হয়েছে যে তারা এমনকি কৃষকদের জমি বিক্রয় নিষেধকারী পুলিশ আইনকেও স্বাগত জানায়।"[৯১]

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে দেশীয় শিল্পের দ্রুত অবনতির বিবরণ দিয়ে রেশমশিল্প সম্পর্কে লিখেছেন, "স্বতন্ত্র ভারতীয় প্রস্তুতকারীদের দ্বারা উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া হত না ; তা বন্ধ করা হত কখনও পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞার সাহায্যে, আর পরবর্তীকালে কোম্পানীর রেসিডেণ্টদের প্রভাবেব দ্বারা বস্ত্রবয়ন অধিকাংশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।"

ভারতীয় দেশীয় শিল্পের ক্ষেত্রে এই বৃটিশ ভূমিকার ফলাফল কি? রমেশ দত্তর মতে, "যে সব ব্যক্তি নিজেদের পুঁজি দিয়ে কাজ করতেন, নিজেদের বাড়িতে ও গ্রামে পণ্য উৎপাদন করতেন এবং নিজেদের মুনাফা অর্জন করতেন তাঁরা নির্ভরশীল হয়ে পড়েন কোম্পানীর রেসিডেণ্টদের উপর, যারা তাঁদের কাঁচা তুলা ও রেশম দিতেন ; রেসিডেণ্টদের নির্ধারিত মূল্যই তাঁরা পেতেন। **রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে তাঁরা হারিয়েছিলেন তাঁদের শিল্প-সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা** এবং তাঁদের যা উৎপন্ন করতে বলা হত তার জন্য পেতেন মজুরী ও মূল্য। বিশ্বের বাজারের জন্য আর

উৎপাদনকারী রূপে না থাকায়, তাদের মধ্যে হাজার হাজার লোক চাকরির জন্য কোম্পানীর কারখানার দ্বারস্থ হতেন।"৯২ ( বড় হরফ আমাদের )

রমেশ দত্ত বর্ণিত "স্বাধীন" কৃষকের অলীক কাহিনী আজ সর্বত্রই প্রভাব বিস্তার করেছে। এমন কি যাঁরা নিজেদের বিপ্লবী মার্কসবাদী বলে দাবী করেন, তাঁরাও ভারতে বৃটিশ শোষণের দৃষ্টান্ত হিসাবে এই দেশীয় শিল্পের অবনতির বিষয় উল্লেখ করে থাকেন এবং তথাকথিত স্বাধীন কৃষকদের 'পরাধীনতা'য় অশ্রুজল রোধ করতে অক্ষম হন। রমেশ দত্ত মার্কসবাদী ছিলেন না, তাই তাঁর প্রতিক্রিয়া বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু যাঁরা বিপ্লবী মার্কসবাদী, তাঁদের কাছে কি শ্রেণী-পৃথকীভবন সম্পর্কে মার্কসবাদী ব্যাখ্যাটি অজ্ঞাত, না তাঁরা মার্কসবাদের পরিবর্তে নারদ্‌নিকবাদকেই অভ্রান্ত মনে করেন? এ বিষয়ে বর্তমান ভারতীয় নৈরাষ্ট্রবাদীদের চিন্তাধারার সঙ্গে নারদ্‌নিকবাদী বক্তব্যের গভীর মিল থাকার জন্য, এই নারদ্‌নিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে লেনিনের মন্তব্য উদ্ধৃত করাই যুক্তিযুক্ত। "প্রত্যেক নারদ্‌নিকই বলে থাকে, যেহেতু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পুঁজিবাদ স্বাধীন কৃষকের পরিবর্তে কৃষি-মজুরের ( farm labourer ) সৃষ্টি করে, সেহেতু আমাদের কৃষিতে পুঁজিবাদ হল অত্যন্ত ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। পুঁজিবাদের বাস্তব অবস্থার ( কৃষি-মজুর ) সঙ্গে তুলনা করা হয় 'স্বাধীন' কৃষকের এক **অলীক কল্পনাকে।** এবং এই অলীক কল্পনার ভিত্তি হল প্রাক্-পুঁজিবাদী যুগের উৎপাদনের উপায়ে কৃষক-মালিকানার বিষয়টি। কিন্তু যে ঘটনাটা সুন্দরভাবে উপেক্ষা করা হয়, তা হল—কৃষকদের এই উৎপাদনের উপায়গুলির জন্য দ্বিগুণ মূল্য দিতে হয়; এই উৎপাদনের উপায়গুলি জনখাটার ( labour service ) ব্যবস্থারই স্বার্থ রক্ষা করে; এই সমস্ত 'স্বাধীন' কৃষকদের জীবনযাত্রার মান এতই নীচু যে, যেকোন ধনতান্ত্রিক দেশে তাদের কপর্দক শূন্য ব্যক্তিরূপে অভিহিত করা হবে; এবং 'স্বাধীন' কৃষকদের এই নৈরাশ্যজনক দারিদ্র ও বুদ্ধিবৃত্তির জড়তার ( ntellectual inertness ) সঙ্গে সংযোজিত হয় ব্যক্তিগত নির্ভরতা যা অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রাক্-পুঁজিবাদী অর্থনীতিতেই দেখতে পাওয়া যায়।"৯৩ ( বড় হরফ আমাদের )

উনিশ শতকের শেষদিকে রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে "স্বাধীন" উৎপাদকদের যে হস্তশিল্পের ধ্বংসপ্রাপ্তিতে রুশ নারদনিকরা অশ্রুপাত

করছিলেন, সে বিষয়ে রুশ 'শিষ্য'রা (সে সময়ে রুশ মার্কসবাদীদের 'রুশ শিষ্য' নামে উল্লেখ করা হত) কি দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন? " 'রুশ শিষ্য'দের পক্ষ থেকে এমন একটিও পুস্তক প্রকাশিত হয় নি, যাতে দৃঢ়ভাবে প্রদর্শন করা হয় নি যে কৃষিতে জনখাটার স্থানে কৃষি-মজুরির প্রচলন এবং কারখানা-শিল্প দ্বারা যাকে 'হস্তচালিত শিল্প' বলা হয়ে থাকে, তার অপসারণ নিছক 'ভবিষ্যতে' নয়, এটা হল একটা বাস্তব ঘটনা যা বর্তমানে আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে (এবং অধিকন্তু তা একটা দুর্বার গতিতে); এ ব্যবস্থা ভেঙে ফেলছে সেইসব ছক-বাঁধা, বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র মাত্রার হস্ত-উৎপাদন, যা যুগ যুগ ধরে অনড ও নিশ্চল হয়ে রয়েছে। সামাজিক শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে এই ব্যবস্থা শ্রমজীবীগণের উন্নততর জীবনযাত্রার সম্ভাব্যতা সৃষ্টি করছে; শুধু তাই নয় এ ব্যবস্থা এমন এক অবস্থার জন্ম দিচ্ছে যেখানে এই সম্ভাব্যতা একটা প্রয়োজনে রূপান্তরিত হয়—দৃষ্টান্তস্বরূপ, দৈহিক ও নৈতিক দিক থেকে অনড 'পল্লী-সংলগ্ন অরণ্যে' হারিয়ে যাওয়া 'নিশ্চল সর্বহারা'কে সচল সর্বহারায় (mobile proletarian) পরিবর্তন এবং ব্যক্তিগত নির্ভরতার অসীম বিকশিত বন্ধন ও তার ভিন্ন ভিন্ন ধরনসহ শ্রমের এশীয় প্রথাকে ইউরোপীয় শ্রম-প্রথায় রূপান্তর।"[১৪]

সুতরাং এ বিষয়ে লেনিনীয় শিক্ষা অনুযায়ী দেশীয় শিল্পের ধ্বংসসাধনে বিচলিত না হয়ে তাকে সমাজবিকাশের ভবিতব্যরূপে গ্রহণ করাই সমীচীন, এবং আমাদের মনে রাখা উচিত যে স্বয়ংনির্ভর অর্থনীতির অগণিত কৃষকদের ঐ তথাকথিত স্বাধীনতা হল পরধীনতারই নামান্তর মাত্র। আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির কাছে যতই পীডাদায়ক হোক না কেন, এ ঐতিহাসিক সত্য আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে তৎকালীন ভারতীয় উৎপাদকদের "স্বাধীনতা" ক্ষুণ্ণ না করে ভারতীয় সমাজের অগ্রগতির অন্য কোন বিকল্প পথ সেদিন ছিল না। তাই মার্কস বলেছেন, "ভারতবর্ষে এক দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করতে হবে ইংলণ্ডকে: একটি ধ্বংসমূলক এবং অন্যটি উজ্জীবনমূলক—পুরাতন এশীয় সমাজের ধ্বংস এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা।"[১৫]

ইংল্যাণ্ড যে ভারতীয় সমাজ বিকাশের অবরুদ্ধ পথ উন্মুক্ত করার দায়িত্ব পালন করার জন্য ভারতবর্ষ অধিকার করে নি, তা বলাই বাহুল্য; তাদের

উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে বন্ধনহীন শোষণ। কিন্তু এই সীমাহীন লুণ্ঠনের পথকে প্রশস্ত করার জন্যই যেমন তাদের ভারতীয় সমাজের চিরন্তন উৎপাদনপ্রথার ধ্বংসসাধন করতে হয়েছিল, তেমনি ভারতীয় সমাজে তারা অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও ইউরোপীয় পুঁজিবাদী সমাজের বৈষয়িক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়েছিল। তবে এ বিষয়ে মনে রাখা প্রয়োজন যে, যেহেতু বৃটিশ শাসকবর্গ উদ্দেশ্য-মূলক ভাবে ভারতীয় সমাজের পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করেনি, তাই তাদের প্রচেষ্টাও কোনও সুপরিকল্পিত পথে অগ্রসর হয়নি। অবশ্য ভারতীয় সমাজের জটিলতা এবং সে সম্পর্কে অজ্ঞতাও তাদের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে। ভারতীয় জমি-মালিকানার ক্ষেত্রে বৃটিশ শাসকবর্গের প্রধান প্রচেষ্টা ছিল ভারতীয় গ্রামগোষ্ঠী ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে ইউরোপীয় সামন্ত-তান্ত্রিক জমি-মালিকানার প্রবর্তন। এই উদ্দেশ্যরই প্রথম রূপায়ণ হল ১৭৯৩ সালে বাংলায় লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রণীত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। অনেক সময়ই এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে ভ্রান্তভাবে প্রতিক্রিয়াশীল এবং সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা বলে প্রচার করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই জমি-বন্দোবস্তের প্রধান উদ্দেশ্যটি কি ছিল? যদিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্ট জমিদাররা পরবর্তীকালে ভারতে বৃটিশ শোষণের সামাজিক ভিত্তিতেই পরিণত হয়েছিল, কিন্তু এই নতুন বন্দোবস্তই কি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রবর্তন নয়? চিরায়ত ভারতবর্ষে যে জমিদারশ্রেণী ছিল জমির স্বত্বভোগী মাত্র, এই আইনদ্বারা কি সেই জমিদারবর্গকেই তদানীন্তন বাংলার ভূসম্পত্তির একমাত্র ন্যায়সঙ্গত ও বাস্তব অধিকারীরূপে ঘোষণা করা হয় নি? প্রকৃতপক্ষে প্রাক্-বৃটিশ ভারতবর্ষে যেহেতু জমিদারশ্রেণী নিজেরাই ছিল জমির স্বত্বভোগী তাই কৃষকসহ অন্যান্য স্বত্বভোগীদের জমি থেকে উচ্ছেদের প্রশ্নও সে সময়ে ছিল না; কিন্তু সেই জমিদাররাই এই বৃটিশ-প্রণীত আইন বলে সর্বপ্রথম ইচ্ছানুযায়ী কৃষক-উচ্ছেদ এবং কৃষকের উপর ইচ্ছামত খাজনা চাপানোর অধিকার অর্জন করল। ইচ্ছামত কৃষক উচ্ছেদ ও ক্রমবর্ধমান খাজনাদ্বারা নিষ্পেষিত কৃষকদের দুর্দশার বিষয়টি অবশ্যই মানবিকতার কাছে যথেষ্ট বেদনা-দায়ক, কিন্তু সমাজবিকাশ সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বিচার করলে এই অধিকারকে ভারতীয় সমষ্টিগত সম্পত্তির তুলনায় এক বিরাট

বৃটিশ প্রণীত নতুন ভূমি-বন্দোবস্তের তাৎপর্য

বিপ্লবী পদক্ষেপ হিসাবেই গণ্য করতে হয়। ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসকবর্গ জমি-মালিকানা সম্পর্কিত যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করছিলেন, তাকে লক্ষ্য করেই ল্যাফার্গ বলছেন, "আধুনিক কালে ভারতবর্ষে যা ঘটছে তা গ্রামীণ দলপতিকে সামন্তপ্রভুতে ( feudal baron ) রূপান্তরের ক্ষেত্রে বিজয় ( conquest )-এর ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।"[৯৬] এ বিষয়ে মার্কসও বলেছেন, "যত ঘৃণ্যই হোক, **জমিদারি ও রায়তোয়ারি** হল জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার দুটি বিশেষ রূপ—এশীয় সমাজের মহান লুপ্ত সূত্র হল এইটে।"[৯৭]

প্রকৃতপক্ষে নানা অসঙ্গতি সত্ত্বেও এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলায় জমি-মালিকানার চিরাচরিত প্রথার অবসান ঘটিয়ে ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক জমি-মালিকানা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল এবং সৃষ্টি করেছিল ইউরোপীয় অর্থে ল্যাণ্ডলর্ড বা জমিদার। তাই এই ভূমি-বন্দোবস্ত সম্পর্কে মার্কস-এর মূল্যায়ন হল : "কিন্তু যদি মেনেও নিই যে ভারতের জমি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, অন্য যে কোন জায়গায় জমির মতোই তা জোরদার পাকা পাট্টা বলে অধিকৃত, তাহলেও প্রকৃত মালিক বলে গণ্য করা হবে কাকে? এ দাবি আসছে দুই পক্ষ থেকে। এক পক্ষ হল **জমিদার বা তালুকদার** বলে যে শ্রেণীটি পরিচিত, ধরা হয় যে **এদের স্থান ইউরোপের ভূমিজীবী নোবল ও জেনট্রির সমতুল্য**; প্রকৃতপক্ষে এরাই জমির আসল মালিক, সরকারকে একটা খাজনা এদের দেয়, এবং মালিক হিসাবে এদের অধিকার আছে খুশি মতো কর্ষককে উচ্ছেদ করার এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কর্ষকেরা নিতান্ত উঠবন্দী প্রজারূপে গণ্য, জমিদার ন্যায্যজ্ঞানে যা ধার্য করবে তেমন যে কোনো টাকাই এরা খাজনা হিসাবে দিতে বাধ্য। সামাজিক কাঠামোর প্রধান খুঁটি হিসাবে ভূমিপতি জেনট্রির গুরুত্ব ও আবশ্যকতা বিষয়ে ইংরেজদের ধারণার সঙ্গে স্বভাবতই এ দৃষ্টিভঙ্গি মিলে যায় এবং লর্ড কর্ণওয়ালিসের বড়োলাটগিরির আমলে সত্তর বছর আগে বাংলার বিখ্যাত ভূমি বন্দোবস্ত হয় এরই ভিত্তিতে—সে বন্দোবস্ত এখনো বলবৎ, কিন্তু অনেকেই দাবি করেন যে তাতে সরকার ও আসল কর্ষক উভয়ের প্রতিই বিরাট অন্যায় ঘটেছে। হিন্দুস্থানের প্রথার আরো পূর্ণাঙ্গ বিচার এবং বাংলা বন্দোবস্তপ্রসূত সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয়প্রকার অসুবিধার ফলে এই মত চালু হয় যে, আদি

হিন্দুপ্রথা মতে জমির মালিকানা ছিল গ্রামপঞ্চায়েতে (corporations), বিভিন্ন ব্যক্তিকে জমি বিলি করার অধিকার ছিল তাদেরই, আর **আদিতে জমিদার ও তালুকদাররা** মাত্র গ্রাম থেকে প্রাপ্ত করের তদারকি, আদায় ও রাজার নিকট প্রত্যর্পণের জন্য নিযুক্ত **সরকারী কর্মচারী বই কিছু ছিল না**।"[১৮] ( বড় হরফ আমাদের )

কিন্তু সকলেই জানেন যে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী সমগ্র ভারতবর্ষে একই রকম জমি-মালিকানা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেবলমাত্র তৎকালীন বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে সে ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল—বিপুলায়তন ভারতবর্ষে প্রচলিত সমষ্টিগত সম্পত্তির আঞ্চলিক বিভিন্নতা। তাই বৃটিশ শক্তি ভারতবর্ষের সমষ্টিগত জমি-মালিকানার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ অনুযায়ী প্রবর্তন করে বিভিন্ন ধরনের ভূমি-বন্দোবস্ত, যেমন উত্তরাঞ্চলে মহলওয়ারি ব্যবস্থা, বম্বে ও মাদ্রাজে রায়তোয়ারি ব্যবস্থা। যদিও এই নতুন বন্দোবস্তগুলি ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তুলনায় পশ্চাৎপদ, কিন্তু এগুলিও হল ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক ভূমি মালিকানারই বিভিন্নরূপ, যা ভারতীয় সামাজিক অবস্থার সঙ্গে এক বিচিত্র সংমিশ্রণে জন্ম দিয়েছিল বিশেষ বিশেষ ধরনের জমি-মালিকানা। তাই সমগ্র ভারতবর্ষে বৃটিশ প্রণীত ভূমি-বন্দোবস্ত সম্পর্কে মার্কস লিখছেন, "অর্থাৎ বাংলায় পাচ্ছি ইংরেজি ল্যাণ্ড-লর্ডিজম, আইরিশ মধ্যস্বত্ব প্রথা, জামিদারকে কর সংগ্রাহকে পরিণত করার অস্ট্রীয় প্রথা এবং রাষ্ট্রকেই আসল ভূস্বামী করার এশীয় প্রথার সমাহার। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে পাচ্ছি এক ফরাসী চাষী মালিক যে সেই সঙ্গেই আবার এক ভূমিদাস এবং রাষ্ট্রের *Métayer* ( বা ভাগচাষী )। নানা ধরনের এই সমস্ত প্রথার ভালো দিকটুকু ভোগ না করে তার মন্দ দিকগুলো সব তার ওপর চেপে বসে। ফরাসী চাষীর মতো রায়তের ওপরেও ব্যক্তি কুসীদজীবীর হামলা আছে অথচ ফরাসী চাষীর মতো জমিতে তার কোনো স্থায়ী মৌরসী পাট্টা নেই। ভূমিদাসের মতো সে বাধ্য হয় চাষ করতে, অথচ স্থায়ী ভূমিদাসের মতো তার অভাব মেটানোর কোন ব্যবস্থা নেই। *Métayer*-এর মতো ফসলের ভাগ দিতে হয় রাষ্ট্রকে, অথচ *Métayer*-এর ক্ষেত্রে যে মালপত্র ও অগ্রিম দাদন দেবার কথা তা তাকে দিতে রাষ্ট্র বাধ্য নয়।"[১৯]

ইংরেজ পুঁজিপতিরা ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার সামন্ততান্ত্রিক জমি

মালিকানার প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত ছিল না, তারা কৃষি ও শিল্প—উভয়ক্ষেত্রেই পণ্য অর্থনীতি প্রচলনের চেষ্টা করেছিল। কৃষিতে এই প্রচেষ্টার ফলেই তারা চা, কফি, তামাক, নীল প্রভৃতি পণ্য উৎপাদনের প্রচলন করে। উনবিংশ শতকের প্রথম দিক থেকেই যদিও ব্যক্তিগত ভোগের পরিবর্তে ব্যাপক বাজারের জন্য এই সমস্ত কৃষিজাতদ্রব্য উৎপাদিত হতে শুরু করে, কিন্তু বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই বাণিজ্যিক কৃষি (কমার্সিয়াল ফার্মিং) বিশেষভাবে ব্যাপক আকার ধারণ করে। ভারতবর্ষে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে বৃটিশ পুঁজিপতিদের উদ্যোগেই প্রথম ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন, পুঁজিবাদী সরল সহযোগিতামূলক শিল্প, ম্যানুফ্যাকচার এবং অবশেষে আধুনিক শিল্পের পত্তন হয়, এবং প্রথম দিকে তারা নিজেরাই বাণিজ্যিক পুঁজিপতির ভূমিকা অবলম্বন করে। এই পর্যায়ে বৃটিশ ব্যবসায়ীশ্রেণী দেশীয় উৎপাদকদের যে দাদন ও কাঁচামাল সরবরাহ করত, তার ফলে উৎপাদকরা ক্রমশঃই বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস্তবিক-পক্ষে পুঁজিবাদী দিনমজুরেই পরিণত হত। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত উদ্ধৃতিতে রমেশ দত্ত বৃটিশ রেসিডেন্ট কর্তৃক দেশীয় উৎপাদকদেব যে কাঁচামাল সরবরাহে উৎপাদকদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে আক্ষেপ করছেন, আসলে ব্যবসায়ী-শ্রেণীর সেই কাঁচামাল সরবরাহই হল পুঁজিবাদী অর্থনীতির দিকে এক বিরাট অগ্রগতি। এ প্রসঙ্গে লেনিনের একটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। "যখন অবশ্য তৈরী মালের ক্রেতারা মূল্য হিসাবে 'হস্তশিল্পী'র প্রয়োজনীয় কাঁচামাল দান করে, তখন এটা পুঁজিবাদী সম্পর্কেব বিকাশেব ক্ষেত্রে **একটা বিরাট অগ্রগতি বলে চিহ্নিত হয়।** ক্ষুদে শিল্পপতিকে তৈবী মালের বাজার থেকে ছিন্ন ক'রে ক্রেতা এবার তাকে কাঁচামালের বাজার থেকেও ছিন্ন করল, আর এই ভাবে সে শিল্পপতিকে তাব নিজের পূর্ণ আয়ত্তে এনে ফেলল।…হস্তশিল্পীরা স্বগৃহে পুঁজিপতির জন্য কাজ করে বাস্তবিকপক্ষে দিন-মজুরে পরিণত হল। ক্রেতার বাণিজ্যিক পুঁজি এক্ষেত্রে শিল্প পুঁজিতে রূপান্তরিত হল। সূচনা হল পুঁজিবাদী পারিবারিক শিল্পের।"১০০

**ভারতে বৃটিশ শাসনের পরিণতি: সচেতন শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশ**

শুধুমাত্র পুঁজিবাদী সরল সহযোগিতামূলক শিল্পই নয়, বৃটিশ পুঁজিপতিরা ভারতবর্ষে আক্ষরিক অর্থে ম্যানুফ্যাকচারও গড়ে তোলে; ফলে ভারতবর্ষে যে শিল্পবিকাশের সূচনা হয়, তার ফলেই ভারতে বৃটিশ শাসনের একশ

বছরের মধ্যে আধুনিক বৃহৎ শিল্পর প্রতিষ্ঠা হয়। রেললাইন প্রচলনের পর যে সমস্ত বৃহৎশিল্প গড়ে ওঠে, তার মধ্যে প্রধান হল স্থতাশিল্প। ১৮৫৪ সালে ভারতে প্রথম স্থতাকল চালু হলেও, ১৮৬১ সালে মোট বারোটি স্থতাকল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৭৯ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ছাপান্নটিতে। শুধুমাত্র স্থতাশিল্পই নয়, এই সময় থেকে পাটশিল্প, লৌহ-শিল্প, কয়লাখনি প্রভৃতির যে বিস্তার ঘটে, তার দরুন ভারতবর্ষের মত একটি পশ্চাৎপদ দেশেও অবশেষে একটি আধুনিক প্রলেতারিয়েত শ্রেণী জন্মগ্রহণ করে। ১৮৭৯ সালে কেবলমাত্র স্থতাশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪৩,০০০। বিগত শতকের সপ্তম দশক থেকে ভারতীয় প্রলেতারিয়েত-সংখ্যার যে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে, তার ফলে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই দশকেই শিল্প-শ্রমিকরা একটি শক্তিশালী শ্রেণীতে পরিণত হয়। বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মতে ১৯২৭-২৮ সালে ভারতে সংঘবদ্ধ হবার উপযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ২৫০ লক্ষ, যার মধ্যে কৃষি-শ্রমিক ও বাগিচা-শ্রমিকের সংখ্যা হল যথাক্রমে ২১৫ লক্ষ এবং ১০ লক্ষ। এই কংগ্রেসের মতে সে সময়ে প্রকৃত শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা হল ৩৫ লক্ষ। ইণ্ডিয়ান ফ্রানচাইজ কমিটির পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৩১ সালে ভারতবর্ষে সর্বসমেত দিনমজুরের সংখ্যা ৫ কোটি ৬৫ লক্ষ। অবশ্য রজনীপাম দত্ত গণনা করে এই সময়ে প্রকৃত শিল্প-শ্রমিকের যে সংখ্যা দিয়েছেন,[১০১] তা হল :

| | | |
|---|---|---|
| মাঝারি ও বড় কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিক | : | ২,০৩৬,৭৫৮ |
| খনি-শ্রমিক | : | ৪১৩,৪৫৮ |
| রেলওয়ে-শ্রমিক | : | ৭০১,৩০৭ |
| নাবিক ও ডক-শ্রমিক | : | ৩৬১,০০০ |
| মোট | | ৩,৫১২,৫২৩ |

অনেকেই হয়ত ভারতবর্ষের মত একটি জনবহুল দেশে ৩৫ লক্ষাধিক শ্রমিকের সংখ্যাকে শিল্প বিকাশের একটি অন্যতম নির্দেশকরূপে গ্রহণ করতে সম্মত হবেন না। কিন্তু একটি পশ্চাৎপদ দেশের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি যে কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়, তা ১৯০৫ সালের বিপ্লব-পূর্ববর্তী রাশিয়ার প্রকৃত শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যার সঙ্গে তুলনা করলে স্পষ্ট হবে। লেনিন ১৯০০-০৩

সালে রাশিয়ার প্রকৃত শিল্প-শ্রমিকের যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় যে সেসময়ে সমগ্র রুশ সাম্রাজ্যে মোট শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা হল ২,৭৯২,৩৭৪ অর্থাৎ প্রায় ২৮ লক্ষ। আর এই রুশ শ্রমিকদের বিভিন্ন শিল্পভিত্তিক বিভাজন হল নিম্নরূপ : ১০২

| | | |
|---|---|---|
| কলে কারখানায় কর্মরত শ্রমিক | : | ১,৫০৯,৫১৬ |
| খনি-শ্রমিক | : | ৬২৬,৯২৯ |
| রেলওয়ে-শ্রমিক | : | ৬৫৫,৯২৯ |

পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশের তুলনায় রাশিয়া যথেষ্ট পশ্চাৎপদ হলেও, ভারতবর্ষের তুলনায় প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়ার অগ্রসরতা সন্দেহাতীত। তাই অন্ততঃ শিল্প-বিকাশের ক্ষেত্রে ১৯০৩ সালের রাশিয়া ও ১৯৩১ সালের ভারত-বর্ষের তুলনা হয়ত অসঙ্গত হবে না। বিশেষতঃ যখন ১৯০০-০৩ এর শিল্প-বিকাশকে লেনিন এবং স্তালিন রুশ শিল্প-বিকাশের এক উল্লেখযোগ্য পর্যায় বলে বর্ণনা করেছেন এবং তার মাত্র দু'বছর পরেই সচেতন রুশ প্রলেতারিয়েত শ্রেণী ১৯১৭ সালের সফল বিপ্লবের 'ড্রেস রিহার্সাল'-এ নেমে পড়েছেন এবং পূর্ব ইউরোপের ও প্রাচ্যের প্রথম বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূত্রপাত করেছেন, তখন এই সময়ের রুশ শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যাকে নিঃসন্দেহে শিল্প-বিকাশের একটি নির্দেশক লক্ষণ হিসাবে গণ্য করা যায়। আর তাই এই তুলনা থেকে আমাদের এ সিদ্ধান্তই করতে হয় যে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বৃটিশ প্রভাবে পুঁজিবাদ বিকশিত হলেও, বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি করেছিল তার প্রকৃত সংহারক, ভারতীয় বিপ্লবের নেতৃত্ব করার উপযুক্ত শ্রমিকশ্রেণী।

নিছক সংখ্যার দিক থেকেই নয়, ভারতীয় বিপ্লবে নেতৃত্ব করার উপযুক্ত শক্তি ও সচেতনতা যে এই সদ্যবিকশিত শ্রমিকশ্রেণী অর্জন করছিলেন তার পরিচয় বর্তমান শতকের প্রথম দুই দশকের বাস্তব রাজনীতিতেই দেখা যায়। বস্তুতঃ ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন কার্যকলাপের সূত্রপাত উনিশ শতকের সত্তরের দশকে। এই পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণী যে সমস্ত ধর্মঘট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মজুরীবৃদ্ধির দাবীতে ১৮৭৭ সালে নাগপুরের এম্প্রেস্ মিলের শ্রমিক ধর্মঘট। ১৮৮২-৯০ সালের মধ্যে কেবলমাত্র বম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে অনুষ্ঠিত শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা

হল পঁচিশটি। ১৯০৫-০৯ সালে শ্রমিক আন্দোলনের বিশেষ অগ্রগতি ঘটে এবং তার ফলে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে, কলকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেস, বঙ্গের বিভিন্ন মিলসহ বিভিন্ন শিল্পালয়ের শ্রমিকরা একের পর এক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। আর ১৯০৮ সালে তিলকের দণ্ডপ্রাপ্তির প্রতিবাদে বম্বের শ্রমিকরা যে ছয়দিন ব্যাপী ধর্মঘট পালন করেন তাতে গোটা বম্বে শহরই অচল হয়ে যায়, এবং এই ধর্মঘট ভাঙার জন্য বৃটিশ শাসকদের অবশেষে সামরিক বাহিনীর শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। স্মরণ করা যেতে পারে লেনিন এই ধর্মঘটকেই ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন নামে অভিহিত করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই সচেতন শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এক ভীষণ আকার ধারণ করে। ১৯১৯-২০ সালের মধ্যে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী যে অসংখ্য ধর্মঘট আন্দোলন গড়ে তোলেন সে সম্পর্কে রজনীপাম দত্ত নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান দিচ্ছেন, "১৯১৯ সালের শেষ দিকে এবং ১৯২০ সালের প্রথমার্দ্ধে এই তরঙ্গ সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছয়।...১৯২০ সালের প্রথম ছয় মাসে অনুষ্ঠিত দুশোটি শ্রমিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন মোট পনের লক্ষ শ্রমিক।"[১০৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ১৯২০ সালের প্রথম ছ'মাসে ভারতে অনুষ্ঠিত দুশোটি শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন মোট ১৫ লক্ষ শ্রমিক। শ্রমিক শ্রেণীর এই সংগ্রাম কি ভারতীয় ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা নয়? ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী যে বিপ্লবী নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত শক্তি ও সচেতনতা বেশ কিছুটা অর্জন করেছিলেন, ১৯১৯-২০র ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন কি এই ঘটনাই প্রমাণ করে না? লেনিন বলেছেন প্রথম রুশ বিপ্লবে ধর্মঘটী শ্রমিকদের সর্বোচ্চ সংখ্যা হল, ১৯০৫ সালে, যে সময়ে ২,৭৫০,০০০ শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু ধর্মঘটী শ্রমিকদের এই সংখ্যা কমে এসে ১৯০৬ সালে হয় ১,০০০,০০০; ১৯০৭ সালে ৭৫০,০০০, আর ১৯০৮ সালে ১৭৫,০০০। লেনিন আরও বলেছেন যে ১৯০৫ সালের আগের বছরগুলোতে প্রতি বছর গড়ে ধর্মঘটী শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৪৩,০০০।[১০৪]

এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে লেনিন-স্তালিন পরিচালিত একটি যথার্থ শ্রমিক বিপ্লবের ধর্মঘটী শ্রমিকদের সর্বোচ্চ সংখ্যাটি ভারতীয় ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রায় দ্বিগুণ হলেও, বিপ্লব পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধর্মঘটী শ্রমিকসংখ্যার

তুলনায় ১৯১৯-২০ সালের ভারতীয় ধর্মঘটী শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। এই সময়ে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী যে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, এমন মনে কর্বার কোন কারণ নেই। ১৯১৮ সালের রাওলাট বিল-বিরোধী শ্রমিক আন্দোলনটি ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক চরিত্রের, এবং সে সময় বহু অর্থনৈতিক আন্দোলনই পুলিশ-মিলিটারি বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, প্রায় একই সময়ে চীনা শ্রমিকদের সংগ্রামেও এক অভূতপূর্ব জোয়ারের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ১৯২২-২৫এ চীনে পর পর যে সমস্ত বৃহৎ শ্রমিক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়, সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ধর্মঘটী শ্রমিকদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল উক্ত ভারতীয় ধর্মঘটী শ্রমিকদের সংখ্যার তুলনায় নিতান্ত কম; মাত্র তিন লক্ষের কিছু বেশী। যে দেশে একটা প্রকৃত কমিউনিষ্ট পার্টি'ত দূরের কথা, এমনকি কোন ধরনের কমিউনিষ্ট আন্দোলনেরও অস্তিত্ব নেই, সেই দেশে শ্রমিকশ্রেণীব এই স্বতঃস্ফূর্ত, অথচ ব্যাপক ও জঙ্গী ধর্মঘট-আন্দোলন কি পুঁজিবাদী বিকাশেরই এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নয়?

ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর এই ঐতিহাসিক সংগ্রামকে বর্তমান সংশোধনবাদীরা একটি বিস্মৃত অধ্যায়ে রূপান্তরিত করলেও, শ্রমিকশ্রেণীর এই আন্দোলন লেনিন-স্তালিনের কাছে যে ভারতীয় বিপ্লবের এক বিরাট সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছিল, তার প্রমাণ ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়া আজও সম্ভব হয় নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যে বিশ্বব্যাপী যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-সংগ্রামের সৃষ্টি হয়েছিল, সে বিষয় উল্লেখ করে লেনিন বললেন, "এই সব দেশের পুরোভাগে রয়েছে বৃটিশ-ভারত, এবং ভারতে বিপ্লবের পরিণতি লাভ দ্রুততর হচ্ছে একদিকে শিল্প ও রেলওয়ে শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি দ্বারা এবং অন্যদিকে বৃটিশের ক্রমবর্ধমান বর্বরতায়—যারা ক্রমেই বেশী করে সামগ্রিক হত্যাকাণ্ড (অমৃতসর), প্রকাশ্য বেত্রাঘাত ইত্যাদির আশ্রয় নিচ্ছে।"[১০৫]

১৯২৪ সালে স্তালিন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "লেনিনবাদের ভিত্তি"তে বিশ্ব-বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশলগত নানা আলোচনা করেছেন। 'রুশ বিপ্লবের পর কোন্ কোন্ দেশে শ্রমিক-বিপ্লব হওয়ার সম্ভাবনা আছে?'—এ প্রসঙ্গে স্তালিন বললেন, "অদূর ভবিষ্যতে আবার কোথায় শেকল ভাঙবে?

আবার যেখানে এটা সব থেকে দুর্বল। যেমন ভারতবর্ষেই যে এই শেকল ভাঙবে না, তা আগে থেকে বলা যায় না। কি কারণে? কারণ ঐ দেশটার একটা তরুণ, জঙ্গী, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী রয়েছে যার আছে মুক্তিআন্দোলনের মত মিত্র। আর এই জাতীয় মুক্তিআন্দোলন হল নিঃসন্দেহে শক্তিশালী এবং নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ মিত্র। কারণ সেখানে বিপ্লব মোকাবিলা করছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের মত একটা কুখ্যাত শত্রুর, যার যেমন কোন নৈতিক আস্থা নেই, তেমনি সঠিকভাবেই সেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ভারতের আপামর নির্যাতিত ও শোষিত মানুষ দ্বারা ঘৃণিত।"১০৬

ভারতীয় বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্পর্কে লেনিন-স্তালিনেব আশা আজও কি করে সফল হল না, তা এক অন্য ইতিবৃত্ত। কিন্তু এখানে যেটা লক্ষ্যণীয় তা হল লেনিন এবং স্তালিন উভয়েই এবিষয়ে ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের উল্লেখযোগ্য সংখ্যাকে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসাবে গণ্য করেছেন। ভারতের মত একটি নিম্নস্তরের সামন্ততান্ত্রিক দেশে শিল্প-শ্রমিকের এই উল্লেখযোগ্য সংখ্যাবৃদ্ধি ও বাস্তব রাজনৈতিক কার্যকলাপ কি পুঁজিবাদের বিকাশ ভিন্ন সম্ভব ছিল? তাই মার্কস ভাবতে বৃটিশ শাসনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে যে শিল্প-বিকাশের কথা ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, সেটিই বাস্তবায়িত হয়ে বর্তমান শতকের প্রথম দিকেই বৃটিশ শাসন থেকে ভারতবর্ষেব প্রকৃত মুক্তির পথ উন্মুক্ত করেছিল। আসলে বর্তমান ভারতীয় নৈরাষ্ট্রবাদীরা নারদ্‌নিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যেহেতু সমাজ-বিপ্লবেব ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর বাস্তব উপস্থিতিব প্রয়োজন বোধ কবেন না, এবং বাস্তবিকপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেন না, সেহেতু তাঁরা ভারতে বৃটিশ শাসনকালে শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব ভিত্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে প্রাক্-পুঁজিবাদী ভারতবর্ষের মধ্যেই 'পরাধীনতার গ্লানি' থেকে মুক্ত হওয়ার পথ খুঁজে পান।

ভারতবর্ষে পণ্য অর্থনীতি ও আধুনিক শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে বৃটিশ পুঁজিবাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য হলেও, কিন্তু তার দ্বারা কি সমগ্র ভারতীয় উৎপাদন-প্রথার বিপ্লবী রূপান্তর ঘটেছিল? উনিশ শতকের ভারতীয় শিল্প-বিকাশের গতির হার কি যথেষ্ট দ্রুত ছিল? এক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতটা মনে রাখা প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য যে ভারতে বৃটিশ

শাসনের সূত্রপাত থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত, এই দেড়শো বছরের হিসাবে ভারতীয় শিল্প-বিকাশের গতি ছিল নিতান্তই মন্থর; কিন্তু আসলে

**পুঁজিবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজের প্রতিবন্ধকতা**

বিবেচ্য হল কোন্ সমাজে এই পণ্য অর্থনীতির প্রচলন ঘটছে? মার্কস যাকে বলেছেন—অপরিবর্তমান-অচলায়তন সমাজ; যে সমাজে ভূমিমালিকানার মৌলিক রূপ হল সমষ্টিগত সম্পত্তি; আর যে সমাজ কৃষি ও শিল্পের পারিবারিক বন্ধন, বংশানুক্রমিক জাতিভেদপ্রথা ও পরিশেষে কর্মান্তরবাদ ও জন্মান্তরবাদ মারফৎ প্রস্তুত করেছে প্রাচ্য-স্বৈরাচারের বাস্তব ভিত্তি। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় অচলায়তন সমাজের এই লৌহদৃঢ় ভিত্তিই ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল। কারণ পুঁজিবাদী ব্যবসা যে কোন প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজে একটি বিপ্লবী ভূমিকা পালন করলেও, এই পুঁজিবাদী ব্যবসা কোন একটি সমাজে কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করবে, তা নির্ভর করে শেষোক্ত সমাজের আভ্যন্তরীণ কাঠামোর উপর। এ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস বলেছেন, "সুতরাং বাণিজ্য (commerce) যেখানেই উৎপাদনকারী সংগঠন হাতে-নাতে পায়, যার বিভিন্ন রূপ প্রধানতঃ ব্যবহার মূল্যের দিকে দৃষ্টি রেখে চালিত হয়, সর্বত্রই বাণিজ্য এগুলিকে বিলুপ্ত করার ক্ষমতা ধারণ করে। এটা সেকেলে উৎপাদন প্রথার কি পরিমাণ বিলোপ সাধন করবে তা নির্ভর করে শেষোক্তটির সংহতি (solidity) ও আভ্যন্তরীণ কাঠামোর ওপর। এই বিলোপ সাধন প্রক্রিয়া কোন্ দিকে চালিত হবে, বা অন্য কথায় কোন্ নতুন উৎপাদনপ্রথা পুরানোর স্থান দখল করবে, তা বাণিজ্যের ওপর নির্ভর করে না, বরং এটি পুরানো উৎপাদনপ্রথার চরিত্রের ওপরই নির্ভরশীল।"১০৭

ভারতীয় সমাজব্যবস্থা বৃটিশ পুঁজিবাদের প্রভাবের বিরুদ্ধে কি পরিমাণ প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল সে বিষয়ে উল্লেখ করে মার্কস আরও বললেন, "প্রাক্-পুঁজিবাদী, জাতীয় উৎপাদন প্রথায় আভ্যন্তরীণ সংহতি ও সংগঠন কিভাবে বাণিজ্যের ক্ষয়কারী প্রভাবের সামনে প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করে, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় ভারত ও চীনের সঙ্গে ইংরেজদের আদান-প্রদানে (intercourse)। এই সব জায়গায় উৎপাদনপ্রথার ব্যাপক ভিত্তি সৃষ্টি হয়েছে ক্ষুদ্রমাত্রার কৃষি ও পারিবারিক শিল্পের সম্মিলনে। এর সঙ্গে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমাদের যোগ করা উচিৎ—**জমির সমষ্টিগত**

**মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গ্রামগোষ্ঠীর বিষয়টি, যা ঘটনাক্রমে চীনেরও আদি রূপ ছিল।** ভারতবর্ষে শাসক ও ভূমি-মালিকরূপে ইংরেজরা এই সমস্ত ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক গোষ্ঠীগুলিকে ধ্বংস করার জন্য তাদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করে নি। এই গোষ্ঠীগুলির ওপর বাণিজ্য **একটা বিপ্লবী প্রভাব বিস্তার করেছিল** এবং সেগুলিকে ছিন্ন-ভিন্ন করেছিল,…। কিন্তু তবুও ধ্বংস সাধনের কাজটা এগোচ্ছে খুবই ধীরে। **চীনে যেখানে বাণিজ্য প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ক্ষমতা দ্বারা শক্তিশালী হয় নি, সেখানে এর গতি আরও মন্থর।** দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতি এবং কুটীরশিল্পের সঙ্গে কৃষির মিলন যে সময়-সংক্ষেপ প্রদান করে, তা বৃহৎ শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যের সামনে এক অনমনীয় প্রতিবন্ধ খাড়া করে,…। অপরপক্ষে রুশী বাণিজ্য কিন্তু ইংরেজদের মত নয় এবং তা এশীয় উৎপাদনের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে অক্ষতই রাখে।"[১০৮] ( বড় হরফ আমাদের )

ভারতীয় সমাজের এই অপরিবর্তমান আভ্যন্তরীণ কাঠামোর জন্যই যেমন বৃটিশ পুঁজিবাদ প্রাক্-পুঁজিবাদী ভারতীয় উৎপাদন প্রথার বিপ্লবী পরিবর্তনের পরিবর্তে পরিমাণগত পরিবর্তন সাধনে বাধ্য হয়েছিল, তেমনি ভারতীয় শিল্প-বিকাশও হয়েছিল মন্থর। আর এই কারণেই দেখা যায় যে বৃটিশ প্রবর্তিত ভূমি বন্দোবস্তগুলি আদর্শ সামন্ততান্ত্রিক জমি-মালিকানার পরিবর্তে সৃষ্টি করেছিল এক বিচিত্র ধরনের জমি মালিকানা। প্রকৃতপক্ষে প্রাক্-বৃটিশ ভারতীয় সমাজে যদি পুঁজিবাদী বিকাশের লক্ষণ অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও প্রকট হত, তা'হলে বৃটিশ পুঁজিবাদের প্রভাবে তা যে বিশেষ গতি অর্জন করত তার ফলে সৃষ্টি হত এক সর্বভারতীয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, আর উনিশ শতক অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই যার আঘাতে ইংল্যাণ্ড নিজেই হত পরাভূত এবং অবশেষে ভারতবর্ষ থেকে বহিষ্কৃত।

ভারতের মত প্রাক্-বিপ্লব চীনও প্রাচ্য স্বৈরাচারী সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু চীনে এশীয় স্বৈরাচারের ধরনটা ছিল স্বতন্ত্র। চীনা সমাজের এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য পূর্ব উদ্ধৃত মার্কসের উক্তিতে দেখতে পাওয়া যায় যে সমষ্টিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে গ্রামগোষ্ঠী চীনে আদিতে প্রচলিত থাকলেও, পরবর্তীকালে আর তার অস্তিত্ব ছিল না। আর এই কারণেই চীনা সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পণ্য-অর্থনীতির বীজ, বিনিময় প্রথা বপন সম্ভবপর হয়েছিল। চীনা

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই মাও সে-তুং বলেছেন, "যেহেতু চীনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পণ্য-অর্থনীতির বিকাশলাভ ঘটেছিল, তাই তার ভেতরে পুঁজিবাদের বীজ এসেই গিয়েছিল, সুতরাং বিদেশী পুঁজিবাদের আঘাত না খেলেও এমনিতেই সে ধীরে ধীরে একটি পুঁজিবাদী সমাজে পরিণত হয়ে যেতো।"[১০৯] বাইরের কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই চীনে পুঁজিবাদ বিকশিত হতে পারত—এ কথা বলার পর চীনা পুঁজিবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে বৃটিশ সহ অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের ভূমিকায় মাও সে-তুং এর প্রতিক্রিয়া কি রকম হল? মাও বললেন, "বিদেশী পুঁজিবাদ এই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে তুললো। চীনের সামাজিক অর্থনীতি যে ভেঙে গেল **তাতে বিদেশী পুঁজিবাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল**; একদিকে সে স্বয়ং-সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অর্থনীতির বনিয়াদ দুর্বল করে দিল এবং যেমন সহরের, তেমনই কৃষকের ঘরের হস্তশিল্প ভেঙে দিল, অপরদিকে সহরে ও গ্রামাঞ্চলে একটি পণ্য অর্থনীতির বিকাশকে সে ত্বরান্বিত করে তুললো।

"চীনের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ভেঙে পড়ার ব্যাপারে বিদেশী পুঁজিবাদের এই ভূমিকা ছাড়াও, এই পরিস্থিতি থেকে চীনে পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশের অনুকূল বাস্তব অবস্থা ও সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। কারণ, চলতি অর্থনীতি ধ্বংস হওয়ার ফলে পুঁজিবাদের জন্য একটি পণ্যের বাজার যেমন সৃষ্টি হয়, তেমনি বিরাট সংখ্যক কৃষক ও হস্তশিল্পী দেউলিয়া হয়ে পড়ায় ঐ সঙ্গে একটি শ্রম বাজারও পুঁজিবাদ পেয়ে যায়।"[১১০] ( বড় হরফ আমাদের )

অর্থাৎ এখানেও, পুঁজিবাদী বিকাশ বিচারের জন্য একটি মানদণ্ড পাওয়া যাচ্ছে, এবং সে মানদণ্ডে সর্বকালে, সর্বদেশে প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের তুলনায় পুঁজিবাদ অনেক বেশী প্রগতিশীল। এই কারণেই দেখা যাচ্ছে—যে হস্তচালিত শিল্পের ধ্বংস দেখে কিছু কিছু ভারতীয় বিপ্লবী অশ্রুপাত করেন এবং বৃটিশ 'সাম্রাজ্যবাদ'-এর শোষণের প্রমাণ পান, সেই ঘটনায় আদৌ বিচলিত না হয়ে মাও সে-তুং একজন আদর্শ মার্কসবাদীর মত বললেন যে এর ফলে একটা শ্রমের বাজারের সৃষ্টি হল, যা প্রকৃতপক্ষে চীনে পুঁজিবাদের বিকাশকেই সহায়তা করবে।

সুতরাং এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গেই এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে বৃটিশ পুঁজিবাদ একটি

**বিপ্লবী** ভূমিকা পালন করেছে। আর তাই রামমোহনের ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনকে সমর্থন কোন প্রতিক্রিয়াশীল কাজ নয়। রামমোহন প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা চালিত হয়েছিলেন বলেই ভারতীয় সমাজ বিকাশের প্রধান প্রতিবন্ধক শক্তিগুলি সম্পর্কে মার্কসের অনেক আগেই মার্কসের অনুরূপ মূল্যায়ন করা রামমোহনের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল। রামমোহনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী, প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গী নয়। তাই যেমন তাঁর কাছে তৎকালীন পুঁজিবাদী ইংল্যাণ্ডের সর্বাধুনিক চরিত্রটি সুস্পষ্ট ছিল, তেমনি তিনি সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে এই বৃটিশ পুঁজিবাদ হল চিরাচরিত ভারতীয় কূপমণ্ডুকতা ধ্বংসের একমাত্র অস্ত্র। এই কারণে সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতবর্ষের মত একটি পশ্চাৎপদ দেশে পুঁজিবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে রামমোহন যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা হল একটি **প্রকৃত বিপ্লবী** ভূমিকা।

কিন্তু সমাজের কোন্ অংশের পক্ষে এই বুর্জোয়া বিকাশের বিরোধিতা করা সম্ভব? "নিম্ন মধ্যবিত্ত, ছোট হস্তশিল্প কারখানার মালিক, দোকানদার, কারিগর, চাষী—এরা সকলে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়ে মধ্যশ্রেণীর টুকরো হিসাবে নিজেদের অস্তিত্বটাকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচাবার জন্য। তাই তারা বিপ্লবী নয়, রক্ষণশীল। বলতে গেলে প্রতিক্রিয়াশীলও, কেননা ইতিহাসের চাকা পিছনে ঘোরাবার চেষ্টা করে তারা।"[১১১] প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ-ভারতবর্ষেও একদিকে সামন্তপ্রভুরা (ভারতীয় অর্থে) এবং অন্যদিকে সমাজের এই রক্ষণশীল অংশ পুঁজিবাদী বিকাশকে প্রতিহত করার জন্য বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল। রামমোহন সে দলে যোগদান না করে যথার্থ প্রগতিশীল কাজই করেছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে রামমোহন যে দৃষ্টিভঙ্গী ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, আজ বিংশ শতকের শেষে শ্রমিকশ্রেণীর পতাকাবাহী বলে পরিচিত একদল রামমোহন-সমালোচক সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ইতিহাসের চাকাকে পিছন দিকে ঘোরাতে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন; আর তৎকালীন রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রচার করছেন প্রগতিশীলতার নামে। ইতিহাসের কি নিষ্ঠুর রসবোধ!

ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রসঙ্গে অবশ্য আর একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে বৃটেনের বিপ্লবী ভূমিকার উল্লেখ থেকে হয়ত কোন কোন ব্যক্তি এমন সিদ্ধান্ত করতেও কুণ্ঠিত হবেন না যে বর্তমান আলোচনায় ভারতে সমগ্র বৃটিশ শাসনকেই, এমন কি তার অন্যায় শোষণ ও অত্যাচারকেও সমর্থন করা হচ্ছে। বৃটিশ শাসন কেমন ছিল? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আর একবার মার্কস-এর শরণাপন্ন হওয়া যাক্। ১৮৫৩ সালের ১৪ই জুন মার্কস এঙ্গেলসকে এক পত্রে লিখছেন, "এই গোপন লড়াইটা আমি চালিয়েছি ভারতের ওপর একটি প্রবন্ধে যাতে ইংরেজ কর্তৃক দেশীয় শিল্প ধ্বংসকে বর্ণনা করেছি বিপ্লবী বলে। এতে ভারি আহত হবে ওরা। আর সব ব্যাপারে ভারতে বৃটেনের গোটা শাসনটাই ছিল শূকরোচিত এবং আজও তাই আছে।"[১১২] যদিও বৃটিশ-পূর্ব দিনের তুলনায় বৃটিশ শাসন অনেকক্ষেত্রে উন্নত ছিল, কিন্তু এই 'শূকরোচিত' শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিটি **বিদ্রোহই হল ন্যায়সঙ্গত**। ইংল্যাণ্ডের ভারত অধিকারের একমাত্র লক্ষ্য যে অবাধ শোষণ, তা বলা বাহুল্য। আর এই শোষণকার্যটি অব্যাহত রাখার জন্যই তাকে উদ্ভাবন করতে হয়েছিল অত্যাচারের নানা পথ। অত্যাচারের যে সমস্ত পন্থাগুলি বৃটিশ শাসকশ্রেণী তাদের স্বদেশে গ্রহণ করতে শঙ্কা বোধ করত, সেগুলিই তারা অবলীলাক্রমে ভারতীয় শান্ত সরল গ্রামবাসীর উপর প্রয়োগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না। এখানে কিন্তু যে বিষয়টি স্মরণ রাখা প্রয়োজন তা হল ভারতবাসীর উপর এই অন্যায় অত্যাচার বা বলপ্রয়োগ, বহুক্ষেত্রেই বৃটিশ শাসকবর্গ কর্তৃক অনুমোদিত ছিল না, এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলি অনুসৃত হত কোম্পানীর নিকৃষ্ট কর্মচারী দ্বারা। বাস্তবিক পক্ষে যে সমস্ত কোম্পানি কর্মচারী ভাগ্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে এসে হাজির হত, তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য হত অতি অল্প আয়াসে প্রচুর সম্পত্তি অধিকার ও লাম্পট্যপূর্ণ জীবনযাত্রা, এবং এদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ ছিল তদানীন্তন ইংরেজসমাজের নিকৃষ্টতম অংশ। আর নিরীহ ভারতীয়দের উপর অবাধ কর্তৃত্বের সুযোগ এই সমস্ত ভাগ্যান্বেষীদের করে তুলত এক একটি ক্ষুদ্র দানব। এই শ্রেণীর কোম্পানী-কর্মচারীরা এত প্রভাবশালী ছিল যে তারা এমন কি স্বয়ং কোম্পানি বাহাদুরকেও প্রয়োজনে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখাত। এক দল কোম্পানি কর্মচারী যে কোম্পানির অলক্ষ্যে বেআইনীভাবে প্রভূত অর্থ

ভারতে বৃটিশ অত্যাচার ও রামমোহন

অর্জন করেছিল তা এই ঘটনারই প্রমাণ। এই অবাধ্য কর্মচারীদের দমনের জন্য কোম্পানি যে চেষ্টা করত না তা নয়। কিন্তু সেগুলি কিভাবে ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত হত, তারই নমুনা হল ইউরোপীয় নীলকুঠিওয়ালাদের অত্যাচার সংযত করার জন্য কোম্পানির প্রচেষ্টা। সাধারণ কৃষকদের নীলচাষে বাধ্য করানোর জন্য ইংরেজ কুঠিওয়ালারা যে কি বীভৎস অত্যাচার করত সে কাহিনী আজ কোন শিশুরও অজানা নয়। কিন্তু নীল ছিল ভারতবর্ষে উৎপাদিত অন্যতম প্রথম কৃষিজপণ্য। আর যেহেতু এটি ছিল কৃষির ক্ষেত্রে পণ্য অর্থ-নীতির সূচনা, তাই স্বভাবতঃ নীল উৎপাদন চিরাচরিত উপায়ে ধান উৎপাদনের তুলনায়, এমন কি কৃষকদের পক্ষেও লাভজনক ছিল। অবশ্য এই অর্থকরী লাভের সুযোগ সত্ত্বেও ভারতীয় কৃষকগণ খুব স্বাভাবিক কারণে নীলচাষকে তাঁদের জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে সম্মত হন নি। কারণ যে কোন গ্রামীণ সমাজে কোন নতুন প্রবর্তন ( ইনোভেশন ) সহজে গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই ভারতবর্ষে ব্যাপক নীলচাষের জন্য প্রয়োজন ছিল কৃষকদের মানসিকতার রূপান্তর, আর যা সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে পণ্য-অর্থনীতির অপেক্ষাকৃত ব্যাপক প্রচলন ভিন্ন সম্ভব নয়। কিন্তু অর্থলোলুপ ইংরেজ কুঠিমালিকরা কৃষকদের মানসিকতা রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দানে কোনভাবেই আগ্রহী ছিল না ; আর তাই তারা বিকল্প হিসাবে বেছে নিল কৃষকদের উপর অকথ্য অত্যাচারের পথ। অবশ্য সরকারের কাছে এই অত্যাচার অন্ততঃ পুরোমাত্রায় অভিপ্রেত ছিল না। তাই নীলকুঠি মালিকদের সংযত করার উদ্দেশ্যে সরকার ১৮১০ সালের ১৩ই জুলাই যে বিশেষ সার্কুলার প্রচার করে, তাকে কার্যকর ব্যবস্থাই বলা যায়। এ সম্পর্কে রমেশ দত্ত বলছেন, "ইস্তাহারে জেলাশাসকদের এই মর্মে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে তাঁরা যেন বেড়িগুলি বিনষ্ট করে ফেলেন, চাষীদের ওপর প্রহার ও দৈহিক নির্যাতনের ঘটনাবলীর বিবরণ পেশ করেন এবং যদি ইউরোপীয় নীলকরগণ সরকারি আদেশের মর্ম মেনে না চলেন তবে গ্রামাঞ্চলে তাঁদের বসবাস প্রতিরোধ করেন। ২০শে জুলাই ১৮১০-এ অন্য একটি ইস্তাহারে ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশ দেওয়া হয়, যে-সমস্ত নীলকর চাষীদের দাদন নিতে বাধ্য করে এবং বে-আইনী কায়দায় নীল চাষে বাধ্য করে থাকে, তাদের সেই সব কাজের রিপোর্ট পাঠাতে।"[১১৩]

বলা বাহুল্য, সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ নীলকরদের বর্বর পথ গ্রহণ থেকে বিরত

করতে পারেনি; আর এই কারণেই ১৮৫৯ সালের নীলবিদ্রোহ। যেহেতু এই নীলবিদ্রোহ হল বৃটিশ শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রোষেরই প্রকাশ, তাই সেটি হল একটি প্রকৃত গণবিদ্রোহ। শুধুমাত্র নীলবিদ্রোহই নয়, বৃটিশ শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে আন্দোলনই গড়ে তুলেছিলেন, এমন কি তার মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য ও সচেতনতার অভাব থাকলেও, এমন কি সেগুলি ধর্মীয় ভিত্তির উপর স্থাপিত হলেও, এই আন্দোলনগুলি বিপ্লবী আন্দোলন ভিন্ন কিছু নয়। আর এই বিচারে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের কৃষক বিদ্রোহ সহ বহু ভারতীয় বিদ্রোহই হল বিপ্লবী, যেগুলি সৃষ্টি করেছে ভারতের বিপ্লবী ঐতিহ্য।

সুতরাং রামমোহনের ভারতে বৃটিশ শাসনকে সমর্থন করার প্রধান কারণ মেনে নেওয়ার পরও প্রশ্ন থেকে যায় যে রামমোহন বৃটিশ শাসনের এই নেতিবাচক দিকগুলি সম্পর্কে কি দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন? বৃটিশের অন্যায় শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কোন নজির কি রামমোহনের আছে? ১৮৩১ সালে বৃটিশ পার্লামেণ্ট নিয়োজিত সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্যদানকালে রামমোহন যে সমস্ত মন্তব্য করেছিলেন, আমরা প্রধানতঃ সেগুলির মধ্য থেকেই এ সম্পর্কে রামমোহনের প্রকৃত মতটি জানার চেষ্টা করব।

**বৃটিশ প্রণীত রাজস্ব প্রথা, বিচারবিভাগীয় প্রথা ও রামমোহন**

প্রথমে ধরা যাক বৃটিশ প্রণীত ভারতীয় রাজস্ব প্রথার বিষয়টি। সিলেক্ট কমিটি এ বিষয়ে রামমোহনকে মোট চুয়ান্নটি প্রশ্ন করেছিল। এছাড়া রাজস্বপ্রথা সম্পর্কে রামমোহনের মতামত *'Revenue System—A paper'*-এও লক্ষ করা যায়। রামমোহনকে অনেকসময় বাংলার নতুন জমিদারদের প্রতিনিধি হিসাবে চিত্রিত করা হয়। কিন্তু এই 'জমিদার প্রতিনিধি'ই দ্ব্যর্থ্যহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তয় একমাত্র লাভবান হল জমিদার ও সরকার। তাঁর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সরকারী মহল থেকে প্রতিবাদ উঠলে, রামমোহন সুস্পষ্টভাবে বললেন, "রাজস্বপ্রথা বিষয়ক প্রবন্ধে আমি এই মত ব্যক্ত করেছিলাম যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে চুক্তিকারী উভয়পক্ষ—সরকার ও জমিদারবর্গ লাভবান হয়েছে। প্রথমোক্তের এ অবস্থান দীর্ঘদিন বিতর্কিত থাকলেও বর্তমানে তা আর শুধু তত্ত্বের ওপরই প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং বিগত চল্লিশ বছরের বাস্তব কার্যাবলীর ফলাফল থেকেই এটি

প্রমাণ করা যায়।"[১১৪]

বৃটিশ-প্রণীত ভূমিব্যবস্থায় জমিদাররা যে নানা উপায়ে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করেছে, সে উল্লেখও রামমোহন করেছেন। অপরপক্ষে কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে রামমোহনেব মতামত কি? তাঁর কাছে যখন সিলেক্ট কমিটি জানতে চাইল যে কৃষকদের হাতে পুঁজি জমবাব কোন সুযোগ আছে কি না, তখন রামমোহনের বলিষ্ঠ উত্তর হল, "মোটেই না, প্রায়ই যখন শস্য প্রচুর পরিমাণে হয় ও ফলে সস্তা হয়ে যায় তখন তারা…জমিদারদের দাবি মেটাবার জন্য সমস্ত ফসল বিক্রয় করতে এবং নিজেদের শ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হয়। অপ্রাচুর্য ও অভাবের বছরগুলোতে তারা তাদের খাদ্যের একটা অংশ হিসাবে কিছুটা ফসল রক্ষা করতে সমর্থ হয় বটে, তবে তা সারাবছরের খাদ্যের তুলনায় কোনক্রমেই যথেষ্ট নয়।[১১৫]

ক্রমবর্ধমান খাজনা ও জমিদারদের নানা ছল-চাতুরীর দ্বারা কৃষকরা কিভাবে নিষ্পেষিত হতেন তার বিবরণও রামমোহন এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে দৃষ্টান্তস্বরূপ খুদ-কস্ত কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে রামমোহনের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "পূর্ববর্ণিত চারটির যে কোন অবস্থাতে বাস্তবে জমিদাররা তাদের স্থানীয় প্রভাবের মাধ্যমে ও ষড়যন্ত্রের দ্বারা সহজেই এমনকি খুদ-কস্ত কৃষকদেরও সম্পূর্ণভাবে অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে এবং তাদের খাজনাও বৃদ্ধি করেছে।"[১১৬]

রাজস্বপ্রথা সম্পর্কিত রামমোহনের বিস্তারিত আলোচনার সম্পূর্ণ বিবরণ এখানে উপস্থিত করা সম্ভব নয়। তাই বৃটিশ প্রণীত ভূমিব্যবস্থায় কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে রামমোহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য আমরা উদ্ধৃত করছি। রামমোহনকে প্রশ্ন করা হল—'বাংলার জমিদারি ব্যবস্থায় ও মাদ্রাজের রায়তোয়ারি ব্যবস্থায় কৃষকদের অবস্থা কি রকম?' উত্তরে রামমোহন বললেন, "উভয় অবস্থাতেই কৃষকদের অবস্থা অতি মর্মান্তিক। একটাতে তারা জমিদারদের অর্থলিপ্সা ও উচ্চাশার দয়ায় দিন কাটাচ্ছে; আর একটাতে তারা সার্ভেয়ার ও রাজস্ব দফতরের অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের জুলুম ও ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েছে।"[১১৭]

সুস্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে যে বৃটিশ শাসনের সমর্থক হলেও, রামমোহন বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে জমিদারদের বিশেষ সুবিধাজনক অর্থনৈতিক

অবস্থান ও সাধারণ কৃষকদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা সম্বন্ধে প্রতিবাদ করতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন নি। রামমোহন শুধু প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার প্রতিকারও দাবী করেছিলেন। রামমোহনকে এ অব্যবস্থা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সুপারিশ করতে বলা হলে তিনি বললেন, "বিগত চল্লিশ বছর ধরে যে নতুন ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে তা জমিদারদের নিজেদের পরিতৃপ্তি অনুযায়ী জমির পূর্ণ পরিমাপ করতে এবং বার বার জবরদস্তি করে কৃষকদের খাজনা যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে নিতে সাহায্য করেছে। এ অবস্থায় কৃষকদের অবস্থোন্নতির জন্য আমি যে ন্যূনতম প্রস্তাব রাখতে পাবি ও সরকাব যে যৎসামান্য কাজটুকু করতে পারেন তা হল কোন ছলেই যাতে খাজনা বৃদ্ধি না হয় সেজন্য **চূড়ান্তভাবে খাজনা বৃদ্ধি নিষিদ্ধ করা**; বিশেষতঃ কোন অবস্থাতেই **ছলনাপূর্ণ নতুন জরিপ মারফৎ জমির বর্তমান স্থিরীকৃত ও স্বীকৃত ব্যবস্থায় পরিবর্তন করা চলবে না**;… যদি সরকার যে কোন ভাবে কর বসিয়ে অথবা সরকারী প্রতিষ্ঠানের, বিশেষ করে রাজস্ব বিভাগ পবিচালনের খরচ কমিয়ে যথেষ্ট রাজস্ব আয় করতে পারে, তা'হলে যেসব জেলায় খাজনা খুব বেশী, সেখানে আনুপাতিক হারে জমিদারদের খাজনা কমিয়ে সরকার জমিদারকে দেয় **কৃষকদের খাজনা হ্রাস করতে পারে।**"[১১৮] (বড হরফ আমাদের)

তা'হলে কৃষকদেব উন্নতিকল্পে রামমোহনের সুপারিশ কি কি? প্রথমতঃ, যে কোন উপায়ে কৃষকদের খাজনা বৃদ্ধি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী করতে হবে; দ্বিতীয়তঃ, কোন অছিলায় নতুন করে জমির জরিপ করে তৎকালীন জমি-বন্দোবস্তের পরিবর্তন করা চলবে না; তৃতীয়তঃ, যে সব জায়গায় খাজনার হার খুব বেশী সেখানকার কৃষকদের খাজনার বোঝা কমাতে হবে; এবং সর্ব-শেষে, এর ফলে সরকারী রাজস্বের যে ঘাটতি দেখা দেবে, তা প্রশাসনিক ব্যয় কমিয়ে এবং নতুন কর বসিযে মেটাতে হবে। অন্যত্র তিনি বলেছেন, এই কর বিলাসদ্রব্যের ওপরই বসাতে হবে।

উপরোক্ত মন্তব্যগুলি কি রামমোহনের দুর্দশাগ্রস্ত কৃষিজীবী জনগণের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিরই নিদর্শন নয়? কৃষকদের অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা থেকেই তাঁকে বলতে শোনা যায়, "‥ আমি কর্তৃপক্ষের প্রত্যেকের কাছে ভারতের কৃষিজীবীদের এই দুর্দশা অপনোদনের

জন্য কোন একটা উপায় উদ্ভাবন করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি… ।"১১৯

রামমোহন যেভাবে বৃটিশ প্রণীত ভূমিব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই তিনি ভারতে প্রচলিত বিচার পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতিও এই সাক্ষ্যদানকালে প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে তাঁর বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে তদানীন্তন বিচারক ও বিচার পদ্ধতির ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান। এই ত্রুটিপূর্ণ বিচারপদ্ধতির সুযোগে আমলারা, এমনকি বিচারকরা কিভাবে সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে অবৈধভাবে অর্থ আদায় করত তা উল্লেখ করে রামমোহন মন্তব্য করলেন, "যে সমস্ত দেশীয়দের যোগ্যতা ও প্রচেষ্টা দ্বারা সরকারের প্রত্যক্ষ বিবেচনা অর্জনের কোন আশাই নেই, তাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের জন্য সরকারী কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের আশায় তারা সময় সময় সরকারী কর্মচারীদের অর্থের দাবী মেনে নিতে প্ররোচিত হয়। তাদের দেয় উৎকোচের সঙ্গে বিচারক ও অন্যান্যদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনেক সম্পর্কই থাকে। যখন সরকারী কর্মচারীদের কর্তৃত্বের মধ্যে দেশীয়দের সম্পত্তি অবস্থান করে তখন তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা থেকে উপকৃত হওয়ার আশায় দেশীয়রা কখনও কখনও এ অর্থের দাবী মেনে নেয়। আবার কোন কোন সময় যে বিচারক ১৮০৭ সালের ৯নং আইনধারা অনুযায়ী শুধুমাত্র কারারুদ্ধ করার জন্যই ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়, এমনকি যে কোন আইনগত অছিলায় তাব নিজের কর্তৃত্ববলে যে কোন মর্যাদাসম্পন্ন দেশীয়দের মৃত্যুদণ্ড দান করতে পারে, সেই সব বিচারকের শত্রুতা-ভোগ করার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যও তারা এটা করে থাকে।১২০

তদানীন্তন ভারতে প্রচলিত বিচারবিভাগীয় প্রথার যে দুর্নীতির জন্য সাধারণ মানুষ নির্যাতিত হতেন, রামমোহনের মতে তার প্রধান কারণ হল দুটি—একদিকে ইংরেজ বিচারকদের সর্বময় কর্তৃত্ব, আর অন্যদিকে বিচার বিভাগের নিম্নস্তরের দেশীয় কর্মচারীদের স্বল্প বেতন। এই অব্যবস্থার প্রতিকার হিসাবে রামমোহন যে সমস্ত প্রস্তাব পেশ করেন তার প্রথম হল ইংরেজ বিচারকদের বিচার করার একচেটিয়া অধিকার চূর্ণ করে দেশীয় ও ইংরেজ উভয়শ্রেণীর ব্যক্তির মিশ্রণে গঠিত জুরীপ্রথার প্রবর্তন। দ্বিতীয় প্রস্তাব হল, বিচারক হিসাবে দেশীয় ও ইংরেজদের নিয়োগ, যার উদ্দেশ্য হল বিচারকদের

মধ্যে দেশীয়দের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার এবং ইংরেজদের মর্যাদা ও দৃঢ়তার সংমিশ্রণ ঘটানো ( '...the only remedy which exists is to combine the knowledge and experience of the native with the dignity and firmness of the Europeans' ) । ১২১

এদেশীয় বিচারবিভাগীয় বিষয় সম্পর্কে রামমোহনের প্রস্তাবসমূহের মধ্যে অন্যতম হল—সকল শ্রেণীর, সকল বর্ণের, সকল ধর্মের ভারতীয় নাগরিকদের জন্য একই ধরনের আইন প্রণয়ন। এই শেষোক্ত বিষয়টি রামমোহনের নিজের ভাষাতেই শোনা যাক্, "যতদূর সম্ভব এমন নীতির ওপর ভিত্তি করে ফৌজদারি আইনের নিয়মাবলী গঠন করা উচিৎ যা হবে দেশের বসবাসকারী সর্বপ্রকার গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের পক্ষে সর্বজনীন এবং যা তাদের দ্বারা স্বীকৃতও হবে। যাতে অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে এটা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ মানদণ্ডরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং যাতে এর ব্যাখ্যার জন্য মুসলমান বা খৃষ্টান, অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন না হয়, সেইজন্য এই নিয়মাবলী অবশ্যই হবে নীতির ক্ষেত্রে সরল, বিন্যাসের দিক থেকে স্বচ্ছ এবং সংজ্ঞার ক্ষেত্রে শব্দবাহুল্য বর্জিত।"১২২

এই সাক্ষ্যদানকালে রামমোহন যে ইংরেজ ও দেশীয়দের যৌথ জুরী প্রথার প্রচলনের দাবী করেন তার একটু পটভূমি আছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব কনট্রোলের সভাপতি, ওয়েন, ভারতবর্ষে যে জুরী বিলের প্রবর্তন করেন সেই বিলে খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের হিন্দু-মুসলমানদের বিচারের অধিকার থাকলেও, হিন্দু বা মুসলমান কর্তৃক খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের বিচারের কোন অধিকার দেওয়া হয় নি। এই বিলের উদ্দেশ্য যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও ইউরোপীদের বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীরূপে গণ্য করা তা রামমোহনের বুঝতে কোন অসুবিধা হয় নি। তাই তিনি ১৮২৬ সালেই এই বিলের প্রতিবাদ করে একটি আবেদন বৃটিশ পার্লামেণ্টে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁর আবেদন সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়। এই কারণে এই সাক্ষ্যদান কালে রামমোহন এই বিষয়টির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে দাবী করলেন যে এমন আইন ও বিচারব্যবস্থা প্রচলিত হোক যাতে ইউরোপীয় ও এদেশীয় উভয়েই একই আইন দ্বারা শাসিত হবেন, এবং ইউরোপীয়রা দেশীয় ও ইংরেজ জুরীদের যৌথ বিচার মানতে বাধ্য

থাকবেন ; অর্থাৎ আইনের চোখে ইউরোপীয়দের বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অবস্থার বিলোপ সাধন। রামমোহনের এই প্রতিবাদ এবং সুপারিশ ইংরেজ শাসকদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করেছিল কি না বলা যায় না, তবে ১৮৩৩ সালে তৎকালীন বোর্ড অব কনট্রোলের সভাপতি চার্লস্ গ্রাণ্ট যে নতুন জুরী বিল উপস্থিত করেন, তার সঙ্গে রামমোহনের চিন্তাধারার কোন মৌলিক প্রভেদ ছিল না। কিন্তু ইংরেজদের বিচারের কোন অধিকারই দেশীয়দের নেই—এই অছিলায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টররা যথারীতি এ বিলটিকেও প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কোম্পানি পরিচালকদের এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিবাদে রামমোহন ডিরেক্টরদের আক্রমণ ক'রে তীব্র ভাষায় 'ইংরাজী গেজেট'-এ যে প্রবন্ধ (১৮৩৩) প্রকাশ করলেন তা স্মরণ-যোগ্য। এই প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখলেন,

"ডিরেক্টরগণ কি বলতে চান যে ভারতে ইংরেজরাই একমাত্র খৃষ্টধর্মাবলম্বী, অথবা এটা কি তাঁদের জানা নেই যে বৃটিশ অধিবাসীরা ভারতে বসবাসকারী খৃষ্ট-অনুগামীদের একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র? শুধু কি তথ্যের অভাব থেকেই তাঁরা এমনভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করেন যেন তা কেবলমাত্র ইংরাজ-সংক্রান্তই, অথবা তাঁরা এটা করেন এ বিষয়টিকে তাঁদের নিরপেক্ষ ও খোলাখুলি বিচার করার অনিচ্ছা থেকে? তাঁরা কি প্রাচ্যের প্রাচীন বসবাসকারীদের অসংখ্য বংশধর, দেশীয় পর্তুগীজ খৃষ্টান সম্পর্কে কখনও শোনেননি? ইউরোপীয় ও দেশীয়দের মিশ্রিত সন্তানাদি সম্পর্কে, যার সংখ্যা প্রতিদিনই অগুন্তি হচ্ছে? সাম্প্রতিক কালের মিশনারি কর্তৃক ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের কথা না হয় বাদ দেওয়াই গেল। সুতরাং ডিরেক্টরগণ কোনক্রমেই জুরী-বিচার সংক্রান্ত আইনের সাধারণ ক্রিয়াকলাপ থেকে কেবলমাত্র ইংরেজ অধিবাসীদেরই অব্যাহতি দিতে চান না।...

"যদি ইংরেজদের প্রতি সমানুভূতির অভাবের দরুণ খৃষ্টান বিচারের ক্ষেত্রে জুরীরূপে কাজ করা থেকে হিন্দু ও মুসলমানদের বহির্ভূত রাখা হয়, তা'হলে হিন্দু-মুসলমান বিচারের ক্ষেত্রে জুরীরূপে খৃষ্টানদের কাজ সম্পর্কেও একই আপত্তি প্রযোজ্য। উভয় ক্ষেত্রেই নীতি একই এবং বিচারের কাছে কোন ব্যক্তির সম্মানের প্রশ্ন অর্থহীন।"[১২৩]

এই প্রবন্ধে রামমোহন ডিরেক্টরদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও বললেন,

"প্রজাদের কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর প্রতি ঈর্ষামূলক পক্ষপাত প্রদর্শনের পরিবর্তে যে কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত, যোগ্য ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের পক্ষপাতহীন সম-উৎসাহ প্রদান ক'রে প্রতিটি সরকারেরই দায়িত্ব হল তার সকল প্রজাদের একটি মহৎ পরিবাররূপে গণ্য ক'রে প্রজাদের আবেগ, স্বার্থ ও মানসিক গঠনের সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং তা রক্ষা করা। কিন্তু এর বিপরীত পন্থা অবলম্বন করলে সমানুভূতির স্থান নেবে ধর্মীয় ঈর্ষা, সমস্বার্থের স্থান দখল করবে একদিকে আধিপত্য ও কর্তৃত্ব এবং অপরদিকে ঘৃণা ও প্রতিশোধস্পৃহা; এবং সর্বশেষে সম মানসিক গঠনের জায়গায় এমনকি সরকারী কাজেও প্রভেদ কবার ও বিভক্ত করার এক অবাধ রেখা প্রতিষ্ঠিত হবে।"[১২৪]

এই হল রামমোহনের বৃটিশ 'চাটুকারিতা'র আসল স্বরূপ। যে সমস্ত ব্যক্তি রামমোহনের বৃটিশ 'তোষণে' ঘৃণায় মুখ বিকৃত করেন, তাঁরা কি রামমোহনকে বিভিন্ন বিশেষণে বিভূষিত করার আগে তাঁর উক্ত মন্তব্যগুলি বিচারের কোন কষ্ট স্বীকার করে থাকেন? মনে হয় না। রামমোহন সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ বুর্জোয়া ঐতিহাসিকের মন্তব্যগুণি পুনরাবৃত্তির আগে যদি তাঁরা সে কষ্ট স্বীকার করতেন, তা'হলে তাঁরা নিশ্চয়ই দেখতে ব্যর্থ হতেন না যে সেই উনিশ শতকের শুরুতেই রামমোহন কি অসীম সাহসিকতার সঙ্গে ভারতবর্ষে বৃটিশ অত্যাচারের প্রকৃত চরিত্রটি তুলে ধরেছিলেন। যে রামমোহনকে তৎকালীন জমিদারশ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে চিহ্নিত করা হয়, সেই রামমোহনই বলতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি যে বৃটিশ প্রণীত ভূমিব্যবস্থায় একমাত্র লাভবান হল সরকার ও জমিদার। কৃষকগণ সরকার ও জমিদারদ্বারা কিভাবে শোষিত ও লাঞ্ছিত হন, তার বিবরণ কি কোন জমিদার শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারীর পক্ষে দেওয়া সম্ভব? প্রকৃতপক্ষে রামমোহন বৃটিশ তোষণকারী জমিদার ছিলেন না বলেই তিনি নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছিলেন—নতুন ভূমিব্যবস্থায় ভারতীয় কৃষকগণের অবস্থা হল শোচনীয়। আর তাই তাঁর দাবী খাজনা হ্রাসের। কিভাবে খাজনা হ্রাস করা যাবে? রামমোহনের সুপারিশ—বিলাসদ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি এবং সরকারী প্রশাসনের ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে রাজস্বের যে উদ্বৃত্ত অংশ থাকবে, তার ফলে খাজনা হ্রাস সম্ভব। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে

ইংরেজ কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য খরচ মারফৎ কি পরিমাণ ভারতীয় অর্থ ইংল্যাণ্ডে নিঃসারিত হত, সেটি আবিষ্কারের কৃতিত্ব বর্তমানে অনেক ব্যক্তিই দাবী করে থাকেন। কিন্তু এই বিষয়েও রামমোহন হলেন পথিকৃৎ। যখন রামমোহনের এই খাজনা ও প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাসের প্রস্তাবে তদানীন্তন বৃটিশ রাজপুরুষদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, তখন রামমোহন *"Judicial and Revenue System : Appendix"* এই শিরোনামে যে বক্তব্য প্রকাশ করেন, তা'তে তিনি বিভিন্ন সরকারী তথ্যের সাহায্যে গণনা করে দেখান—১৮২৭ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে সরকারী কাজে নিযুক্ত ইংরেজদের বেতনরূপে (ভাতাসহ) ভারতবর্ষ থেকে নিঃসারিত অর্থের মোট পরিমাণ হল দু'কোটি এক লক্ষ আশি হাজার কুড়ি টাকা।[১২৫] প্রকৃতপক্ষে রামমোহনের রাজস্বপ্রথা ও বিচার-বিভাগীয় পদ্ধতি সম্পর্কে মন্তব্যগুলি হল তাঁর বিচক্ষণতা ও স্বদেশপ্রেমেরই নিদর্শন। এই স্বদেশপ্রেমের জন্যই যেমন তিনি ভারতীয় সমাজের কূপমণ্ডূকতা থেকে মুক্তির জন্য পুঁজিবাদী ইংল্যাণ্ডের সাহায্য গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন, তেমনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়র স্বার্থরক্ষাকে নিজের আদর্শ বলে মনে করেছিলেন। রামমোহন ভারতীয় ও ইংরেজের যৌথ জুরীপ্রথার সমর্থনে এবং কোম্পানি ডিরেক্টরদের বিরুদ্ধে যে বিষোদ্গার করেছিলেন তা এই স্বদেশপ্রেমেরই পরিচায়ক। শুধু তাই নয়, বৃটিশ কর্তৃক ভারতবর্ষে অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদে এবং এই বিষয়ে তদানীন্তন প্রগতিশীল বৃটেনবাসীর জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি প্রকাশ করেছিলেন, *"Aopeal to the British Nation against a violation of common justice and a breach of public faith by the Supreme Government of India with the Native Inhabitants"* (১৮৩২ অথবা ১৮৩৩-এ প্রকাশিত)। সুতরাং নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে রামমোহন ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনকে অন্যান্য শাসনব্যবস্থা থেকে অধিকতর সুবিধাজনক মনে করলেও, বৃটিশ অত্যাচারের সমর্থক ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন বৃটিশ শাসনের নেতিবাচক দিকগুলির একজন কঠোর বিরুদ্ধবাদী।

মার্কস তাঁর ভারতবিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসকবর্গ শুধুমাত্র ধ্বংসাত্মক কাজটাই করেছে, উজ্জীবন-মূলক কাজের লক্ষণ অনুপস্থিত। উজ্জীবনমূলক কাজের দায়িত্ব

বহন করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ রাজশক্তি ভারতবর্ষ অধিকার করেনি। তাই এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব বর্তেছিল উঠতি ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর, যে শ্রেণীটি রামমোহন-সময় থেকে পুঁজিবাদী বিকাশের মাধ্যমে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। সামন্ত শ্রেণী নয়, এই উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই একজন মানুষ ছিলেন রামমোহন, যিনি তাঁর পাশ্চাত্য জ্ঞানের ফলে গ্রহণ করেছিলেন প্রগতিশীল অবাধ প্রতিযোগিতামূলক বুর্জোয়া দর্শন। আর যুগের প্রয়োজনে দায়িত্ব নিয়েছিলেন ভারতীয় সমাজে এই উজ্জীবনমূলক কাজের। এই উজ্জীবনমূলক কাজের প্রকৃতি ছিল সংস্কারবাদী। অনেকে আবার সর্বকালেই সংস্কারবাদী কার্যকলাপকে প্রতিবিপ্লবী কাজ বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে সময়বিশেষে কোন কোন আন্দোলন বিবর্তনমূলক বা সংস্কার-বাদীও হতে পারে, এবং যখন সমাজে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই, তখন সংস্কারবাদী কার্যকলাপ বিপ্লবের কাজকেই সহায়তা করে। কিন্তু যখন সমাজে বিপ্লবের সম্ভাবনা প্রবল, তখন যদি কোন ব্যক্তি এই সংস্কারবাদী কার্যক্রম গ্রহণ করে, তখন তা প্রতিক্রিয়ারই স্বার্থরক্ষা করে। এ প্রসঙ্গে স্তালিনের শিক্ষাটি স্মরণ করা যেতে পারে। "দ্বান্দিক পদ্ধতি বলে যে, আন্দোলন দুই রূপে এগোয়ঃ বিবর্তনের রূপে আর বিপ্লবের পথে।

**উজ্জীবনমূলক কাজ ও রামমোহন**

"প্রগতিশীল উপাদানগুলো যখন দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো ব্যবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে **পরিমাণগত** পরিবর্তন ঘটায়, তখন তাকে বলা হয় বিবর্তন।

"যখন ঐ একই উপাদানগুলো একত্র হয়ে একক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পুরানো ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটিত ক'রে জীবনে একটা **গুণগত** পরিবর্তন আনার, এক নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে শত্রু-শিবিরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন সেই আন্দোলনেব চরিত্রায়নে বলা হয় বিপ্লবী বলে।

"বিবর্তন বিপ্লবের পথ তৈরী ক'রে দেয়, তার ক্ষেত্র তৈরী করে দেয়; বিপ্লব বিবর্তনের পদ্ধতিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে পরবর্তী বিবর্তনের সম্ভাবনার পথকে মুক্ত ক'রে দেয়।"[১২৬]

রামমোহনের সময়ে ভারতবর্ষ বিপ্লবের প্রতীক্ষায় দিন গুনছিল—মনে হয় কোন অর্বাচীনের পক্ষেও এ সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। তাই ঐতিহাসিক

প্রয়োজনেই রামমোহনকে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল। রামমোহন তাঁর বস্তুবাদী চিন্তাধারার ফলে উপলব্ধি করেছিলেন যে তদানীন্তন ভারতবর্ষের অগ্রগতির অন্যতম অন্তরায় হল বংশানুক্রমিক জাতি-ভেদপ্রথা, ধর্মীয় কুসংস্কার প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, আর এগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ভিন্ন অন্য কোন বিকল্প নেই। রামমোহনের সমস্ত বাস্তব কাজই এই চিন্তার পরিচয় বহন করে। ভারতীয় সমাজের এই কূপমণ্ডূকতা ধ্বংসের জন্য রামমোহন প্রধানতঃ দু'ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। একদিকে দেশীয় আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে একত্রে দেশে সতীদাহ নিবর্তন প্রভৃতি সংস্কারবাদী আন্দোলন গড়ে তোলা, এবং অন্যদিকে বৃটিশ শৈল্পিক বুর্জোয়াদের (যাঁরা ১৮৪০-৬০ সালেও উপনিবেশবাদের বিরোধিতা করতেন) সহায়তায় ভারতে পুঁজিবাদী ব্যবসার প্রচলন এবং আধুনিক শিল্পের বিকাশের চেষ্টা। রামমোহনের সতীদাহপ্রথা রদ করার জন্য আন্দোলন সুবিদিত। তাই সে আন্দোলনের সাফল্য বিচার না করে অনায়াসেই বলা যায় যে এটি হল আধুনিক ভারতবর্ষে প্রথম নারীমুক্তি আন্দোলন। সেদিন ভারতীয় জনগণকে ঐ ধর্মীয় কুসংস্কার ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রকৃত পাশ্চাত্য শিক্ষার। কিন্তু বৃটিশ শাসকবর্গ এই বিষয়ে আশ্চর্যজনকভাবে উদাসীন ছিল। তারা তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখার স্বার্থে কোনক্রমেই এদেশীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষাধারাকে স্পর্শ করতে চাইত না। তাই তারা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পরিবর্তে দেশীয় শিক্ষাধারাকে অক্ষুন্ন রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সে সময় বৃটিশ রাজপুরুষগণ এদেশে প্রচলিত ধর্ম্ম সম্পর্কে কি পরিমাণ স্পর্শকাতর ছিলেন, তারই একটি নমুনা শিবনাথ শাস্ত্রী দিয়েছেন। "১৮০৭ সালে শ্রীরামপুর হইতে পারস্য ভাষায় লিখিত একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তিকাতে মহম্মদীয় ধর্মের উপরে খ্রীষ্টীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছিল। ঐ পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে কলিকাতাবাসী রাজপুরুষগণ ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিলেন। উক্ত পুস্তিকার প্রচার বন্ধ করিবার জন্য ডেনমার্কের গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র গেল। তদনুসারে শ্রীরামপুরের ডেন রাজপুরুষগণ অবশিষ্ট ১৭০০ কি ১৮০০ পুস্তক কেরী প্রভৃতি প্রচারকদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া কলিকাতাতে গবর্ণর জেনারেলের মন্ত্রিসভার হস্তে অর্পণ করিলেন।"[২৭]

যখন এই দেশজ সংস্কৃতি রক্ষা করার চিন্তাধারা থেকেই বৃটিশ প্রভুরা কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন এ সংবাদে রামমোহনের কি প্রতিক্রিয়া হল? এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে ১৮২৩ সালে রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে যে ঐতিহাসিক পত্রটি দেন, সেটি রামমোহনের আধুনিক চিন্তাধাবারই এক স্মরণীয় দলিল। যে রামমোহন নিজে একজন সংস্কৃত-আরবী-ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত বলে খ্যাত ছিলেন, তিনিই এদেশে সংস্কৃত চর্চার যৌক্তিকতা সম্পর্কে বললেন, "বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারতবর্ষে যে-ধরনের শিক্ষা প্রচলিত আছে, সে-ধরনের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সরকার হিন্দু পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে একটি সংস্কৃত স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন। একমাত্র এটাই অনুমান করা যায় যে এই শিক্ষালয়টি (লর্ড বেকনের আগে ইউরোপে যে ধরনের শিক্ষালয় ছিল, ঠিক সেই চরিত্রের) ছাত্র বা সমাজের কাছে যৎসামান্য বাস্তব ব্যবহার আছে অথবা আদৌ নেই, এরকম ব্যাকরণগত পুঙ্খানুপুঙ্খতা ও দার্শনিক প্রভেদাদির সাহায্যে যুবকদের মন ভারাক্রান্ত করে তুলবে। এখানে ছাত্ররা সেই সবই শিখবে যা দু'হাজার বছর আগে জানা গেছে এবং তার সঙ্গে সংযোজিত হবে দূরকল্পী ব্যক্তি কর্তৃক সৃষ্ট ব্যর্থ ও শূন্য বাছ-বিচার যা ইতিমধ্যে ভারতের সর্বত্র সাধারণভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়।

"সংস্কৃত ভাষা এতই কঠিন যে এর যথাযথ শিক্ষার জন্য প্রায় সারাজীবনই অতিবাহিত করতে হয় এবং যুগ যুগ ধরে জ্ঞানপ্রসারের এক দুঃখদায়ক প্রতিবন্ধ স্বরূপ তা সুপরিচিত। এই ভাষা শিক্ষার জন্য যে শ্রমের প্রয়োজন হয়, প্রায় এক দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত এই শিক্ষা তাকে পুরস্কৃত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।"

পরিশেষে এই বৃটিশ নীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে রামমোহন মন্তব্য করলেন, "যদি বৃটিশ জাতিকে প্রকৃত জ্ঞান থেকে অজ্ঞ রাখাই অভিপ্রায় ছিল, তা'হলে স্কুলমেন-এর শিক্ষা, যা হল অজ্ঞতা বাঁচিয়ে রাখার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা, তাকে বেকনীয় দর্শন দ্বারা অপসারিত করতে না দিলেই হত। একইভাবে এদেশকে অন্ধকারে রাখার জন্য সংস্কৃত প্রথায় শিক্ষাদান হল সব থেকে প্রকৃষ্ট পথ, যদি অবশ্য এরকমই বৃটিশ সরকারের নীতি হয়ে থাকে। কিন্তু যেহেতু দেশীয় জনসাধারণের উন্নতিবিধান সরকারের লক্ষ্য, সেহেতু সরকারের উচিৎ

উদার ও উন্নত শিক্ষণ-প্রথার ব্যবস্থা করা, যা অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের সঙ্গে গণিত, প্রাকৃতিক দর্শন, রসায়ন ও শারীরস্থান বিদ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করবে। প্রস্তাবিত অর্থ ব্যয় করে ইউরোপে শিক্ষিত কয়েকজন প্রতিভাশালী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় পুস্তক ও যন্ত্রাদি-সম্পন্ন একটি কলেজের ব্যবস্থা এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে।"[১২৮]

সুতরাং এই হল সামন্ততান্ত্রিক রামমোহনের বৃটিশ 'চাটুকারিতা'র আরও একটি প্রমাণ। এই কারণেই কোন কোন বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী মনে করেন যে এই পত্রটিতে ব্যক্ত মতামত হল রামমোহনের ঔপনিবেশিক স্বার্থরক্ষারই এক সুকৌশল। এই রকমই একজন বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী লিখছেন, "অর্থাৎ তৎ-কালীন বঙ্গসমাজের 'রক্ষণশীল' ও 'উদারপন্থী' উভয় দল তাদের পারস্পরিক সংঘাত সত্ত্বেও একটি মাত্র ভজনালয়েই মিলিত হতে পারত, যার বিগ্রহ দেশী ছিল না, ছিল সাগরপারের। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রামমোহনের (এবং ডেভিড হেয়ারের) কোন সম্পর্ক ছিল না — রমেশ মজুমদারের এই সিদ্ধান্ত, অথবা তাঁর সঙ্গে রক্ষণশীলদের বিরোধিতা—এই তথ্য—এ সবের কোনটি বিস্মৃত না হয়েও আমরা বলতে পারি এই একটি ক্ষেত্রে, 'ইংরাজ স্তোত্র' উচ্চারণের সময়, উনিশ শতকের প্রথম পর্বের বাংলা সামাজিক উপন্যাসের অতি সরলীকৃত নায়ক রামমোহন ও খল-নায়ক রাধাকান্ত দেবের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য ছিল না। যেমন কোন পার্থক্য ছিল না তথা-কথিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে। **উভয় দলের লক্ষ্য ছিল এক : ঔপনিবেশিক শাসনকে দৃঢ়তর ক'রে তোলা.** সংঘাতটুকু ছিল শুধু পথ নির্বাচনের ক্ষেত্রে।" (বড় হরফ আমাদের)

এর পর লেখক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের চিন্তাধারার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে লিখেছেন, "এদিকে কবরের মধ্যে রামমোহনও নড়েচড়ে বসতে পারেন, তার কারণ তিনিও আমহার্স্টকে লেখা লিঠিতে এই কথাই তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন।"[১২৯]

সার্থক এঁদের সমাজচেতনা, ধন্য এঁদের মার্কসবাদ শিক্ষা! এঁদের স্মৃতি-শক্তি এমনই প্রখর যে মার্কসবাদ আবৃত্তির সময় এঁরা কত না সহজে বলে ফেলেন যে ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) হলেন আধুনিক যুগের প্রথম বস্তুবাদী ইংরাজ দার্শনিক। আর যখন কোন ব্যক্তি সেই বেকন প্রদর্শিত

জ্ঞানকে মানুষের অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হওয়ার অন্যতম পথ বলে বর্ণনা করেন, তখন তিনিই এঁদের চোখে 'বাংলা সামাজিক উপন্যাসের অতি সরলীকৃত নায়ক', 'ঔপনিবেশিক স্বার্থরক্ষাকারী', 'সামন্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি' প্রভৃতিতে পরিণত হন। এই বুদ্ধিজীবীরা যেন ঠিক সেই সমস্ত বুর্জোয়া শিক্ষক যাঁরা ক্লাশরুমে বিজ্ঞানের উপর 'সারগর্ভ' বক্তৃতা দেওয়ার পর বাড়ীতে গোচোনা সহকারে প্রায়শ্চিত্ত না করে তৃপ্ত হন না। রামমোহন এই পত্রে যে ফ্রান্সিস বেকনেরই উল্লেখ করেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, কারণ ফ্রান্সিস বেকনই ছিলেন লর্ড ( রজারস বেকন নয় ), এবং তাঁর দর্শনকেই বেকনীয় দর্শন বলা হয়। রামমোহন এই বেকনীয় বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিল—ভারতীয় সমাজের অন্ধতা থেকে মুক্তির পথ হল আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চর্চা। তাই তিনি সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, শারীরস্থান বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান শিক্ষার সুপারিশ করলেন; আর দাবী করলেন এমন কলেজ গঠন করা হোক যেখানে বৈজ্ঞানিক চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক ও যন্ত্রপাতির সুব্যবস্থা থাকবে। একমাত্র উগ্র-জাতীয়তাবাদী ও নৈরাষ্ট্রবাদী ভিন্ন সকলেই স্বীকার করবেন যে তদানীন্তন ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহনের এই চিন্তাধারা শুধু প্রগতিশীল নয়, একটি বিপ্লবী চিন্তাধারা। বলা বাহুল্য, রামমোহনের এই চিন্তাধারা কেবলমাত্র আমহার্স্ট'কে লিখিত চিঠিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ডেভিড হেয়ার প্রমুখ ব্যক্তিদের সাহচর্যে রামমোহনের পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা সুবিদিত। বর্তমানে রমেশ মজুমদার হিন্দু কলেজ গঠনে রামমোহনের ভূমিকাকে নস্যাৎ করার অপচেষ্টা করলেও, শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে রামমোহনের এই ভূমিকাকে এখনও পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারেন নি। রামমোহনের শিক্ষা বিষয়ে এই আধুনিক চিন্তাধারা তাঁর সহকর্মীদের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তা এইটুকু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট যে, ভারতবর্ষে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয় রামমোহনেরই ঘনিষ্ট সহকর্মী, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে। সে যুগে শবব্যবচ্ছেদ যে কি পরিমাণ দুরূহ কাজ ছিল, তার অনুমান কষ্টসাধ্য নয়। এই বিষয়ে হিন্দু সমাজের প্রতি-ক্রিয়ার মোকাবিলা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে দ্বারকানাথ প্রায় প্রতিদিনই শবব্যবচ্ছেদের সময় উপস্থিত থাকতেন এবং

প্রথম শবব্যবচ্ছেদটিও হয় তাঁরই উপস্থিতিতে।

১৯৭৭ সালের সংসদীয় নির্বাচনে ইন্দিরাগান্ধীর পরাজয়ের পর দেশে 'হৃত গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে' বলে নকশালপন্থীদের একাংশ উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করতে শুরু করেছেন। গণতান্ত্রিক অধিকার যে কিরকম পাওয়া গেছে তা আমরা আগেই লক্ষ করেছি। এখানে শুধু এটুকু স্মরণ রাখার প্রয়োজন আছে যে ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবীতে আন্দোলনের সূত্রপাতও কিন্তু এই 'ব্রিটিশ-প্রেমিক' রামমোহনেরই উদ্যোগে। সকলেই জানেন যে রামমোহন বাংলা 'সংবাদ কৌমুদী' এবং ফারসী 'মিরাৎ-উল-আখ্‌বার'—এই দুটি সাপ্তাহিক মারফৎ বাঙালী তথা ভারতীয়দের সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিব চেষ্টা করেছিলেন। এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেই 'মিরাৎ-উল-আখ্‌বার'-এর প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়েছিল, "এই পত্রিকায় যে সমস্ত রচনা স্থান পাইবে তাহা পাঠকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করিবে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির সহায়ক হইবে। ইহা ভিন্ন এই পত্রিকা মারফৎ দেশীয় প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা শাসকদের নিকট তুলিয়া ধরা হইবে; অপরপক্ষে শাসকদের আইন কানুনও জনসাধারণের গোচরে আনয়ন করা হইবে। ইহাদ্বারা একদিকে প্রজাবৃন্দ যেমন শাসকদিগের নিকট হইতে ন্যায়-বিচা ও অন্যান্য সাহায্যলাভের পথনির্দেশ পাইবেন, অন্যদিকে তেমনি শাসকগণও প্রজাদিগের দুঃখদুর্দশা মোচন করিতে পারিবে।"[১৩০] এই সময়ে সিল্ক বাকিংহামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হত 'ক্যালকাটা জার্নাল', যা সরকারী কাজকর্মের বিরূপ সমালোচনার জন্য অনিবার্যভাবে সরকারী রোষের শিকার হয়ে পড়ল এবং গবর্ণর জেনারেল জন এ্যাডামের আদেশে বাকিংহামকে ভারত ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হল। শুধু ক্যালক্যাটা জার্নালেই নয়, রাম-মোহনের পত্রিকাগুলিতেও সরকারী অব্যবস্থার সমালোচনা নিয়মিত প্রকাশিত হত। তাই তদানীন্তন সংবাদপত্রগুলির এই সমালোচনা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৮২৩ সালে জারী হল এক বিশেষ অর্ডিনান্স, যার দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে হরণ করা হোল। 'বৃটিশ প্রেমিক' রামমোহন তখন কি করলেন? যখন এই অর্ডিনান্স সুপ্রীম কোর্ট দ্বারা আইনসিদ্ধ হল তখন এই সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে রামমোহন তাঁর 'মিরাৎ'-এর প্রকাশ বন্ধ

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও রামমোহন

করে দিলেন। এই অর্ডিনান্স সম্পর্কে রামমোহন অন্যান্য পাঁচজন ভারতীয়ের সঙ্গে একত্রে সুপ্রীম কোর্টের কাছে যে আবেদন করেন, কোন কোন মহল থেকে এ সন্দেহও করা হচ্ছে যে এটি রামমোহনের নিজস্ব রচনা ছিল না। কিন্তু বৃটিশ রাজদরবারে তিনি যে আবেদনটি পাঠান সে সম্পর্কে অনুরূপ কোন অভিযোগ এখনও পর্যন্ত উত্থাপিত হয় নি। তাই একবার দেখা যাক্ কত বিনয়ের সঙ্গে 'রাজ-আশীর্বাদপ্রার্থী' রামমোহন এই আবেদনটি রচনা করেছিলেন।

"যদি এদেশের নির্দিষ্ট ঘটনাবলী থেকে গৃহীত এই সিদ্ধান্তসমূহ এইরকম একটা যুক্তির সম্মুখীন হয় যে, যেহেতু একটা উপনিবেশ বা দূরবর্তী অধীন দেশকে কখনই নিরাপদে 'প্রেস'-এর স্বাধীনতা বিশ্বাসভরে অর্পণ করা চলে না, এবং সেহেতু বাংলার অধিবাসীরা এতকাল যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে এসেছে, তাদের আর সে অধিকার দেওয়া যায় না, এ-যেন তাদের অন্যভাবে বলা যে তারা স্থায়ী পীড়ন ও অধঃপতনে দণ্ডপ্রাপ্ত হল, **যার থেকে বৃটিশ শাসনাধীন অবস্থায় তাদের অবস্থোন্নতির কোন আশাই নেই**।" (বড় হরফ আমাদের)

আধুনিক যুগে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংবাদপত্র যে কি ধরনের কার্যকর অস্ত্র তা রামমোহনের অজানা ছিল না। তাই তাঁর কাছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। আর এ স্বাধীনতা হরণ যে অত্যাচারেরই নামান্তর তা উল্লেখ করতে রামমোহন বিন্দুমাত্র শঙ্কা বোধ করেন নি। রামমোহন শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হন নি, এই ধরনের কার্যকলাপ যে একমাত্র স্বৈরাচারী সরকারেরই বৈশিষ্ট্য, কোন গণতান্ত্রিক সরকারের নয়, তার উল্লেখও বর্তমান আবেদনে লক্ষ করা যায়।

"এটি অতি পরিচিত যে, যেকোন মত প্রকাশের স্বাধীনতা যা স্বৈরাচারী সরকারের অন্যায় কার্যাবলী, এমন কি তার অত্যাচার উৎপীড়নের স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করে, **সেই মত প্রকাশের স্বাধীনতা দমনের জন্য সকল স্বৈরাচারী সরকারই বাসনা পোষণ করেন।** তারা সবসময় যে যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করে থাকে তা হল—সর্বপ্রকার জ্ঞানের প্রসার ক্ষতিকর; কারণ জনসাধারণ যখনই শিক্ষিত হয়ে ওঠে, তখনই তাদের দৃষ্টিগোচর হয় যে ঐক্যবদ্ধ কঠোর প্রচেষ্টার দ্বারা বহুসংখ্যক লোক সহজেই কয়েকজনের জোয়াল

থেকে অব্যাহতি পেতে পারে, আর এইভাবে তারা শক্তির দমন থেকে নিজেদের মুক্ত করে ;...”১৩১ ( বড় হরফ আমাদের )

রামমোহন যে জোরালো ভাষায় বাক্-স্বাধীনতার স্বপক্ষে এবং স্বৈরাচারী সরকারী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন তা কোন্ সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তি, কোন্ শাসকশ্রেণীর অনুচরের পক্ষে করার নজির আছে? প্রকৃতপক্ষে এটি কোন রাজভক্ত প্রজার অনুনয়-বিনয় নয়, এ হল একজন প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যক্তির জ্বলন্ত প্রতিবাদ। যাঁরা আজ রামমোহনের ভারতে বৃটিশ শাসনের তাৎপর্য না বুঝে তাঁকে ‘সাম্রাজ্যবাদের অনুচর’ আখ্যা দেন তাঁদের যদি এখনও কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে, তাহলে রামমোহনের এই তেজোদ্দীপ্ত প্রতিবাদ পড়ে লজ্জায় মাথা হেঁট করবেন। তবু হয়ত কোন বালখিল্য বলবেন—‘এই কি প্রতিবাদের স্বরূপ? কোন গণআন্দোলন নেই...’ ইত্যাদি। এঁদের প্রতি আমাদের আবেদন—দোহাই, আপনারা আর অজ্ঞতার প্রমাণ দেবেন না।

রামমোহনের সমস্ত সংস্কারবাদী কার্যকলাপেরই প্রেরণা হল সমকালীন ইউরোপ, আব এই কার্যকলাপগুলি ভারতবর্ষে পুঁজিবাদ বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুতির কাজে পরোক্ষভাবে সহায়তাও করেছিল। রামমোহন অবশ্য পণ্য অর্থনীতি বিকাশের এই পরোক্ষ পদ্ধতিতেই একমাত্র আস্থাশীল ছিলেন না। তাই তিনি এর জন্য প্রত্যক্ষ কর্মসূচীও গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহনের

**অবাধ বাণিজ্য-দর্শনের অনুগামী রামমোহন**

এই প্রত্যক্ষ কর্মসূচীরই অন্তর্ভুক্ত হল ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী ব্যবসা প্রচলনের জন্য তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টা অবশ্য তিনি এককভাবে চালান নি, আর তা সম্ভবও নয়। তদানীন্তন বৃটিশ শিল্প বুর্জোয়ারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একাধিপত্য খর্ব এবং ব্যাপক ব্যবসা ও শিল্পবিকাশের জন্য যে জোরদার আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন, রামমোহন সেই আন্দোলনের সঙ্গেই নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। এই ‘অবাধ বাণিজ্য’র প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র নিজেদের জন্য অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত করা ছিল না, তাঁদের দর্শনই ছিল পৃথিবীর সর্বত্র অবাধ ব্যবসার বিস্তার ঘটানো। প্রধানতঃ এই ‘অবাধ বাণিজ্য’র অনুগামীদের উদ্যোগেই ১৮২৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী কলকাতায় গঠিত হয় *“Commercial and Patriotic Association”*।

সংগঠনটির নাম থেকেই স্পষ্ট যে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদী ব্যবসার প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করাই হল এর একমাত্র উদ্দেশ্য। কোন কোন বৃটিশ রাজপুরুষও যে ভারতবর্ষে এই ব্যবসার উন্নয়নের বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতেন, তারই দৃষ্টান্ত হলেন বেন্টিঙ্ক। বেন্টিঙ্ক ভারতবর্ষে আসেন এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার ছ'মাস পরে। কিন্তু জাতীয় শিল্পের যে কোন শাখার উন্নতির জন্য সমস্ত প্রকার প্রস্তাবের আহ্বান জানিয়ে বেন্টিঙ্ক যে বিশেষ প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন, সেটি এই বিষয়ে তাঁর সহানুভূতিরই পরিচায়ক (*"the communication of all suggestions tending to promote any branch of national industry"* )।[১৩২] এই সংগঠনের সঙ্গে রামমোহনের কি সম্পর্ক ছিল ? যদিও এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয় প্রধানতঃ কলকাতার প্রগতিশীল ইউরোপীয়দের উদ্যোগে, কিন্তু রামমোহনও এটি গঠনের বিষয়ে একটি প্রত্যক্ষ ভূমিকা অবলম্বন করেন। এই কারণে রামমোহন শুধুমাত্র এর পরিচালন কমিটির সদস্যই নির্বাচিত হন নি, তিনি এই সংগঠনের যুগ্ম কোষাধ্যক্ষের পদও গ্রহণ করেছিলেন। যে 'স্টক এক্সচেঞ্জ' হল পুঁজিবাদী ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্র, রামমোহন তাঁর 'কমার্শিয়াল এ্যাণ্ড পেট্রিয়টিক এ্যাসোসিয়েশন'-এর মাধ্যমে সেই স্টক কেনাবেচার ব্যবসায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।[১৩৩] সেই উনিশ শতকের শুরুতে স্টক এক্সচেঞ্জের ওপর রামমোহনের প্রভাব এক অসীম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রামমোহন নিজে কিভাবে তাঁর সতীর্থদের পুঁজিবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতেন, তারই প্রমাণ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। অনেকেই দ্বারকানাথকে ভ্রান্তভাবে বৃটিশ সৃষ্ট জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে দেখে থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃ দ্বারকানাথ ছিলেন সে যুগে ভারতবর্ষে 'অবাধ বাণিজ্য'রই প্রতিনিধি, অন্ততঃ তদানীন্তন বৃটেনবাসী দ্বারকানাথকে এই দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন। ১৮৪২ সালে দ্বারকানাথের ইংল্যাণ্ড ভ্রমণকালে যে বিভিন্ন সংগঠন তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়, তার মধ্যে অন্যতম হল 'কমিটি অব এডিনবরা এমিগ্রেসন এ্যাণ্ড এ্যাবরিজিন্‌স্ সোসাইটি'। ১৮৪২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর এই কমিটির পক্ষ থেকে দ্বারকানাথকে যে মানপত্র দেওয়া হয়, তার ভূমিকায় বলা হল ঃ

"শ্রদ্ধেয় নাগরিকবন্ধু মহাশয়,

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নিগ্রোদের দাসত্বমুক্ত করবার জন্যে প্রথমে যে

সমিতি গঠিত হয়েছিল—সে সমিতির কার্যনির্বাহক পরিষদকে আপনি আপনার সামনে দেখতে পাচ্ছেন। এ সমিতি এখনও সমস্ত পৃথিবীব্যাপী দাসত্ব-প্রথা এবং দাস-ব্যবসা দূরীভূত করবার প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত আছে।"

এরপর দ্বারকানাথের উদ্দেশ্যে এই মানপত্রে বলা হল—"আপনার মধ্যে আমরা দেখেছি **শান্তিপূর্ণ এবং অবাধ বাণিজ্যের একজন বাস্তব দৃষ্টি-সম্পন্ন বদান্য পৃষ্ঠপোষককে।** বাণিজ্য পরিচালনার যে ধারায় জাতির সঙ্গে জাতির, মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধন নিবিড় হয়, যে ধারায় সৃষ্টিকর্তার বিবিধ আশীর্বাদ এবং প্রতিভাধর মানুষের প্রয়োজনীয় আবিষ্কারগুলিকে সমস্ত মানবজাতির কাছেই সুফলপ্রদ করে তোলা যায়, আমরা জানি আপনি তারই সমর্থক।"[১৩৪] (বড় হরফ আমাদের) সুতরাং ১৮৪২ সালে, অর্থাৎ অবাধ প্রতিযোগিতার চরম উৎকর্ষের সময়, একটি সংগঠন, যেটি হল দাসত্ব-প্রথামুক্ত করার জন্য পৃথিবীর অন্যতম পুরাতন সংগঠন, তার কার্যনির্বাহক সমিতি দ্বারকানাথকে একজন 'অবাধ বাণিজ্য'র প্রতিনিধি হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। আর এই কারণেই তাঁরা দ্বারকানাথকে এই সমিতির একজন অবৈতনিক সদস্যপদে মনোনীত করতেও ইতস্ততঃ করেন নি। দ্বারকানাথের এই পুঁজিবাদী ব্যবসার প্রতি আগ্রহের পিছনে যে রামমোহনের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল তা দ্বারকনাথ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করেন নি।

প্রকৃতপক্ষে রামমোহন নিজেও ছিলেন এই অবাধ প্রতিযোগিতা-দর্শনেরই একজন প্রচারক। তাই তিনি যেমন ১৮৩২ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লবণ বাণিজ্যের একচেটিয়া কর্তৃত্বের সরাসরি বিরোধিতা করেছিলেন, তেমনি ১৮৩৩ সালের সনদের আগে বৃটিশ শিল্প-বুর্জোয়াদের কোম্পানির একাধিপত্য-বিরোধী আন্দোলনেও যুক্ত হয়েছিলেন। এই রিফর্ম বিলের জন্য আন্দোলন রামমোহনের কাছে শুধুমাত্র কোম্পানির অধিকার খর্ব করার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, তাঁর কাছে এটি ছিল এক মহান আদর্শ রূপায়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত এক আন্দোলন। কারণ সে যুগে এই অবাধ প্রতিযোগিতার দর্শন ছিল মানবেতিহাসের সর্বাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী। আর এই দর্শনের অনুগামীদের মত রামমোহন আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন যে এটিই হল মানবমুক্তির একমাত্র পথ। একারণেই রামমোহনকে এ আন্দোলন সম্পর্কে বলতে শোনা যায়,

'"সংগ্রামটা আর শুধুমাত্র সংস্কারবাদী ও সংস্কার-বিরোধীদের সংগ্রাম নয়, বরং এ হল **বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতা ও অত্যাচারের মধ্যে এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সংগ্রাম।**"[১৩৫]

এই রিফর্ম বিলটি রামমোহনের কাছে কি পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা র‍্যাথবোনকে লিখিত তাঁর একটি পত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যাতে তিনি লিখলেন, "অভিজাতদের তীব্র বিরোধিতা ও রাজনৈতিক দীনতা সত্ত্বেও রিফর্ম বিলের পূর্ণ সাফল্যে আমি বর্তমানে আপনাকে ও লিভারপুলের অপরাপর বন্ধুদের অভিনন্দন জানাতে পেরে সুখী হলাম। জাতি আর কোন কালেই সেই সব মুষ্টিমেয় কয়েকজনের শিকারে পরিণত হবে না, যারা বিগত পঞ্চাশ বছরের অধিককাল ধরে কেবল জনাসাধাবণের ব্যয়েই নয়, সাধারণ মানুষের ধ্বংসের পরিবর্তে তাদের নিজেদের টাকার থলি ভর্তি করতে অভ্যস্ত......।

"যেহেতু আমি জনসমক্ষে শপথ গ্রহণ কবেছিলাম যে **রিফর্ম বিল পরাজিত হলে এদেশের সঙ্গে সম্পর্ক পরিত্যাগ করব**, সেহেতু যতক্ষণ না ফলাফল জেনেছি ততক্ষণ আপনাকে ও লিভারপুলের অন্যান্য বন্ধুদের পত্র লেখা থেকে বিরত থেকেছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এখন আমি আপনার একজন প্রজা-বন্ধু হিসাবে গর্ব অনুভব করতে পারি এবং শুধু একটা জাতি নয়, সমগ্র পৃথিবীর মুক্তি দেখে আমার যে অসীম সুখানুভূতি হয়েছে, তার জন্য আমি আনন্দ প্রকাশ কবছি।[১৩৬] ( বড হরফ আমাদের )

কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনেব স্বার্থে যে রামমোহন বৃটেনের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন নি, তারই সাক্ষী এই পত্রটি। তা যদি হত, তা'হলে কি রামমোহনের পক্ষে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা সম্ভব হত যে রিফর্ম বিলের পরাজয় ঘটলে তিনি এই দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবেন? একমাত্র অভিজাতবর্গের আপোষহীন শত্রু ভিন্ন কে এই ধরনের শপথ প্রকাশ্যে গ্রহণ করতে পারেন? রামমোহন 'অবাধ বাণিজ্য'র দর্শনের একজন প্রকৃত অনুগামী ছিলেন বলেই স্বদেশে ও বিদেশে ধনতান্ত্রিক বিকাশের সমস্ত প্রতিবন্ধক শক্তিকে নিজের শত্রু বলে মনে করেছিলেন। কেউ কেউ হয়ত এই রিফর্ম আন্দোলনের প্রতি রামমোহনের সমর্থনের মধ্যে 'বিশ্বজনীনতা' দেখতে পেলেও প্রশ্ন করতে পারেন—কিন্তু এই আন্দোলনের সঙ্গে ভারতীয় সামাজিক

অবস্থার পরিবর্তনের সম্পর্ক কি ? এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে ভারত-বর্ষের প্রকৃত শাসক ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, আর তার আসল মালিক হল অভিজাতবর্গ ও কুসীদজীবীরা, যাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার পরিবর্তে নিজেদের সম্পত্তি বৃদ্ধি। বলা বাহুল্য, তৎকালীন বৃটেনের রাষ্ট্র-ক্ষমতারও অধিকারী ছিল এই অভিজাত শ্রেণীটি। এই শ্রেণীটি যেমন বৃটেনের শিল্প বিকাশের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি ভারতবর্ষে পুঁজি বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রেও বৃটিশ পুঁজিপতিদের সামনে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত, যার ফলে বৃটিশ ভারতে পণ্যব্যবসার প্রচলন হলেও পুঁজির পরিমাণ ছিল সীমিত। ভারতবর্ষে ধনতান্ত্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে কোম্পানি-সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করেই ১৮৫৩ সালে মার্কস লিখলেন, "( বৃটিশ শিল্প বুর্জোয়ারা ) তারা দেখল ভারতে পুঁজি ঢালার চেষ্টা করলেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিবন্ধকতা ও ঘোরপ্যাচের সম্মুখীন হতে হয়। এইভাবে একদিকে শিল্প স্বার্থ এবং অন্যদিকে টাকাওয়ালা চক্রতন্ত্রের দ্বন্দ্বে ভারত পরিণত হল রণক্ষেত্রে। কারখানা মালিকেরা ইংলণ্ডে তাদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের সচেতনতায় এবার দাবি করছে ভারতে এই প্রতিবন্ধক শক্তিগুলির ধ্বংস, ভাবত শাসনের গোটা সাবেকি ব্যবস্থাটার বিনাশ ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চূড়ান্ত বিলোপ।"১৩৭ সুতরাং যে দ্বন্দ্বের রণক্ষেত্র হল ভারতবর্ষ, সেই দ্বন্দ্বের মীমাংসার সঙ্গে যে ভারতের ভাগ্যও জড়িয়ে পড়ে তা বলা বাহুল্য। বাস্তবিকপক্ষে ১৮৩২ সালের রিফর্ম আন্দোলনের উদ্দেশ্য যে শুধুমাত্র কোম্পানির একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব ছিল তা নয়, এটি ছিল ওই অভি-জাত শ্রেণীর হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য বৃটিশ শিল্প-বুর্জোয়াদের সংগ্রাম। আর বৃটিশ বুর্জোয়াদের সাফল্যের উপবই নির্ভর কবছিল ভারতের শিল্প বিকাশের ভবিষ্যৎ। প্রসঙ্গতঃ, ১৮৩৩ সালের আইনে কোম্পানির একাধিপত্য অনেকাংশে খর্বিত হলেও ভারত শাসনের অধিকার কোম্পানির হাতেই থেকে যায়, যে ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন সম্ভব হয় ১৮৫৮ সালে, অর্থাৎ বৃটিশ শিল্পবুর্জোয়াদের সম্পূর্ণ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরই। এই ভাবেই যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তার ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য থেকে ভারতবর্ষে পণ্য-অর্থনীতি প্রচলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, সেই কোম্পানিই ইতিহাসের নিয়মানু-সারে রামমোহন-সময়েই ভারতীয় পুঁজিবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতেই পরিণত হয়। তাই এই রিফর্ম আন্দোলনের প্রতি

রামমোহনের অকুণ্ঠ সমর্থন কোন বিমূর্ত কাজ ছিল না, এটি ছিল একাধারে রামমোহনের আন্তর্জাতিকতা ও স্বদেশ প্রেমেরই পরিচায়ক। আর ঠিক এই কারণেই রামমোহনের মনে হয়েছে যে এই রিফর্ম আন্দোলনের অসাফল্যের অর্থ হল প্রতিক্রিয়াশীল বৃটিশ অভিজাতশ্রেণীর একাধিপত্য মেনে নেওয়া, যার থেকে বরং বৃটেনের সংশ্রব ত্যাগ অনেক শ্রেয়।

এই বৃটিশ অভিজাতশ্রেণীর হাত থেকে ভারতবর্ষকে উদ্ধারের জন্যই রামমোহনকে আমন্ত্রণ জানাতে হয়েছিল ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের। যদিও তিনি 'কমার্শিয়াল এ্যাণ্ড পেট্রিয়টিক এ্যাসোসিয়েশন' এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভারতীয়দের পুঁজিবাদী ব্যবসা সম্পর্কে উৎসাহদানের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর এ বাস্তব জ্ঞান ছিল যে এই পদ্ধতি দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। কারণ সে সময় পুঁজিবাদের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক রূপান্তরের কাজটি যেমন ভারতবর্ষে তখনও পর্যন্ত বিশেষ পরিণতি লাভ করেনি, তেমনি এই বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজিও ভারতবর্ষে গড়ে ওঠেনি। এছাড়া এই পুঁজিবাদী বিকাশের পথে ভারতীয় প্রতিবন্ধকগুলি রামমোহনের সময়ে ত' অত্যন্ত দৃঢ়তার ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমরা আগেই লক্ষ করেছি যে কার্ল মার্কস ভারতীয় সমাজের যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে সমাজ বিকাশের প্রতিবন্ধক বলে বর্ণনা করেছেন, রামমোহন তার অন্ততঃ দু'দশক আগেই সেই প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই বৃটিশ অভিজাতশ্রেণীর হাত থেকে ভারত উদ্ধার, ভারতীয ধনতন্ত্রের অপেক্ষাকৃত দ্রুত বিকাশ, এবং সর্বোপরি এই সামাজিক প্রতিবন্ধক শক্তিগুলির ধ্বংসের জন্য ইউরোপীয়দের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন কোন উপায় ছিল না। আর এই কারণেই তিনি ইউরোপীয়দের ভারতে বসবাসের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। রামমোহনের চিন্তাধারা অনুযায়ী এর ফলে ভারতবর্ষের কি কি সুবিধা হবে? রামমোহন ***"Settlement in India by Europeans"*** সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, তাতে তিনি প্রধানতঃ ন'টি সুবিধার উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর প্রধান প্রধান যুক্তি হল—প্রথমতঃ, ইউরোপীয়রা ভারতবর্ষে আধুনিক বাণিজ্য ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তি বিদ্যার প্রচলন করবে। দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপীয়রা তাদের বাস্তবজ্ঞান থেকে ভারতবাসীর জন্য দেশের আইন ব্যবস্থায় আধুনিক পরিবর্তন প্রবিষ্ট করাতে সক্ষম হবে। তৃতীয়তঃ, এই শ্রেণীর উন্নত

ব্যক্তিদের উপস্থিতি সাধারণ মানুষকে জমিদার এবং কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অপব্যবহারের হাত থেকে রক্ষা করবে। চতুর্থতঃ, ইউরোপীয়দের উপস্থিতি ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার ব্যাপক বিস্তার ঘটাবে। এবং পঞ্চমতঃ, উক্ত ইউ-রোপীয়রা ভারতীয়দের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার পর ভারতীয়দের যে জাতীয় চেতনার সৃষ্টি হবে, তার ফলে পূর্ব অথবা পশ্চিম যে কোন দিক থেকে ভারত-বর্ষের উপর আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ এক কথায় রাম-মোহনের মতে ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের মাধ্যমে ধনতন্ত্রের এক সর্বাত্মক বিকাশ ঘটবে এবং ভারতবর্ষ আর অন্য কোন দেশের আক্রমণের শিকারে পরিণত হবে না। এখানে লক্ষ্যণীয় যে রামমোহন কিন্তু এ বিষয়ে শুধুমাত্র ইংরেজদেরই আমন্ত্রণ জানাননি, তিনি সমগ্র পঃ ইউরোপের অধিবাসীদেরই আহ্বান জানিয়েছিলেন। অনেকেই বলতে পারেন যে এটি ত ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখার আর একটি চতুর কৌশল। কারণ ইউরোপীয়দের ব্যাপক সংখ্যায় ভারতে আগমন কার্যতঃ ভারতবাসীদের ভারত থেকে বহিষ্কার করবে। কিন্তু রামমোহন কি সব শ্রেণীর ইউরোপীয়দের ভারতবর্ষে বসবাসের জন্য সুপারিশ করেছিলেন? বৃটিশ সিলেক্ট কমিটি রামমোহনকে ঠিক এই ধরনের একটি প্রশ্ন করেছিল।

"সর্বপ্রকার ইউরোপীয়দের বসবাসের জন্য অনুমতি দান কি সুবিধাজনক হবে, না তার বিপরীত হবে?"

রামমোহন এই প্রশ্নের যে উত্তর দিলেন তা হল—"এরকম ব্যবস্থা একমাত্র দেশীয় অধিবাসীদের সম্পূর্ণ স্থানচ্যুত এবং এদেশ থেকে তাদের বহিষ্কৃত করার উদ্দেশ্যেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। কারণ এটি সুস্পষ্ট যে উচ্চ ও শিক্ষিতশ্রেণীর ইউরোপীয়দের মধ্যে কোন সাদৃশ্যই নেই। চরিত্র, মতামত ও অনুভূতির, ক্ষেত্রে বিশেষতঃ, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে, ইউরোপীয় ও ভারতীয় জাতির মধ্যেকার প্রভেদ এতই বিরাট যে, একটি দেশ যা ইউরোপীয়দের দ্বারা বিজিত হয়েছে সেখানে এই জাতি দুটি একত্রে একটি সম্প্রদায়রূপে শান্তিতে বসবাস করতে পারে না, যতক্ষণ না ক্রমাগত আদান-প্রদানের মাধ্যমে তারা একীভূত হয়। সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী ছোট-বড় সব গ্রামে একটা শক্তিশালী ও সক্রিয় পুলিশী ব্যবস্থায় এই আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াটিকে অবিরাম ও বর্ধিত করতে হবে, যে ব্যবস্থা এতই ব্যয়বহুল যে

ভারতের বর্তমান রাজস্ব তা বহন করতে পারবে না। দুই সম্প্রদায়ের বহু সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রাত্যহিক যোগাযোগ মারফৎ কলকাতায় এ-ধরনের একাত্মতা কিছু পরিমাণে ঘটেছে। তবুও এমনকি এই রাজধানীটি যদিও হল সরকারী পীঠস্থান এবং সেখানে প্রায় প্রতি একশ গজ অন্তর পুলিশ কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু সাধারণ ইউরোপীয়রা প্রায়শঃই দেশীয় অধিবাসীদের বিরক্তি উৎপাদন করে।"১৩৮

অতএব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষে ব্যাপক ইউরোপীয়দের বসবাসের মত কোন অবাস্তব পরিকল্পনার কথা রামমোহনের মাথায় ছিল না। বরং এই প্রস্তাবের অর্থ যে ভারতবাসীদের ভারতবর্ষ থেকে বহিষ্কার করা, সে উল্লেখও উক্ত মন্তব্যে রয়েছে। তা'হলে কোন্ শ্রেণীর ইউরোপীয়দের ভারতে বসবাস রামমোহনের কাছে অভিপ্রেত ছিল? এ বিষয়ে তাঁর সেই সব ইউরোপীয়দের ভারতে বসবাস যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল, যাঁরা ছিলেন তদানীন্তন ধনতান্ত্রিক ইউরোপীয় সমাজের সব থেকে আলোকপ্রাপ্ত অংশ এবং যাঁদের 'অবাধ বাণিজ্য'র চিন্তাধারা অনুযায়ী ভারতবর্ষে পুঁজি বিনিয়োগ করার মত যথেষ্ট পুঁজিও আছে। রামমোহনের ধারণা হল, এই সব প্রগতিশীল ব্যক্তিরা যাঁরা তৎকালীন 'অবাধ বাণিজ্য'র দর্শনের প্রভাবে সত্যসত্যই মানবপ্রেমিক এবং ভারতবর্ষে পুঁজি বিনিয়োগ করতে আগ্রহী, তাঁদের উদারনৈতিক দর্শন এবং উৎকৃষ্ট সংস্কৃতির ফলে তাঁরা ভারতবাসীর আহত জাতীয় চেতনাকে আঘাত করার পরিবর্তে যেমন ভারতবাসীকে অজ্ঞতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবেন এবং তাঁদের পুঁজি বিনিয়োগ করে গড়ে তুলবেন ভারতীয় পুঁজি, তেমনি দীর্ঘদিন ভারতে বসবাসের মাধ্যমে তাঁরা নিজেরাও পরিণত হবেন আক্ষরিক অর্থে ভারতবাসীতে। এই কারণে ইউরোপীয়দের ভারতে বসবাসের ফলে ভারতবাসীর যে অসুবিধার সৃষ্টি হবে, সেই অসুবিধাগুলি দূরীকরণের সম্ভাব্য পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করে রামমোহন বললেন, "এরূপ ফলাফলের প্রতিকারের উপায় বা প্রতিষেধক হিসাবে আমার প্রস্তাব হল—প্রথমতঃ, যেহেতু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে নিম্ন শ্রেণীর ইউরোপীয়দের তুলনায় অধিকতর উচ্চ ও শিক্ষিত শ্রেণীর ব্যক্তিরা দেশীয় অধিবাসীদের কম বিরক্তি উৎপাদন করে ও অবমাননা করে, সেহেতু অন্ততঃপক্ষে প্রথম কুড়ি বছরে ইউরোপীয় বসবাসকারীদের **চরিত্রবান ও**

**সম্পদশালী ব্যক্তিদের** (persons of character and capital) মধ্য থেকে গ্রহণ করাই সমীচীন। কারণ এই সমস্ত ব্যক্তিরা অসংস্কৃত মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের ধর্মীয় ও জাতীয় সংস্কারের ওপর হস্তক্ষেপের অভিযোগে যদি বা আদৌ কখনও দোষী সাব্যস্ত হন, তা'হলে তা কদাচিৎই ঘটে থাকে।"[১৩৯] ( বড় হরফ আমাদের )

ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের বসবাস করার অধিকারকে একমাত্র এই উচ্চ আলোকপ্রাপ্ত, পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কথা রামমোহন বার বার বলেছেন। যদিও রামমোহন এই বিষয়টিকে অন্ততঃ পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করার কথা সুপারিশ করেছেন, কিন্তু এই বিষয়ে তাঁর চূড়ান্ত মতামত হল, "সুতরাং চূড়ান্ত বিবেচনায় আমি মনে করছি, নিশ্চিতভাবে এ সুপারিশ করতে পারি যে চরিত্রবান ও সম্পদশালী ব্যক্তিদের ভারতবর্ষে বসবাসের জন্য অনুমতি দান ও অনুপ্রেরণা দেওয়া উচিৎ।"[১৪০]

রামমোহন যে সর্বস্তরের ইউরোপীয়দের ভারতবর্ষে বসবাসের জন্য সুপারিশ করেন নি, সেকথা মেনে নিয়েও কেউ কেউ বলতে পারেন যে রামমোহনের এই ইউরোপীয় পুঁজির প্রতি অনুরাগ কি 'স্বাধীন' ও 'গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ' ভারতবর্ষের শিল্প বিকাশের অজুহাতে বিদেশী পুঁজি আমন্ত্রনেরই নামান্তর নয়? এখানে আমাদের দুটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। প্রথমতঃ, ফিনান্স ক্যাপিটাল-এর যুগের পুঁজির সঙ্গে পুঁজিবাদ বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের পুঁজির কোন তুলনা চলতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, রামমোহন-সময়ে ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থা হল একদিকে ভারতীয় স্বাধীন পুঁজি বিকশিত হয় নি, আর অন্যদিকে বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয় বৈষয়িক ভিত্তি ভারতে তখনও গড়ে ওঠে নি। তাই সে সময়ে যখন বৃটেনের শাসনাধীন অবস্থায় ভারতবর্ষকে থাকতেই হচ্ছে, তখন এই ইউরোপীয় পুঁজিকে আহ্বান না জানানোর অর্থ হল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুসীদজীবীদের আধিপত্যকেই মেনে নেওয়া, এবং যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গীতে রামমোহনের পরিকল্পনা শুধু বাস্তব ছিল না, এটি ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়ও ছিল।

**ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা প্রসঙ্গে স্বদেশপ্রেমিক রামমোহন**

কিন্তু যে কোন পশ্চাৎপদ ও পরাধীন দেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের বিকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্ত হলেও, প্রশ্ন হল : রামমোহনের এই পরিকল্পনা-কালে ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার বিষয়টি কি আদৌ বিবেচিত হয়েছিল ? অর্থাৎ রামমোহন কি কোনক্রমেই নিজ দেশের স্বাধীনতার বিষয় দ্বারা বিচলিত হয়েছিলেন ? এ প্রশ্নের উত্তর যদি ইতিবাচক দেওয়া যায়, তা'হলে অনেকেই হয়ত খড়্গহস্ত হবেন। কারণ কি করে আমরা এত সহজে ভুলে যাই রামমোহনের সেই 'কুখ্যাত' উক্তি—"India requires many more years of English domination" ?

উপরোক্ত উক্তিটি রামমোহন দ্বারা উচ্চারিত হলেও, এটিও সত্য যে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদ বিকাশ সম্পর্কে রামমোহনের প্রতিটি পরিকল্পনা ছিল এই ভবিষ্যৎ স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে। প্রশ্ন উঠতে পারে—এ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে প্রমাণ কোথায় ? রামমোহন ভারতবর্ষের সম্ভাব্য স্বাধীনতা সম্পর্কে কোন সরাসরি আলোচনা না করলেও, বিভিন্ন প্রবন্ধে ও পত্রে যে সব ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন, তার থেকে এ ধরনের সিদ্ধান্ত করা যে কোন বুদ্ধিমান ও সচেতন ব্যক্তির পক্ষে কষ্টকল্পিত নয়। রামমোহনের চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি যে সমকালীন পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদী সমাজ থেকেই গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ আমরা প্রতি পদেই পেয়েছি। তাই পরাধীন দেশের স্বাধীনতা অর্জনের দৃষ্টান্তও যে তিনি সমকালীন সমাজেই খুঁজবেন তা না উল্লেখ করলেও চলে। কোন্ আধুনিক দেশ রামমোহন-কালের কাছাকাছি সময় স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল ? সেটি যে ১৭৭৬ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা ভিন্ন অন্য কিছু নয় তা তর্কাতীত। আর খুব স্বাভাবিক কারণেই নিজ দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে রামমোহন এই আমেরিকাকেই গ্রহণ করলেন মডেল হিসাবে। ইউরোপীয়দের বসবাস সম্বন্ধে আলোচনাকালে রামমোহন সুকৌশলে উপস্থিত করেছেন বৃটেন থেকে ভারতের সম্ভাব্য বিচ্ছেদের প্রশ্নটি। "চতুর্থ বিপদরূপে অনেকে আশঙ্কা করেন যে ভারতীয়রা যদি সম্পদ, বুদ্ধিবৃত্তি ও গণচেতনার দিক থেকে উন্নত হয়, তা'হলে এই রকম-ভাবে গঠিত মিশ্রিত সম্প্রদায় অসংখ্য সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় বসবাসকারীদের সম্মতিক্রমে ও দৃষ্টান্তদ্বারা **বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে** ( যেমনটি আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করেছিল ) এবং **অবশেষে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা**

**করবে**।"[১৪১] ( বড় হরফ আমাদের )

এখানে খুব পরিষ্কারভাবেই দেখা যাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতবর্ষও যে বিদ্রোহের সাহায্যে বৃটেন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে, সে বিষয়ে রামমোহন সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। যদি এরকম কোন ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটে তা'হলে সে সম্পর্কে রামমোহনের মনোভাব কি হবে? "তবুও আগে যেমন লক্ষ করা গেছে, যদি এমন কোন ঘটনা ঘটে যা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করবে ( যা বহু আকস্মিক কারণ থেকেই উদ্ভূত হতে পারে, যার অনুমান বা ভবিষ্যদ্বাণী করা বৃথা ), তা'হলেও সে সময় ভাষা, ধর্ম ও রীতি-নীতির সাদৃশ্যের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ এই **স্বাধীন** ও খৃষ্টান দেশ দুটির মধ্যে একটি মিত্রতামূলক ও অতি সুবিধাজনক বাণিজ্যিক আদান-প্রদান রক্ষা করা যেতে পারে।"[১৪২] ( বড় হরফ আমাদের )

এই উক্তি থেকে অনায়াসে এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বৃটেন থেকে ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে রামমোহন শুধু যে সচেতন ছিলেন তাই নয়, তিনি ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের সঙ্গে বৃটেনের সম্পর্কচ্ছেদের বিরোধিতা করাও নিজের কর্তব্য বলে মনে করেননি। বরং তাঁর মনে হয়েছে যে বিভিন্ন কারণে ( যার অনুমান করতে সে সময় তিনি সম্মত নন ) এ ধরনের বিচ্ছেদ ঘটতে পারে এবং তা'হলে একটি **স্বাধীন দেশ** জন্ম নেবে। যদিও রামমোহন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের পরও স্বাধীন ভারতের সঙ্গে বৃটেনের সুসম্পর্কের পক্ষপাতী, কিন্তু এই ভবিষ্যৎ ভারতের বৃটেন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রশ্নটি সম্পর্কে তাঁর ধারণা যে কত স্বচ্ছ ছিল তা বোঝা যায় যখন দেখি ওই একই প্রবন্ধে তিনি আরও একবার এ প্রসঙ্গের অবতারণা করে বলছেন, "যদি অবশ্য এমন কোন ঘটনা ঘটে যার ফলে দেশ দুটির মধ্যে বিচ্ছেদ হয়, তবুও বৃহৎ সংখ্যক সম্ভ্রান্ত বসবাসকারীদের অস্তিত্ব……প্রাচ্যের বিশাল সাম্রাজ্যকে ইউরোপের অন্যান্য খৃষ্টান দেশগুলির সমস্তরে স্থাপন করবে এবং তার প্রভূত ধনসম্পদ, সুবিপুল জনসংখ্যা ও ইউরোপ থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রত্যাশিত সাহায্যের দ্বারা তারা ( বসবাসকারী ও তাদের বংশধররা ) অবিলম্বে অথবা পরবর্তীকালে এশিয়ার চতুষ্পার্শ্বিক-জাতিগুলিকে আলোকপ্রাপ্ত ও সুসংস্কৃত করতে সক্ষম হবে।"[১৪৩]

প্রকৃতপক্ষে ভারত ও ইংল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্পর্কচ্ছেদ রামমোহনের

কেবলমাত্র সম্ভব বলেই মনে হয়নি, তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল ভারতবর্ষে ধনতন্ত্রের সর্বময় বিকাশের মাধ্যমে ভারতবাসীর যে সর্বাত্মক অগ্রগতি ঘটবে, তার ফলে অন্যায় বৃটিশ শোষণ ও অত্যাচারের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভারত-বর্ষে অদূর ভবিষ্যতে বিদ্রোহ ঘটতে বাধ্য, আর যা দমনে বৃটিশ হবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কোম্পানির লবণ-বাণিজ্যের একাধিপত্য বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা, ক্রফোর্ডকে লিখিত একটি পত্রে রামমোহনের ঠিক এই চিন্তাধারাই প্রতিফলিত হয়েছে। ১৮২৮ সালের ১৮ই অগাষ্ট লিখিত এই পত্রে ওয়েন প্রণীত জুরী বিল কিভাবে ভারতীয়দের আইনের চোখে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখেছে তা উল্লেখ করার পর রামমোহন বললেন, "ধরা যাক্ আজ থেকে প্রায় একশ বছর পর ইউরোপীয়দের সঙ্গে ক্রমাগত মেলামেশার ফলে এবং সাধারণ জ্ঞান ও রাজনৈতিক জ্ঞানসহ আধুনিক কলা ও বিজ্ঞান আয়ত্বের মাধ্যমে দেশীয় অধিবাসীরা উন্নত হয়ে উঠল, তখন কি সম্ভব যে, সমাজে তাদের অবনমিত করার জন্য অনুসৃত প্রতিটি অন্যায় ও পীড়নকারী ব্যবস্থাকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার মত সাহসিকতা ও মানসিকতা তাদের থাকবে না? বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়, **ভারতের অবস্থা আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে অনেক পৃথক,** যার যে কোন অংশে ইংরেজ নৌশক্তি ত্বরিত গতিতে সৈন্যদল প্রেরণ করতে পারে, যা তার প্রয়োজনীয় দিকে পথ করে নিয়ে যে-কোন অবাধ্য প্রচেষ্টাকে অবদমিত করতে সফল হতে পারে। যদি ভারতবর্ষ সে-দেশের এক-চতুর্থাংশ জ্ঞান ও কর্মদ্যোতনা অর্জন করতে সক্ষম হয, তা'হলে তার দুরূহ ভৌগোলিক অবস্থান (remote situation), সম্পদ ও বিপুল জনসংখ্যার সাহায্যে সে হয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের এক **ঐচ্ছিক** উপযোগী ও সুবিধাজনক মিত্ররূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে, অথবা হবে এক **দৃঢ়সংকল্প শত্রুরূপে ঝঞ্ঝাটপূর্ণ ও বিরক্তিকর।**"[১৪৪] (বড় হরফ আমাদের)

আর কোন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত নয়, রামমোহনের দৃঢ় প্রত্যয়—আনুমানিক একশ বছরে ভারতবর্ষ এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হবে, যার ফলে এই পরাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ পরিচয় হবে—হয় বৃটেনের এক ঐচ্ছিক মিত্র অথবা তার এক আপোষহীন শত্রু। রামমোহনের এই পত্রে বৃটেনের ভবিষ্যৎ শক্তিশালী ঐচ্ছিক মিত্ররূপে ভারতের উল্লেখ যে স্বাধীন ভারতবর্ষ সম্পর্কেই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ

ইচ্ছাধীন মিত্রতা একমাত্র স্বাধীন দেশের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু সে স্বাধীনতা কোন্ পথে আসা সম্ভব—শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে না হিংসাত্মক পদ্ধতিতে? রামমোহন যেভাবে ভারতের সম্ভাব্য বিদ্রোহের প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, এবং সেক্ষেত্রে আয়ার্ল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থানের তুলনামূলক বিচার করেছেন, তাতে কি মনে হয় না যে ভারতীয়-বিদ্রোহের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয়? শুধু ভারতবর্ষ নয়, যে কোন সমাজের পরিবর্তন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের বলপ্রয়োগেরই ফল, সে সম্পর্কে রামমোহনের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। সমাজ-পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁর এই চিন্তা-ধারারই পরিচয় "বঙ্গদূত" পত্রিকায় লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গতঃ, রামমোহন ছিলেন "বঙ্গদূত" পত্রিকার অন্যতম স্বত্বাধিকারী এবং এই পত্রিকায় প্রকাশিত বক্তব্য ছিল প্রধানতঃ রামমোহনেরই মতামত। এই পত্রিকায় ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে সপ্তদশ শতকের বৃটিশ রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে বলা হল, "ইহার অধিক দৃষ্টান্ত কি দিব ইংলণ্ডের পূর্ববৃত্তান্ত দেখিলেই প্রত্যক্ষ হইবেক। যে হেতুক ইংলণ্ড দেশে নারমন্ রাজার জয় হইলে পরে প্রজাসমস্ত তদধীন হইল এবং তথাকার ভূমধ্যাধিকারীরা যে প্রকার এতদ্দেশীয় জমিদার সকল কিয়ৎকাল পর্যন্ত কালযাপন করিয়াছিলেন তাঁহারাও সেইরূপে কালযাপন করিতেন কিন্তু তাঁহার দিগের ধনবৃদ্ধি অষ্টম হেনরী রাজার সাম্রাজ্য পর্যন্তই সংখ্যা তদনন্তর ওলিবর ক্রমওয়েল নামক এক কসাই এর পুত্র **প্রথম চার্লস নামক রাজাকে শিরশ্ছেদপূর্বক রাজ্যচ্যুত করাতে ইংলণ্ডের প্রজার প্রভুত্ব** দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং ধন্যবাদ করিলেন।"[১৪৫] (বড় হরফ আমাদের) তাই, সমাজ-পরিবর্তন সম্পর্কে যাঁর ধারণা ওলিবর ক্রমওয়েল কর্তৃক 'রাজাকে শিরশ্ছেদ পূর্বক রাজ্যচ্যুত করাতে ইংলণ্ডের প্রজার প্রভুত্ব' স্থাপিত হয়, যিনি সুকৌশলে বিদ্রোহের ক্ষেত্রে আয়ার্ল্যাণ্ডের তুলনায় ভারতের সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থানের উল্লেখ করেন, তাঁর কাছে যে ভারতীয় স্বাধীনতা কোনমতেই বৃটিশের উপঢৌকন হতে পারে না, সেটি যে ইংল্যাণ্ডের প্রজাদের মত কোন এক ধরনের বলপ্রয়োগ মারফৎই ভারতবাসীদের অর্জন করতে হবে, তা কল্পনা করা অমূলক নয়।

প্রকৃতপক্ষে রামমোহনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা একটিমাত্র চিত্রই পরিস্ফুট করে এবং সেটি হল ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর প্রতিটি পরিকল্পনা ও

বাস্তব কাজের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা। আর তাঁর জন্মের মাত্র চার বছর পর (যদি ১৭৭২-কে জন্ম সাল ধরা হয়) যে দেশটি পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতাই হয়েছিল এ বিষয়ে রামমোহনের দৃষ্টান্ত। সমাজ-পরিবর্তন সম্পর্কে ঐতিহাসিক জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর এ বোধোদয় হয়েছিল যে, সে যুগে ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের একটিই মাত্র সর্ত এবং তা হল ভারতবর্ষে ধনতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য বিকাশ, যা একদিকে সম্পদবৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধনে সমর্থ হবে এবং অপরদিকে এই ধনতান্ত্রিক বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, বুর্জোয়া শিক্ষাদর্শ, পূর্বতন সমাজের কূপমণ্ডূকতা, অন্ধতা, বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য ধ্বংস করে জন্ম দেবে এক সংস্কারমুক্ত, সক্রিয়, ঐক্যবদ্ধ সমাজ। এই প্রক্রিয়ারই অবশ্যম্ভাবী ফল হবে সর্বস্তরের, সর্বাঞ্চলের ভারতবাসীর রাজনীতিগত ঐক্য, যা আবার অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও অবশ্য প্রয়োজনীয় সর্ত। রাম-মোহন সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ব্যতিরেকেই যদি কোন আকস্মিক কারণে ভারতবর্ষ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হয়ও, তা'হলে সেই স্বাধীনতা ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য এবং তার ফলে অন্য কোন কোন অনুন্নত দেশ দ্বারা পুনর্বার বিজিত হয়ে ভারতবর্ষের অবস্থা হবে অতি সংকটজনক। এ বিষয়ে প্রথম নেপোলিয়ন অধিকৃত স্পেন কিভাবে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পব প্রতিক্রিয়ার কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিল, তা রামমোহন চোখের সামনেই দেখেছিলেন। তাই এই সমস্ত দিক বিচার করে ভারতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে রামমোহনকে কয়েকটি মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছিল। প্রথমতঃ, তদানীন্তন ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থা হল রাজনৈতিক ঐক্য ও স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষার কোন সর্তই গড়ে ওঠে নি। অর্থাৎ বাস্তব সত্য হল বৃটেনের কবল থেকে ভারতবর্ষ কোনভাবে মুক্ত হলেও তাকে অন্য কোন এক বা একাধিক শক্তির কুক্ষিগত হয়ে থাকতেই হবে। দ্বিতীয়তঃ, সেক্ষেত্রে অন্যান্য সমস্ত আক্রমণকারী দেশের তুলনায় প্রতিরক্ষা ও সমাজ-পরিবর্তনের প্রশ্নে ভারতে বৃটিশ শাসন অনেকবেশী গ্রহণযোগ্য। তৃতীয়তঃ, যে কোন দেশের স্বাধীনতার অন্যতম আবশ্যিক পূর্বসর্ত হল ধনতন্ত্রের অপেক্ষাকৃত ব্যাপক বিকাশ, আর ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সে বিষয়ে বৃটিশ শাসন

হবে এক বিশেষ কার্যকর অস্ত্র। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে রামমোহনের সমগ্র কর্মকাণ্ড এই কয়টি মূলসূত্রের উপর স্থাপিত। এই কারণেই ভারতের তাৎক্ষণিক স্বাধীনতার মত কোন অলীক কল্পনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে রামমোহন যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন, তা ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীতা অর্জনের জন্য একটি বাস্তব কর্মসূচী ভিন্ন কিছু নয়। তাই রামমোহন অনুসৃত কর্মসূচীর অন্তর্গত প্রধান বিষয় হল ভারতে বৃটিশ শাসনকে সর্তাধীন সমর্থন, বৃটিশ অভিজাতশ্রেণী পরিচালিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ভারত উদ্ধার, 'অবাধ বাণিজ্য'র ইউরোপীয় প্রতিনিধিদের সহায়তায় ভারতে পুঁজিবাদের ব্যাপক বিকাশ, এবং সর্বশেষে ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির ধ্বংসসাধন। মার্কিন দৃষ্টান্ত থেকে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তার ফলে তাঁর মনে হয়েছিল যে অদূর ভবিষ্যতে এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়রা ভারতীয়দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সমাজের সদস্যরূপে পরিচিত হতে বাধ্য। এ কারণেই তাঁর একটি সুপারিশ ছিল যে ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের ভারতীয় ভাষা গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। ১৮৩০ সালে তিনি এ উদ্দেশ্যে একটি প্রচার পুস্তিকাও প্রকাশ করেন, যার শিরোনাম ছিল ***"English in India shonld adopt Bengali as their Language"***। এই হল রামমোহনের সমগ্র চিন্তাধারার অন্তঃসার। তাই যখন রামমোহন বলেন যে ভারতে আরও দীর্ঘদিনের বৃটিশ প্রভুত্ব প্রয়োজন, তখন সেটি যেমন কোন স্ববিরোধী বক্তব্য নয়, তেমনি এটি ভারতীয় জাতি সম্পর্কে কোন অবমাননাকর উক্তিও নয়। এটি হল চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সাধনের স্বার্থে শত্রুপক্ষকে সাময়িক সুবিধাদানের একটি সার্থক রণকৌশল। আর এ বিষয়ে যদি রামমোহনের কোন সীমাবদ্ধতা থেকেও থাকে, তা হল ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা। আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে কার পক্ষেই বা কল্পনা করা সম্ভব যে সে যুগে যা ছিল সব থেকে অগ্রণী শ্রেণী, সেই বুর্জোয়ারাই পরিণত হবে একটি প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীতে আর সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে যা ছিল যথার্থ মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, সেই অবাধ প্রতিযোগিতার দর্শনই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র পরিগ্রহণ করবে? এই একই কারণে তাঁর পক্ষে কল্পনায় আনাও সম্ভব হয় নি যে ইতিহাসের

নিয়মানুযায়ী বুর্জোয়া শ্রেণী নয়, সর্বহারা শ্রেণীই হবে সমস্ত মানব সমাজের একমাত্র মুক্তিদাতা। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রামমোহনের দূরদৃষ্টির প্রমাণ হল তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর ঠিক একশ বছরের মধ্যেই, ১৯১৮-১৯২০ সালে প্রস্তুত হল ভারতবর্ষের মুক্তির বাস্তব ভিত্তি, এবং ভারতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাটি বিমূর্ত কল্পনা থেকে শ্রমজীবী জনগণের বাস্তব আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হল। তাই সঠিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে রামমোহনের ভারতে বৃটিশ শাসনকে সমর্থন যেমন কোন প্রতিক্রিয়াশীল কাজ নয়, তেমনি রামমোহন বৃটিশ শাসক-দের অনুচরও ছিলেন না। যদি 'স্বদেশপ্রেম' শব্দটির প্রকৃত অর্থ উগ্রজাতীয়তা-বাদ না হয়, যদি শব্দটির প্রকৃত অর্থ নিজ দেশের ব্যাপক জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা বোঝায়, তা'হলে রামমোহন সম্পর্কে চূড়ান্ত মূল্যায়নে এ কথাই বলতে হয় যে আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম স্বদেশপ্রেমিক হলেন রামমোহন।

ভারতীয় ইতিহাসে রামমোহনের অন্যতম গুরুত্ব হল আধুনিক বাংলাভাষা সৃষ্টিতে তাঁর ভূমিকা। পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন জনজীবনে, বিশেষ করে আধুনিক রাষ্ট্রে ভাষার কি অপরীসীম গুরুত্ব। ভাবের আদান-প্রদানের বাহক হিসাবে প্রত্যেক সমাজেই ভাষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু লিখিত ভাষার প্রয়োজন ধনতান্ত্রিক সমাজে যেরকম ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়েছে, তা আগের আর কোন সমাজেই দেখা যায় না। কোন মানবসমাজকেই ভাষা ভিন্ন কল্পনা করা সম্ভব নয়, কারণ, বাক্-ক্ষমতা মানুষের অন্যতম দৈহিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সমাজ বিকাশের প্রয়োজন অনুযায়ী ভাষারও রূপান্তর ঘটে। যেমন বেশীর-ভাগ উপজাতি-ভাষার কোন বর্ণমালা নেই। ফলে সে সমস্ত ভাষা জনগণের মধ্যে ব্যাপক যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে লিখিত ভাষার প্রচলন থাকলেও এবং কখনও কখনও এক একটি বিশেষ ভাষা অত্যন্ত বিকশিত হলেও, একই সমাজের অধিবাসীরা সবসময় একই ভাষায় কথা বলার প্রয়োজনবোধ করত না। ফলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক যোগাযোগের কাজটিও ব্যাহত হত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—নর্মান বিজয়ের (১০৬৬ খৃষ্টাব্দ) আগে ইংল্যাণ্ডে ইংরেজী, ওয়েলস, কর্ণিস প্রভৃতি নানা ভাষা ও উপভাষার প্রচলন ছিল। নর্মানরা ইংল্যাণ্ডে সরকারী ভাষা হিসাবে

**বাংলাভাষার সংস্কারক রামমোহন (১)**

ফরাসী ও লাতিন ভাষার প্রচলন করে। অর্থাৎ কয়েক শতাব্দী আগে পর্যন্ত ইংরেজরা ফরাসী, লাতিন, ইংরেজী কথ্য ভাষা ছাড়াও বহু উপভাষা ব্যবহার করত। তখনও পর্যন্ত ইংরেজী ভাষা তার আধুনিক রূপ পরিগ্রহণ করেনি। ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত ঐ সমস্ত ভাষা ও উপভাষার সম্মিলনের মধ্য দিয়ে বিকাশমান পুঁজিবাদী সমাজে আধুনিক ইংরেজী ভাষার সৃষ্টি। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি আধুনিক ভাষার ইতিহাস পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গেই জড়িত। কারণ উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণী আভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টির জন্য একদিকে যেমন ছড়িয়ে থাকা বিচ্ছিন্ন অধিবাসীদের একত্র করে জাতি বা নেশান সৃষ্টি করে, তেমনি অপরদিকে অনুন্নত ভাষার উন্নতি ঘটিয়ে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য একটিমাত্র ভাষার জন্ম দেয়। ধনতান্ত্রিক বিকাশের সাফল্যের জন্যই প্রাগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলি সৃষ্টি করেছে—এক জাতি-এক ভাষা-এক রাষ্ট্র। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক দেশগুলিই এর প্রমাণ। অবশ্য আধুনিক রাষ্ট্র-গুলির এই বিকাশ একদিনে হয় নি, এক সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ইংল্যাণ্ডে এই পদ্ধতিটি চলে প্রায় ছ'শ বছরব্যাপী। এর তুলনায় অবশ্য আধুনিক জার্মানীর বিকাশ কম দীর্ঘ। জার্মানীর ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ার সক্রিয় কাজ শুরু বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে, যখন নেপোলিয়ন তিনশতাধিক জার্মান রাষ্ট্র সম্বলিত 'হোলি রোমান এম্পায়ার' বিলুপ্ত করেন। মনে রাখা প্রয়োজন, এই কাজগুলির কোনটিই কিন্তু শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে হয় নি। রক্ত আর তরবারি দিয়েই এই ঐক্যগুলি আনা হয়েছিল, যা একদিকে ছিল পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে জড়িত, আবার অন্যদিকে এগুলিই প্রতিষ্ঠা করেছিল পুঁজিবাদের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র। কিন্তু জাতি গঠনের এই প্রক্রিয়ার ব্যতিক্রম হল পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি, যেগুলি একজাতীয় রাষ্ট্র নয়, বহুজাতিক রাষ্ট্র। আর এইটিই হল এই দেশগুলির অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই স্তালিন বলেছেন,

"পূর্ব ইউরোপের ঘটনাবলী একটু ভিন্ন ধরনের। যেখানে পশ্চিম ইউরোপে জাতিগুলি রাষ্ট্রে বিকশিত হল, কিন্তু সেক্ষেত্রে পূর্বে (East) বহু জাতি সত্তা সম্বলিত বহুজাতিক রাষ্ট্র গঠিত হল। অস্ট্রিয়া,—হাঙ্গেরি ও

রুশিয়া এই রকমই দেশ।...

"যে দেশে সামন্ততন্ত্র বিলুপ্ত হয় নি, যেখানে ধনতন্ত্র দুর্বল এবং যেখানে পিছন দিকে ঠেলে দেওয়া জাতিসত্তাগুলি অর্থনৈতিকভাবে সুসংহত হয়ে অখণ্ড জাতিতে সংগঠিত হতে সক্ষম হয় নি, একমাত্র সেই সব ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র গঠনের এই বিশেষ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হতে পারে।"[১৪৬]

এশিয়ায় একমাত্র জাপানই ঐতিহাসিক কারণে একজাতিক রাষ্ট্র গঠন করতে সমর্থ হয়েছিল, যা জাপানের অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু ভাবতবর্ষের অবস্থাটা কি? 'ভারতীয়রা একটি ঐতিহ্যপূর্ণ জাতি' বলে যত প্রচাব করাই হোক না কোন, ভারতীয়দের যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আদৌ একটি জাতি বলা যায় না—মনে হয় এ বিষয়ে সমস্ত মার্কসবাদীই একমত। বর্তমানে ভারতবর্ষ হল একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র। আধুনিক ভারতে বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে যতই সাংস্কৃতিক বৈসাদৃশ্য থাক না কেন, এবং শাসকশ্রেণী যতই এই সুযোগ গ্রহণ করে জাতিগুলির মধ্যে বিভেদ-সৃষ্টির প্রচেষ্টা করুক না কেন, একথা অস্বীকার করা যাবে না যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাবতীয় জাতিগুলি বর্তমানে নিজেদের ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বলেই মনে করে, এবং বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে এই ভূমিকা পালনও করে থাকে। কিন্তু অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীব সন্ধিক্ষণে কি ভারতবর্ষকে একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র বলা যেত? না, তখনও পযন্ত বর্তমান ভারতীয় জাতিগুলির বিকাশের কোন লক্ষণই দেখা যায়নি। সে সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের নিজেদের ভারতীয় ভাবা ত দূরের কথা, বাস্তবিকপক্ষে ভারতবর্ষ ও ভারতরাষ্ট্র সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। এ প্রসঙ্গে রামমোহনের একটি উক্তির কথা না বলে পাবা যায না, যাব মধ্যে বামমোহনেব বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, আর যে উক্তিটির বিকৃতি ঘটিয়ে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী বলে পবিচিত কোন কোন ব্যক্তি রামমোহনের 'প্রতিক্রিয়াশীল' ও 'জনবিবোধী' চবিত্র প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।

১৮৩১ সালে সিলেক্ট কমিটি তৎকালীন ভাবতবর্ষ সম্পর্কে বামমোহনকে যে প্রশ্নাবলী কবেছিল, তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল—"বর্তমান সরকারের ধরন (form) এবং তার দেশীয় ও ইউরোপীয় প্রশাসক সম্বন্ধে দেশীয় অধিবাসীদের উপস্থিত অভিমত কি?"

এই প্রশ্নের রামমোহন যে উত্তর দিয়েছিলেন তা হল—"***The peasantry and villagers in lhe interior are quite ignorant of, and indifferent about either the former or present government, and attribute the protection they may enjoy or oppression the may suffer to the conduct of the public officers immediately presiding over them***"[১৪৭] রামমোহনের এই উক্তির তর্জমা করলে দাঁড়ায়ঃ অভ্যন্তরের (অর্থাৎ শহর ও বন্দর থেকে দূরের) কৃষক ও গ্রামবাসীরা কি পূর্বকালের আর কি বর্তমান কালের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু জানে না (বা অজ্ঞ), এবং সে সম্পর্কে তাদের ভাল-মন্দ কোন মতামতই নেই; বিপদে আশ্রয় পেলে বা নির্যাতিত হলে, যে সরকারী কর্মচারীদের তাদের শীর্ষে (শাসক ও পালক হিসাবে) অবস্থান করতে দেখে, তাদের আচরণকেই তারা দায়ী করে।

একই প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস ১৮৫৩ সালে বলছেন, "রাজ্যের বিলোপ বা ভাঙ্গাভাঙ্গি নিয়ে অধিবাসীরা ভাবে না; গ্রামটি যতক্ষণ অখণ্ড থাকছে ততক্ষণ কোন ক্ষমতার হাতে তা গেল, কোন সার্বভৌমের তা করায়ত্ত হল তা নিয়ে তাদের ভাবনা নেই; গ্রামের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি অপরিবর্তিত থাকে।"[১৪৮]

রামমোহন আর মার্কসের মূল্যায়নের মধ্যে কি কোন মৌলিক পার্থক্য আছে? মার্কস যেখানে বলছেন, "রাজ্যের বিলোপ বা ভাঙ্গাভাঙ্গি নিয়ে অধিবাসীরা ভাবে না", সেখানে রামমোহন বলেছেন, "কৃষক ও গ্রামবাসীরা কি পূর্বকালের আর কি বর্তমান কালের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু জানে না"। সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা জনগণের মধ্যে ত এই ধরনের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীবই সৃষ্টি করে। রামমোহন ও মার্কসের উক্তি দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য ত নেই-ই, বিস্মিত হতে হয়, ১৮৫৩ সালে মার্কসের পক্ষে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল, সেই একই সিদ্ধান্ত কি করে রামমোহন তার একুশ বছর আগে করলেন!

কিন্তু কোন কোন বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী, যাঁরা রামমোহনের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র প্রমাণের জন্য প্রাণপাত করছেন, তাঁরা রামমোহনের এই উক্তিটিকেই তাঁর 'জন-বিরোধী' চরিত্রের সাক্ষ্য হিসাবে দাখিল করে থাকেন। শ্রীসুপ্রকাশ

রায় তাঁর "ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম" শীর্ষক পুস্তকে (প্রথম খণ্ড) *"The peasantry and villagers in the interior are quite ignorant of, and indifferent about the former and present government"*, রামমোহন-উক্তির এই অংশটির তর্জমা করেছেন, "কৃষক ও গ্রামবাসীগণ নিতান্ত অজ্ঞ, সুতরাং তাহারা পূর্বকালের বা বর্তমান কালের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিস্পৃহ…" (পৃ. ২০৫)। আর সুপ্রকাশবাবুর এই তর্জমা ব্যবহার করেই একালের 'সৃজনশীল মার্কসবাদী' শ্রীমান স্বর্ণ মিত্র তাঁর "প্রচলিত ইতিহাস ও অবহেলিত তিতুমীর" পুস্তিকায় "কৃষক ও গ্রামবাসীগণ নিতান্ত অজ্ঞ" বাক্যাংশটি বড় হরফে দিয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। সামান্য ইংরাজী শিক্ষা যাঁর আছে, তিনিই জানেন যে 'ignorant' শব্দটির একটি আভিধানিক অর্থ হল 'unware of' অর্থাৎ (কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে) অজ্ঞানতা। কোন ব্যক্তিকে সাধারণভাবে অজ্ঞ বলার অর্থ এক, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ বলার অর্থ হল তিনি উক্ত বিষয় সম্পর্কে জানেন না। আমরা নিজেরা কি আজও মার্কসবাদের বহু বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ নই? রামমোহন এই অর্থেই ignorant বা অজ্ঞ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু সুপ্রকাশবাবু কি ভাবে রামমোহনের এই উক্তিটিকে বিকৃত করলেন? তিনি প্রথমে লিখলেন, "কৃষক ও গ্রামবাসীগণ নিতান্ত অজ্ঞ", অর্থাৎ 'অজ্ঞ' কথাটি আগে সাধারণভাবে ব্যবহার করে নিলেন, তারপর 'সুতরাং' শব্দটি নির্দ্বিধায় প্রবিষ্ট করিয়ে অনুবাদ করলেন, "সুতরাং তাহারা…নিস্পৃহ।"

**রামমোহনের চোখে কৃষক ও গ্রামবাসীগণ**

রামমোহন কথিত কৃষক ও গ্রামবাসীগণের 'অজ্ঞতা'র বিষয়টি যে তথাকথিত বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী মহলে কি ধরনের অজ্ঞতার সৃষ্টি করেছে, তার আরও একটি নমুনা পাওয়া যায় নিঃশঙ্ক গুপ্ত রচিত "বৃটিশ ভারতে শিক্ষা ষড়যন্ত্র" প্রবন্ধে। লেখক উক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন, "বৃটিশকে উৎখাত করবার ব্রত নিয়ে তিতুমীর যখন কোম্পানীর গোলার মুখে নিজেদের ও সহযোদ্ধাদের রক্তে নারকেলবেড়িয়ার বাঁশের কেল্লাকে ধুইয়ে দিচ্ছিলেন সেই সময় ইংল্যাণ্ডে বসে বর্তমান সরকার ও দেশী-বিদেশী শাসকদের সম্পর্কে ভারতবাসীদের মতামত কি?—ইত্যাদি প্রশ্নের চতুর উত্তর দিচ্ছিলেন রামমোহন। তিনি বলেছিলেন 'একটু ভিতরের দিকের কৃষকেরা ও গ্রামবাসীরা কি অতীত কি

বর্তমান সকল সরকার সম্পর্কেই সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও নিস্পৃহ…’ সুতরাং তাদের কথা বাদ।[৩-৪৯] শ্রীগুপ্ত এখানে রামমোহনের উক্তির যথাযথ তর্জমা করলেও, রামমোহনের ‘চতুর উত্তর’-এর প্রমাণ দিতে যেয়ে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে নিঃশঙ্ক চিত্তে নিজের পূর্বকৃত ধারণা অনুযায়ী মন্তব্য করলেন—‘সুতরাং তাদের কথা বাদ’। আমরা আগেই লক্ষ করেছি যে এবিষয়ে রামমোহনের মত মার্কসও একই মূল্যায়ন করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কি কারণে এই সমস্ত ব্যক্তিরা রামমোহনের এই উক্তিটির কদর্থ করেন তা বোঝা যায় না। বিশেষতঃ সুপ্রকাশবাবুর মত আধুনিক ইংরেজী জ্ঞানসম্পন্ন প্রবীণ বুদ্ধিজীবী রামমোহনের উক্তির যে বিকৃতি করেছেন তা যে ইচ্ছাকৃত নয় এটা বিশ্বাস করা কষ্টসাধ্য।

রামমোহনের এই উক্তিটির ব্যাপকভাবে বিকৃতিকরণের ফলে বহু সৎ বিপ্লবী কর্মীর মনে রামমোহনের জন-বিরোধী চরিত্র সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তাই এ প্রসঙ্গে একবার তৎকালীন ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, কৃষক ও গ্রামবাসী সম্পর্কে রামমোহনের প্রকৃত ধারণাটি জানা আবশ্যক। বৃটিশ পার্লামেণ্ট নিয়োজিত ওই একই সিলেক্ট কমিটি রামমোহনকে প্রশ্ন করেছিল, ‘জনগণের নৈতিক অবস্থা কি রকম?’ রামমোহন এই প্রশ্নের যে উত্তর দেন, তার এক জায়গায় বললেন, “দেশের বিভিন্ন অংশের ও জীবনযাপনের প্রতিটি অবস্থার অধিবাসীদের সতর্কতার সঙ্গে সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে আমি এই মত ব্যক্ত করছি যে কৃষক ও গ্রামবাসীরা যাঁরা বৃহৎ নগর, প্রধান কেন্দ্র ও আইন-কোর্ট থেকে দূরে বসবাস করেন, তাঁরা যে-কোন দেশের জনসাধারণের মতই **সরল মিতাচারী ও ন্যায়পরায়ণ।** এবং যতই দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়েছি, ততই সাধুতা, সরলতা ও চরিত্রের স্বাধীনতার সাক্ষাৎ পেয়েছি। অবশ্য এই শ্রেণীর মানুষের গুণাবলী বর্তমানে প্রধানতঃ আদিম সরলতা ও এমন এক তীব্র ধর্মীয় অনুভূতির উপর স্থাপিত যে তার ফলে তাদের ভাল অথবা মন্দ আচরণের জন্য তারা শুধু পরজগতেই পুরস্কার বা শাস্তির প্রত্যাশা করে না, এমন কি প্রাচীন ইহুদিদের মত তা তারা ইহজগতেও প্রত্যাশা করে থাকে। দ্বিতীয়তঃ শহর, নগর বা স্টেশনের (সরকারী কর্মচারীদের বাসস্থান—লেখক) যে-সব অধিবাসীদের আইন-কোর্টে জমিদার প্রভৃতি দ্বারা নিযুক্ত কর্মচারী ও

বিদেশী এবং ভিন্ন ধরনের সভ্যতার অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে বেশ কিছুটা মেলামেশা আছে, সেইসব অধিবাসীরা সাধারণতঃ শেষোক্তদের স্বভাব ও মতামত অনুকরণ করে। সুতরাং তাদের ধর্মীয় মতামত অনেকটাই ভেঙে গেছে, যদিও অবশ্য অন্য কোন নীতি সেই মতামতের স্থান দখল করার জন্য রোপিত হয় নি। ফলস্বরূপ প্রথমোক্ত শ্রেণীর তুলনায় এই সকল ব্যক্তিদের একটি বৃহৎ অংশ চরিত্রের দিক থেকে অনেক নিকৃষ্ট এবং এমন কি তারা মিথ্যা হলফ ও জালিয়াতির জঘন্য কাজে প্রায় সময়ই যন্ত্রে পরিণত হয়।"[১৫০] ( বড় হরফ আমাদের )

ওই একই সিলেক্ট কমিটির আরও একটি প্রশ্ন ছিল, 'তারা ( ভারতীয়রা ) উন্নতি সাধনের কি ক্ষমতা ধারণ করে?' রামমোহন এর উত্তরে বললেন, ***"They have the same capabitity of improvement as any other civilized people."***[১৫১] যার অর্থ দাঁড়ায়, 'অন্যান্য সভ্য মানুষের উন্নতি সাধনের যে ক্ষমতা থাকে, তাঁদেরও সেই একই ক্ষমতা বর্তমান।'

উপরোক্ত উত্তরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে সাধারণ মানুষ সম্পর্কে রামমোহনের প্রকৃত মত ছিল ঠিক তাব বিপরীত। রামমোহন সাধারণ মানুষকে কোনভাবে অবজ্ঞা করেননি ত বটেই, বরং তিনি সাধারণ গ্রামবাসী ও কৃষককে সরল, মিতাচারী ও সৎ বলে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তার সঙ্গে তিনি উল্লেখ করতে বিস্মৃত হন নি যে ভারতীয় সাধারণ মানুষের এই সরলতা প্রধানতঃ তাদের জন্মান্তরবাদ ও কর্মান্তরবাদে অগাধ বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। ভারতবর্ষে পণ্য অর্থনীতির প্রচলনের ফলে সাধারণ মানুষের যে এই পুরুষানুক্রমিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটতে শুরু করেছে, সে বিষয়টিও রামমোহনের দৃষ্টি এড়ায়নি। বস্তুতঃ জনগণকে অবজ্ঞা করার কোন বিকৃত মানসিকতা রামমোহনের ছিল না। ভারতীয় রাজস্ব প্রথা ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যগুলি এই ঘটনাই প্রমাণ করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, প্রগতিশীলতার নামাবলী গায় দিয়ে সুপ্রকাশ বাবুর মত ব্যক্তিরাও রামমোহনের প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রমাণ করার জন্য যেভাবে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে নীরবতার ষড়যন্ত্র করেছেন এবং রামমোহন-উক্তির বিকৃতকরণ করছেন তা কোন সৎ বিপ্লবীর কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়টিকে আমরা হয়ত একটু বেশী স্থান দিয়ে ফেলেছি। আশা করি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে

পাঠকরা নিশ্চয় এ আলোচনার প্রয়োজন অস্বীকার করবেন না।

যা হোক, আবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্। সুতরাং অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে ভারতীয় জাতি নামে কোন একটি বিশেষ জাতির অস্তিত্ব ছিল না তো বটেই, এমন কি এক একটি ভারতীয় জাতি, যেগুলি তাদের অন্তর্গত বিভিন্নশ্রেণীর মানুষকে আত্মস্থ করে বর্তমান রূপ গ্রহণ করেছে তাও সেদিন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। তাই সে সময়ে অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল—প্রথমতঃ, সর্বভারতীয় ঐক্য সৃষ্টি, এবং দ্বিতীয়তঃ, এই ভারতীয় জাতিগুলির বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করা। আর এই জাতিগুলির যথার্থ বিকাশের জন্য যেমন পণ্য-অর্থনীতি প্রচলনের প্রয়োজন ছিল, তেমনি আবশ্যক ছিল প্রতিটি জাতির ভাষা সংস্কার করে ভাষার উন্নতি সাধন। কারণ যে কোন জাতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ভাষা। রামমোহন এই দ্বিবিধ কর্মকেই তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছিলেন। ভারতবর্ষে পণ্য-অর্থনীতি প্রচলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তিনি এই বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই মনোনিবেশ করেছিলেন—বাঙালী সমাজ, যে সমাজে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই সমাজের কথ্য ভাষার উৎকর্ষ সাধনের কাজে।

**বাংলাভাষার সংস্কারক রামমোহন(২)**

রামমোহন-পূর্বের লিখিত ভাষার অবস্থা কেমন ছিল তা বাঙালীমাত্রই অবগত আছেন। কেরী, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত পুস্তক-গুলি বাংলাভাষায় গদ্যরচনার সূচনা মাত্র। আধুনিক বাংলা ভাষার বিকাশে রামমোহনের অবদান যে কি পরিমাণ উল্লেখযোগ্য তা রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তিতেই পরিস্ফুট হয়—"বঙ্গদেশ অদ্য সেই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহে না। রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জমান দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন।":৫২ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে অভিযোগই থাক, এটুকু মেনে নিতে বোধ হয় অসুবিধা হবে না যে অন্ততঃ বাংলা ভাষার বিষয়ে কিছু বলার অধিকার ভদ্রলোকের ছিল।

আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে রামমোহনের অবদান স্বীকার করেও হয়ত কোন কোন ব্যক্তি প্রশ্ন তুলবেন—তিনি কার জন্য ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন? তা কি অগণিত নিরক্ষর শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে, না

সংখ্যালঘিষ্ঠ বুর্জোয়াদের স্বার্থে ? একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে রামমোহন সম্পূর্ণ বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ীই এই কাজটি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু ভাষা কি কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করতে পারে ? না, ভাষা কখনই কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে না। যে কোন ভাষা শুধুমাত্র একটি সমাজ, যে সমাজে ওই ভাষার ব্যবহার, সেই সমাজের প্রতিটি সদস্যের স্বার্থরক্ষা করে। বিভিন্ন সময়ে ভাষার রূপান্তর ঘটলেও, একই ভাষা বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাতেও প্রচলিত থাকে। এই কারণে উৎপাদন প্রথার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপরিকাঠামোর পরিবর্তন হলেও, ভাষার কিন্তু এই পরিবর্তন হয় না। ভাষার যে পরিবর্তন হয়, তা হল বিভিন্ন যুগ অনুযায়ী, প্রয়োজন অনুযায়ী ভাষার শব্দভাণ্ডার ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হয়, অথবা কোন কোন শব্দ অপ্রচলিত হয়ে যায়। ভাষা সম্পর্কে এইটাই হল মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। এ প্রসঙ্গে স্তালিনীয় শিক্ষা হল ঃ

"এই দিক থেকে ভাষাব সঙ্গে উপরিকাঠামোর একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। কোন একটা নির্দিষ্ট সমাজের এক বা অন্য ভিত্তি, নতুন বা পুরানো ভিত্তি থেকে ভাষার উৎপত্তি হয় নি ; বরং সমাজের সমগ্র ইতিহাস এবং বহু শতাব্দীর ভিত্তির ইতিহাস থেকেই ভাষার জন্ম। ভাষা কোন একটা বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি নয় ; এর সৃষ্টি সমগ্র সমাজেব, সমাজেব সমস্ত শ্রেণীর শত শত পুরুষানুক্রমিক প্রচেষ্টায়। কোন এক বিশেষ শ্রেণীর প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে ভাষার সৃষ্টি হয় নি , সমগ্র সমাজের, সমাজের সব শ্রেণীব প্রয়োজন মেটাবাব জন্যই ভাষার সৃষ্টি। সঠিকভাবে এই কারণেই সমাজের একটা মাত্র ভাষা হিসাবে, সমাজের সব সদস্যের সর্বজনীনরূপে এবং সমগ্র জনসাধারণের সাধারণ ভাষারূপে এর সৃষ্টি। সুতবাং জনগণের মধ্যে মেলামেশার উপায় হিসাবে ভাষার যে কার্যকরী ভূমিকা, তা অন্যান্য শ্রেণীব ক্ষতিব পবিবর্তে কোন এক বিশেষ শ্রেণীর সেবা করে না। বাস্তবিকপক্ষে এই ব্যাপারটাই ব্যাখ্যা করে যে, কেন একটা ভাষা সমানভাবে পুবানো ও মৃতপ্রায় আর নতুন ও উঠতি ব্যবস্থা উভয়কেই, পুরানো ও নতুন ভিত্তি, এবং শোষক ও শোষিত—এদের সবারই স্বার্থ রক্ষা করে।"[১৫৩]

তাই আধুনিক বাংলা ভাষা, যে ভাষাব বিকাশে রামমোহন এক উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন, সেটি আজ বাঙালী সমাজের সর্বস্তরের

মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে ; এমন কি ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক সমাজেও বাংলা ভাষা একই ভূমিকা পালন করবে। রামমোহনের কর্মকাণ্ডের সমস্ত দিক বাদ দিলেও নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় যে রামমোহন কেবলমাত্র এই কারণেই বাংলা ভাষা-ভাষীদের কাছে এক অদ্বিতীয় কালোত্তীর্ণ পুরুষ হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

**রামমোহন প্রচারিত ধর্ম প্রসঙ্গে**

এবার আসা যাক রামমোহনের ধর্মপ্রসঙ্গে। যে চিন্তার প্রভাবে রামমোহন হিন্দু-সমাজ সংস্কারের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন, এক্ষেত্রেও তাঁর সেই চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। · আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে গোঁড়া হিন্দুধর্ম ভারতের এশীয় স্বৈরাচারী চরিত্র রক্ষার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল। আর ঠিক এই কারণেই রামমোহন হিন্দুদের পৌত্তলিকতা, বংশানুক্রমিক জাতিভেদ প্রথার উপর আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। রামমোহনের একেশ্বরবাদ এই উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত। অনেকেই বলবেন যে তিনি কি এক ধর্মের বিরোধিতা করতে যেয়ে আর এক ধর্মের স্থাপনা করেন নি? তিনি কি ব্রাহ্মধর্মের মধ্য দিয়ে ভাববাদী আদর্শই প্রচার করেন নি? খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। কিন্তু এখানেও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতটা ভুলে গেলে চলবে না। অনেক মার্কসবাদীই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে বর্তমান মানদণ্ডে প্রাচীন ধর্ম বিচার করে থাকেন, এবং এর ফলে তাঁরা লক্ষ করতে ব্যর্থ হন যে ধর্মেরও প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল দিক থাকতে পারে। এই বিষয়ে জর্জ টমসনের অভিমত হল, "ধর্ম আন্দোলনের এই দুই ধারা—প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল ধারা সমস্ত ধর্মেই আবহমানকাল ধরে চলে আসছে।"[৫৪] ধর্ম যে কোন কোন সময় প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারে, তার প্রমাণ হল খৃষ্ট ধর্ম, যা আজ শাসকশ্রেণীর হাতিয়ার। খৃষ্ট ধর্মের এই ভূমিকার কথা উল্লেখ করে টমসন লিখেছেন, "সেই পুরাকালেও খৃষ্টীয় ধর্মমত কোন বিপ্লবী আন্দোলন ছিল না। সেই অবস্থায় তা হওয়া সম্ভবও ছিল না। কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম প্রগতিশীল ছিল।" কোথায় তার প্রগতিশীলতা? "খৃষ্টানেরা দাসপ্রথা বিলোপ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেনি, সিজারের যা প্রাপ্য তা তাকে তারা দিয়েছিল, কিন্তু তারা ক্রীতদাস অথবা স্বাধীন মানুষ উভয়কেই এই ধর্ম গ্রহণ করার পথ করে দিয়েছিল এবং তারা সম্রাটকে পূজা করতে

অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। এতে করে সম্রাটের ঐহিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অনাস্থা ঘোষণা করল।"[১৫৫] শুধু ক্রীতদাস সমাজেই নয়, মধ্যযুগেও ধর্মকে অনেক সময় এই প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া-বিরোধী সংগ্রামে অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল এবং সে সময়কার শোষিত জনগণের বহু সংগ্রামকেই যে এই ধর্মের আশ্রয় নিতে হয়েছিল, তা উল্লেখ করে এঙ্গেলস লিখছেন, "·· সে সময় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিটি সংগ্রামকেই নিতে হত ধর্মীয় ছদ্মবেশ, পরিচালিত করতে হত সর্বাগ্রে চার্চের বিরুদ্ধে।"[১৫৬]

ইউরোপে লুথার, কালভঁা প্রভৃতি ব্যক্তিবা যে ধর্মমত প্রচার করেছিলেন, সেগুলি ছিল শোষিত মানুষের সামন্ততন্ত্র ও চার্চ-বিরোধী সংগ্রামেরই প্রতীক। ভারতীয় 'ভক্তি' আন্দোলনের মধ্যেও ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে। কবীর, নানক, দাদুর, চৈতন্য প্রত্যেকে যে ধর্মমত প্রচার করেছিলেন, তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু বংশানুক্রমিক জাতিভেদপ্রথা, লোকাচার প্রভৃতির বিলোপ সাধন। আর এর মধ্যেই বদ্ধ উৎপাদিকা শক্তি মুক্তির আলো দেখতে পেয়েছিল। যদিও 'ভক্তি' আন্দোলনের নেতারা এ বিষয়ে বিশেষ সফলকাম হতে পারেন নি, কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসে তাঁদের পরিচয় প্রগতিশীল রূপেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কোন একজন ব্যক্তি কোন একটি বিশেষ ধর্মমত প্রচার করেছিলেন বলেই তিনি প্রতিক্রিয়াশীল হতে বাধ্য—এটা আর যাই হোক দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী নয়। রামমোহন নিজে যদিও কোন বিশেষ ধর্ম স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু প্রচলিত ইতিহাসে তাঁর ধর্মমত ব্রাহ্মধর্ম হিসাবে পরিচিত হয়ে আছে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম এই নামটি কি রামমোহন নিজেই ব্যবহার কবেছিলেন? রামমোহন যে "Brahmo Samaj"-এর ট্রাস্ট ডিড রচনা করেন, তার কোথাও ব্রাহ্ম ধর্মের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। রামমোহন সমাজ সংস্কারের কেন্দ্র রূপে যে 'আত্মীয়সভা' (১৮১৫) এবং পরে 'ব্রহ্মসভা' (১৮২৮) গঠন কবেছিলেন, তারই যে স্থায়ী আশ্রয় গড়ে ওঠে, রামমোহনের মৃত্যুর পর সেই সংস্থারই নামকরণ হয় ব্রাহ্মসমাজ। রামমোহন-রচিত 'ট্রাষ্ট ডিড'-এ এই 'সমাজে' সকল মত, সকল ধর্ম এবং সকল শ্রেণীর মানুষকে উপাসনার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর নানা

আলোচনা করে যে চূড়ান্ত মতামত দিয়েছেন, তা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই। "রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই ধারণা ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এটি প্রতিষ্ঠিত চল্‌তি কথা ও সাম্প্রদায়িক মনের অভিলাষের উপর। এই প্রসঙ্গে এটিও মনে রাখতে হবে যে ব্রাহ্মধর্ম বলে কোন ধর্মের উল্লেখ আমরা রামমোহনের সময় পাই না। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সময়েও ব্রাহ্মধর্ম বলে কোন ধর্ম আত্মপ্রকাশ করেনি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন তখনও ব্রাহ্মধর্ম বলে কোন ধর্মের অস্তিত্ব নেই। তত্ত্ববোধিনী সভা যে ধর্মের প্রচার করেছিলেন সে ধর্ম ছিল রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ-প্রবর্তিত বেদান্ত-প্রতিপাদ্যধর্ম। নানা শাস্ত্র থেকে, বিশেষ করে উপনিষদ থেকে বচন সংগ্রহ করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মধর্ম' নামক গ্রন্থ সংকলন করেন ও তার অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে। তাই ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের আগে ব্রাহ্মধর্ম বলে কোন ধর্ম ছিল না।"[১৩৭]

এছাড়া রামমোহনের ধর্মমতকে যদি ব্রাহ্মধর্ম হিসাবেই মেনে নেওয়া যায় তা'হলেও কি সেটি প্রচলিত হিন্দুধর্মের তুলনায় অনেক বেশী প্রগতিশীল ধর্ম ছিল না? যখন পারিয়া প্রভৃতি 'জল-অচল' জাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষের গলায় ঘণ্টা বেঁধে ঘুরতে হত, তখন এটি কি যুগান্তকারী ঘটনা নয় যে আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রহ্মসমাজই প্রথম ধর্মীয় সংস্থা, যা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে একত্রে বসার অধিকার দিল? ভারতীয় ধর্মীয় সংস্থায় এই সমাজচ্যুত মানুষের প্রবেশাধিকারের বিষয়টি আজও কি পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ, তা দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি পরিদর্শন করলেই বোঝা যায়। বস্তুতঃ রামমোহনের ধর্মমত একদিকে যেমন হিন্দুদের বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস, পৌত্তলিকতা ও লোকাচারের উপর আঘাত হেনেছিল, তেমনি অপরদিকে ভারতীয় ধর্মগুলির বদ্ধ অবস্থাকে উন্মুক্ত করে সর্বধর্মের মানুষেব মিলনের সূত্রও রচনা করেছিল। মধ্যযুগে কবীর, নানক প্রভৃতি ধর্মসংস্কারকেরা তৎকালীন সমাজের নিম্নশ্রেণীর সভ্যদের অধিকারের জন্য ধর্মমত প্রচার-করেছিলেন। আর রামমোহন উনিশ শতকের ভারতীয় উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সর্ব ধর্মের মিলনের আহ্বান জানিয়ে, ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করে সর্বভারতীয ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। তাই গোঁড়া ব্রাহ্মাণ্যধর্ম-বিরোধী সংগ্রামে

রামমোহন প্রচারিত ধর্মমত একটি বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছিল; শেষ বিচারে আঘাত করেছিল ভারতীয় সামন্ততন্ত্রকে।

দ্বিতীয়তঃ, রামমোহন প্রচারিত ধর্মমত বিচারের সময় আর একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এসে যায় যে, রামমোহন যে সমাজে হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন, সেই সমাজে কি নাস্তিক্যবাদ প্রচারের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল? রামমোহন তো প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র বেদ-বেদান্তের সাহায্যে, কিন্তু তাতেই সমাজে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল? সমাজ তাঁকে ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত কবেছিল, হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারীরা তাঁর উপর নিপীড়ন চালিয়েছিল, আর আপন পিতা-মাতা রামমোহনকে ত্যাজ্যপুত্র করে মিথ্যা মামলায় ব্যতিব্যস্ত করেছিলেন। তদানীন্তন হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা রামমোহনকে এতেই নিস্তার দেয়নি। এমনকি "লোকে গোপনে তাঁর প্রাণবধেরও চেষ্টা করেছিল।"[১৫৮] এইরকম সামাজিক অবস্থায় রামমোহন যদি নাস্তিক্যবাদ প্রচারের চেষ্টা করতেন, তা'হলে হিন্দু ধর্ম-বিরোধী সংগ্রামে রামমোহন প্রচারিত ধর্ম-মত যতটা সাফল্যলাভ করেছিল, সেই পরিমাণ সাফল্য কি নাস্তিক্যবাদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব ছিল? সম্ভব যে ছিল না তার একটা দৃষ্টান্ত হল সে যুগের জন্ম-বিদ্রোহী ডিরোজিওর (১৮০৯-৩১) ব্যর্থতা। একথা ঠিকই যে ডিরোজিওর স্বল্পায়ু তাঁর সাফল্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, এটাও কি ঘটনা নয় যে তখনকার দিনের বেশীরভাগ মধ্যবিত্তরা ডিরোজিওর উপস্থিতিতে হিন্দু কলেজে তাঁদের সন্তানদের প্রেরণ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন? যদিও ডিরোজিও হিন্দু কলেজে তাঁর মাত্র তিন বছরের কার্যকালের মধ্যেই ছাত্রদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি এক অভূতপূর্ব আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু ডিরোজিওর প্রভাব কেবলমাত্র হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এক মুষ্টিমেয় অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ডিরোজিওর নাস্তিক্যবাদ যেমন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে যুক্তিবাদ, চিন্তার স্বাধীনতা প্রভৃতি সে যুগের আধুনিক চিন্তাধারা নিয়ে যেতে অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছিল, তেমনি ডিরোজিওপন্থীদের হিন্দু ধর্মের প্রতি বিরোধিতা অনেক ক্ষেত্রেই হিন্দু ধর্মের প্রতি ঘৃণা, মদ্যপান, গোমাংস ভক্ষণ প্রভৃতি আচারেই আবদ্ধ রইল। তাঁরা এক সংস্কারের বিরোধিতা করতে যেয়ে আর এক সংস্কারের নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়লেন। ইয়ং

বেঙ্গল আন্দোলনের কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য না থাকার ফলে দেখা গেল যে ডিরোজিওর অনুপস্থিতিতে ডিরোজিওপন্থীদের একাংশ—মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী, মধুসূদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রকুমার ঠাকুর প্রভৃতি, নাস্তিক্যবাদ বিসর্জন দিয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। আর ডিরোজিওপন্থীরা সমাজের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতেও ব্যর্থ হলেন। ফলে ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন কিছু ব্যক্তি-প্রতিভার সৃষ্টি ভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসার অথবা অন্য কোন সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারল না। বরং ডিরোজিওপন্থীদের অতি-নাস্তিকতা যেমন তাঁদের সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করল, তেমনি সেই আচার-আচরণ পরোক্ষভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রচারকদের হাতই শক্তিশালী করল, যারা এই আচার-আচরণের নজির দেখিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিথ্যা প্রচার করল যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রদের এই ব্যবহার হল আধুনিক শিক্ষারই কুফল। ডিরোজিওপন্থীদের এই অতি-নাস্তিকতাই পরবর্তীকালে এর ঠিক বিপরীত—হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করল, যা পরে আলোচিত হবে। এইখানেই ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলনের ব্যর্থতা। সুতরাং সেই হিসাবে দেখলে রামমোহনকে ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই একেশ্বরবাদ প্রচার করতে হয়েছিল, ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যই ধর্মের আবরণ নিতে হয়েছিল।

ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই যে ধর্মবিরোধী সংগ্রামকে ধর্মের ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়, তার প্রমাণ ডিইজম (deism)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চার্চ ও খৃষ্টধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যাঁরা আদর্শগত সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁদের এক অংশকে ডিইস্ট (deist) বলা হত এবং তাঁদের মতবাদের নাম হচ্ছে ডিইজম। ডিইজম কি? এ সম্পর্কে বলা হয়—

**ধর্ম আন্দোলনে ডিইজমের ভূমিকা**

"দর্শন ও ধর্ম-বিদ্যার একটি ধারা হল ডিইজম, যা ঈশ্বরকে জগতের নৈর্ব্যক্তিক প্রাথমিক কারণরূপে স্বীকার ক'রে সাকার ঈশ্বরের ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক ও যাজকীয় বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীর আধিপত্যের সময় ডিইজম প্রায়শঃই ছিল **বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদের ছদ্মবেশ**। পরবর্তীকালে ডিইজম বুর্জোয়া আদর্শবাদীদের ধর্মকে সংরক্ষণ করতে ও তার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে সহায়তা করেছিল, যে ধর্ম থেকে ডিইস্টরা কেবলমাত্র উদ্ভট ও কলঙ্কিত গোঁড়ামী ও

ধর্মীয় আচার-আচরণকে অপ্রয়োজনীয় বলে বর্জন করেছিল।"[১৫৯] ( বড় হরফ আমাদের )

যদিও ডিইজম প্রধানতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় দর্শনে একটি অন্যতম ঝোঁক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, কিন্তু বলা যেতে পারে এর সূত্রপাত লক (Locke)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ "*The Reasonableness of Christianity*"-র প্রকাশনায় ( ১৬৯৫ )। বস্তুবাদী দার্শনিক হিসাবে লকের পরিচয় সর্বজনস্বীকৃত। তাই মার্কসবাদে ফরাসী বস্তুবাদ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "ফরাসী বস্তুবাদের দুটি ধারা। একটির উৎস দ্যকার্তে থেকে, অপরটির লক থেকে। শেষোক্তটি হল প্রধানতঃ এক ফরাসী বিকাশ (French development) এবং তা সরাসরি সমাজতন্ত্রের দিকে চালনা করে।"[১৬০]

লকের অন্যতম কৃতিত্ব যুক্তিবাদের অবতারণায়। লক সত্য ও রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য যুক্তিকেই চূড়ান্ত মানদণ্ড হিসাবে বেছে নেন। এই যুক্তিবাদের প্রভাবের ফলেই লক ধর্মকে স্বীকার করে নিলেও, তাকে সহজাত (innate) বলে মেনে নেন নি, এবং যৌক্তিক ঈশ্বরতত্ত্ব বা র‍্যাশনাল থিওলজির পক্ষ সমর্থন করেন। লক যে যুক্তিবাদের অবতারণা করলেন তারই প্রভাব পড়ল পরবর্তীকালে ডিইস্টদের ওপর। লকের প্রভাবে তদানীন্তন ইউরোপে যে সব কিছুকে যুক্তির সাহায্যে বিচার ও যুক্তিবাদের মাধ্যমে সত্যাসত্য নির্ণয় করার পদ্ধতি শুরু হল, ধর্মও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল না। ডিইস্টরা তাই খৃষ্ট ধর্মের প্রতি আনুগত্য জানিয়েও লোকাচার, কুসংস্কার, চার্চের একাধিপত্যকে ধর্মীয় বিকৃতি বলে মনে করলেন। প্রকৃতপক্ষে ডিইস্টরা কেবলমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই স্বীকৃতি দিলেন আর অস্বীকার করলেন ধর্মের সমস্ত বাহ্যিক অভিব্যক্তিকে। তাই এই আন্দোলন শেষ বিচারে তদানীন্তন ইউরোপের ধর্মীয় কুসংস্কারসম্পন্ন প্রাত্যহিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রথাকেই আঘাত করল, যার ফলে উন্মুক্ত হল বুর্জোয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের পথ। এ যুগের অনেক আধুনিক 'বিপ্লবী'ই হয়ত ধর্মপ্রচারের জন্য, ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য ডিইস্টদের এককথায় প্রতিক্রিয়াশীল এবং ভাববাদী দার্শনিক বলবেন। কিন্তু সে যুগে ইউরোপেও কি নাস্তিক্যবাদ প্রচারের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল? দেখা যাক্ এ বিষয়ে মার্কস-এঙ্গেলস-এর অভিমত কি। মার্কস-এঙ্গেলস ডিইজম সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা করেছেন তার

থেকে আমরা দু'টি মাত্র উক্তি উদ্ধৃত করলাম।

"অন্ততঃ বস্তুবাদীদের পক্ষে ডিইজম ধর্ম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সুবিধা-জনক ও সহজ পথ ভিন্ন অন্য কিছু নয়।"[১৬১]

"বৃটিশ ডিইস্টরা এবং তাঁদের আরও সুসঙ্গতিপূর্ণ উত্তরসাধক ফরাসী বস্তুবাদীরা ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রকৃত দার্শনিক; ফরাসী বস্তুবাদীরা এমন কি বুর্জোয়া বিপ্লবেরও দার্শনিক ছিলেন।"[১৬২]

দেখা যাচ্ছে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য মার্কস-এঙ্গেলস ডিইস্টদের ভাববাদী বা আস্তিক্যবাদী বলেননি। বরং তাঁরা ডিইস্টদের ইংরেজ ও ফরাসী বুর্জোয়াদের বস্তুবাদী দার্শনিক হিসাবেই দেখেছিলেন। বস্তুতঃ তৎকালীন সামাজিক অবস্থা ধর্ম-বিরোধী সংগ্রামে নাস্তিক্যবাদী ও বস্তুবাদী-দেব যে ধর্মের মুখোশ পরতে বাধ্য করেছিল, সেটি হল ডিইজম। কারণ এই ধর্মের মুখোশ ভিন্ন সে সময়ে কোন বস্তুবাদীর পক্ষে ধর্ম-বিরোধী সংগ্রামে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ প্রায় অসম্ভব ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম ডিইস্ট ছিলেন জন টলাণ্ড, এ্যাণ্টনি কলিনস্, ট্রিণ্ডাল, উলস্টোন, চাব প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে যেমন কোন কোন বিষয়ে মতপার্থক্য ছিল, তেমনি আবার পরবর্তীকালের ডিইস্টরা তাঁদের পূর্বসূরীদের বক্তব্যের অনেক উন্নতিও ঘটান। বিভিন্ন ডিইস্টদের মধ্যে এই সব মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাঁদের সকলের বক্তব্যের সারবস্তু কিন্তু একই, যা বলা যেতে পারে ডিইজমের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। প্রথমতঃ, সমস্ত ডিইস্টরা কেবলমাত্র প্রাকৃতিক ধর্ম (ন্যাচারাল রিলিজিয়ান)-কেই স্বীকার করতেন, যার অন্তঃসার হল নৈতিকতা। 'ঈশ্বরে বিশ্বাস কর' ও 'কর্ম কর'—এর বেশী কোন কিছুকে এঁরা ধর্মে স্থান দেন নি। তাঁরা প্রতিটি প্রচলিত ধর্মকে এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতেন এবং মনে করতেন ধর্মে এই দু'টি বিষয় ভিন্ন সব কিছুই হল 'অনাবশ্যক ও "ক্ষতিকারক সংযোজন' (সুপারফ্লুয়াস এ্যাণ্ড হার্মফুল এ্যাডিসনস্)।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁদের দৃষ্টিতে সত্য এক এবং সত্য ধর্ম একটিই। তাঁদের ধারণা অনুযায়ী মুক্তি (স্যালভেশন)-এর একমাত্র পথ হল ঈশ্বরকে স্রষ্টা ও বিচারক (ক্রিয়েটর এ্যাণ্ড জাজ্) রূপে জানা ও ঈশ্বর প্রদত্ত বিধান যথাযথ পালন করা। অর্থাৎ সৎ ও নৈতিক জীবন যাপন।

তৃতীয়তঃ, ডিইস্টদের বিশ্বাস প্রাকৃতিক ধর্মের নিরিখে সমস্ত ঐতিহাসিক

ধর্মকেই যুক্তিদ্বারা বিচার করা যায়। ফলে এঁরা প্রতিটি ধর্মের সারবস্তুকে বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম থেকে পৃথক করার প্রয়োজনীয়তার কথা জনসমক্ষে অবিরাম প্রচার করতেন। ডিইস্টরা বাইবেলে বিশ্বাস করতেন বাইবেলের যুক্তির জন্য; বাইবেলে লিখিত আছে বলে নয়। অর্থাৎ তাঁদের কাছে কোন প্রচলিত ধর্মই অভ্রান্ত নয়, ববং প্রত্যেকটি ধর্মের ভ্রান্ত দিকগুলো যুক্তির সাহায্যে উদ্ঘাটিত করাই হল প্রতিটি বিবেকবান মানুষের কর্তব্য।

চতুর্থতঃ, ডিইস্টদের ধারণা প্রাকৃতিক ধর্ম হল বিশ্বজনীন এবং সর্বক্ষেত্রে এক।

পঞ্চমতঃ, তাঁবা পৌত্তলিকতা ও বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসকে ধর্মের অন্যতম বিকৃতি বলে গণ্য করতেন।

ষষ্ঠতঃ, ডিইস্টরা কেউই অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করতেন না, এবং এঁদের চিন্তাধারা অনুযায়ী অলৌকিকত্বের প্রচলনসহ ধর্মেব সব বিকৃতির জন্য দায়ী একমাত্র যাজক ও পুরোহিত সম্প্রদায়।[১৬৩]

ডিইস্টদের সত্য সম্পর্কে বক্তব্য এ্যান্টনি কলিনস্-এর "*Discourses of Free thinking*" গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর এই গ্রন্থ সম্পর্কে ফক্কেনবার্গ লিখেছেন, "এ্যান্টনী কলিনস্ (১৬৭৬-১৭২৯) তাঁর 'স্বাধীন চিন্তাব আলোচনা'-গ্রন্থে সাধারণভাবে স্বাধীন চিন্তার (যা হল যুক্তিভিত্তিক বিচার) অধিকার প্রদর্শন করেন এই সূত্র অনুযায়ী যে, কোন সত্যই আমাদের কাছে নিষিদ্ধ নয় এবং সত্য অর্জন ও কুসংস্কাব থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের অন্য কোন পথ নেই। যেহেতু যাজক সম্প্রদায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে, সেহেতু ঈশ্বর, বিশেষ করে বাইবেলের ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা প্রয়োগের অধিকারও কলিনস্ প্রদর্শন করেন।"[১৬৪]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, মার্কস-এঙ্গেলস যে সমস্ত বস্তুবাদীর নাম উল্লেখ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কলিনস্ অন্যতম। "বেকনীয় বস্তুবাদের আস্তিক্য-বাদী কুসংস্কার ছিন্ন করেছিলেন হব্‌স। লকের ইন্দ্রিয়বাদের মধ্যে যে ধর্মতত্ত্বের অবশেষ তখনো থেকে গিয়েছিল তাকে একইভাবে ছিন্ন করেন **কলিনস্, ডডওয়েল, কাউয়ার্ড, হার্টলি, প্রিস্টলি।** ব্যবহারিক বস্তু-বাদীদের পক্ষে ধর্ম থেকে অব্যাহতি পাওয়ার সহজ পদ্ধতি হল শেষ পর্যন্ত

Deism।"[১৬৫] ( বড় হরফ আমাদের )

ঐতিহাসিক প্রয়োজনে নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদ কোন কোন সময় ধর্মের ছদ্মবেশ ধারণ করে একথা সত্য হলেও, প্রশ্ন হল রামমোহন কি তা'হলে পূর্বপরিকল্পিতভাবে একেশ্বরবাদকে একটি ছদ্মবেশ হিসাবেই মনে করেছিলেন? অর্থাৎ রামমোহন প্রচারিত ধর্মমতের সঙ্গে কি ডিইস্ট মতবাদের কোন সাদৃশ্য ছিল? রামমোহনের ধর্মমতের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করার পরই এ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া সম্ভব। তাই আমরা খুব সংক্ষেপে রামমোহন-ধর্মমতের প্রধান প্রধান বক্তব্য লক্ষ করব। প্রথমে ধরা যাক্ রামমোহনের ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণার বিষয়টি। সকলেই জানেন যে রামমোহনের মতবাদ অনুযায়ী ব্রহ্মই আদি ঈশ্বর, যা সর্বত্র বিরাজমান। ব্রহ্ম কে? "অনন্তপ্রকার বস্তু ও ব্যক্তি সম্বলিত অচিন্তনীয় যে এই জগৎ, ও ঘটিকাযন্ত্র অপেক্ষাকৃত অতিশয় আশ্চর্যান্বিত বাশিচক্র বেগে ধাবমান চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রাদিযুক্ত যে এই জগৎ, ও নানাবিধ স্থাবর জঙ্গম শরীর যাহার কোন এক অঙ্গ নিস্প্রয়োজন নহে সেই সকল শরীর ও শরীরীতে পরিপূর্ণ যে এই জগৎ, ইহার **কারণ ও নির্বাহকর্তা** যিনি তিনি উপাস্য হন।"[১৬৬] ( বড় হরফ আমাদের ) বলা বাহুল্য, এই উপাস্যই হলেন রামমোহনের ব্রহ্ম যার কোন আকার ক্ষয়-লয় কিছু নেই, যিনি সর্বভূতে বিরাজমান। কিন্তু তাঁর ব্রহ্ম কি নৈর্ব্যক্তিক না ব্যক্তিবাচক? সেই আদি অকৃত্রিম ব্রহ্মর স্বরূপ কি নির্ধারণ সম্ভব? এ প্রসঙ্গে রামমোহন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যে আলোচনা করেছেন, তা এইরকম—

**'ব্রাহ্ম' ধর্ম না ডিইস্ট মতবাদ?**

"৩ প্রশ্ন—তিনি কি প্রকার।

৩ উত্তর—তোমাকে পূর্বেই কহিয়াছি যে যিনি এই জগতের কারণ ও নির্বাহকর্তা তিনিই উপাস্য হন, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার নিধারণ করিতে কি শ্রুতি কি যুক্তি সমর্থ হন না।

৪ প্রশ্ন—কোন উপায়ে তাঁহার স্বরূপের নির্ণয় হয় কি না।

৪ উত্তর—তাঁহার স্বরূপকে কি মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ করা যায় না, ইহা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বারংবার কহিয়াছেন। এবং যুক্তিসিদ্ধও ইহা হয়, যেহেতু এই জগৎ প্রত্যক্ষ অথচ ইহার স্বরূপ ও পরিমাণকে কেহ নির্ধারণ করিতে পারেন না; সুতরাং এই জগতের কারণ ও নির্বাহকর্তা যিনি

লক্ষিত হইতেছেন **তাঁহার স্বরূপ ও পরিমাণের নির্ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হয়।**" ( বড় হরফ আমাদের )

"৮ প্রশ্ন—যদি আপনারা পরমেশ্বরের উপাসনা করেন এবং অন্য উপাসকেরাও প্রকারান্তরে সেই পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তবে তাঁহাদের সহিত আপনাদের প্রভেদ কি ?

৮ উত্তর—তাঁহাদের সহিত দুই প্রকারে আমাদের পার্থক্য হয়, প্রথমত, তাঁহারা পৃথক ২ অবয়ব ও স্থানাদি বিশেষণের দ্বারা পরমেশ্বরের নির্ণয় বোধে উপাসনা করেন, কিন্তু আমরা যিনি জগৎকারণ তিনি উপাস্য ইহার অতিরিক্ত অবয়ব কি স্থানাদি বিশেষণ দ্বারা নিরূপণ করি না। দ্বিতীয়ত, এক প্রকার অবয়ববিশিষ্টের যে উপাসক তাঁহার সহিত অন্য প্রকার অবয়ববিশিষ্টের উপাসকের বিবাদ দেখিতেছি, কিন্তু আমাদের সহিত কোন উপাসকের বিরোধের সম্ভব নাই, যাহা পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে কহিয়াছি।"[১৬৭]

রামমোহনের এ আলোচনা থেকে ব্রহ্ম সম্পর্কে কি ধারণা আমরা পেলাম ? প্রথমতঃ, তিনি 'জগতের কারণ ও নির্বাহকর্তা' ; দ্বিতীয়তঃ, 'তাঁহার স্বরূপ ও পরিমাণের নির্ধারণ' সম্ভব নয়, এবং তৃতীয়তঃ, এই পরমেশ্বর বা ব্রহ্মার নির্ণয় কোন অবয়ব বা স্থান দ্বারা করা যায় না। সুতরাং রামমোহনের ব্রহ্ম শুধু নিরাকার নয়, নৈর্ব্যক্তিকও বটে। ঈশ্বর সম্পর্কে রামমোহন ও ডিইস্টদের ধারণার মধ্যে কি যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ করা যাচ্ছে না ? ডিইস্টরাও ব্যক্তিবাচক ঈশ্বরের পরিবর্তে ঈশ্বরকে নৈর্ব্যক্তিকরূপে কল্পনা করতেন। আর তাঁদের কাছে ঈশ্বর হলেন জগতের প্রাথমিক কারণ ( **'primary cause of the world'** ) এবং এই কারণে ঈশ্বর তাঁদের কাছে স্রষ্টা ও বিচারকের ( **'creator and judge'** ) স্থান পেয়েছেন। অতএব রামমোহনের 'জগতের কারণ ও নির্বাহকর্তা' ও ডিইস্টদের 'জগতের প্রাথমিক কারণ' বা 'স্রষ্টা ও বিচারক' এবং রামমোহনের অবয়বহীন, স্থানহীন ঈশ্বর ও ডিইস্টদের নিরাকার ঈশ্বর প্রায় একই। পার্থক্য শুধু এই—ডিইস্টরা খৃষ্টান বংশোদ্ভূত আর রামমোহন হিন্দু বংশোদ্ভূত।

এবার ধর্মপালন সম্পর্কে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ করা যাক। ওই একই প্রশ্নোত্তরে তিনি এসম্পর্কে যা বলেছেন, তা হল—

"৯ প্রশ্ন—কি প্রকারে এ উপাসনা কর্তব্য হয়।

৯ উত্তর—এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান যে জগৎ ইহার কারণ ও নির্বাহকর্তা পরমেশ্বর হন, শাস্ত্রত ও যুক্তিত এইরূপ যে চিন্তন তাহা পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। ইন্দ্রিয় দমনে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এ উপাসনার আবশ্যক সাধন হয়। ইন্দ্রিয় দমনে যত্ন, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে এরূপে নিয়োগ করিতে যত্ন করিবেন যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে, বস্তুত যে ব্যবহারকে আপনার প্রতি অযোগ্য জানেন তাহা অন্যের প্রতিও অযোগ্য জানিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতে যত্ন করিবেন। প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন, অর্থাৎ আমাদের সিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে শব্দের অবলম্বন বিনা অর্থের অবগতি হয় না, অতএব পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী ও শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেন। এবং অগ্নি বায়ু সূর্য্য ইহাদের হইতে ক্ষণে ২ যে উপকার হইতেছে ও ব্রীহি যব ঔষধি ও ফলমূল ইত্যাদি বস্তুর দ্বারা যে উপকার জন্মিতেছে, সে সকল পরমেশ্বরাধীন হয় এই প্রকার অর্থপ্রতিপাদক শব্দের অনুশীলন ও যুক্তি দ্বারা সেই ২ অর্থকে দার্ঢ্য করিবেন। ব্রহ্মবিদ্যার আধার সত্য কথন ইহা পুনঃ ২ কহিয়াছেন, অতএব সত্যের অবলম্বন করিবেন, যাহাতে সত্য যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনায় সমর্থ হন।”[১৬৮]

অর্থাৎ রামমোহনের এই বক্তব্যের সরলার্থ হল একদিকে বেদ-উপনিষদ প্রভৃতি অধ্যয়ন করে ঈশ্বর-চিন্তা করতে হবে আর অন্যদিকে প্রাত্যহিক জীবনে সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও সদাচারণ করতে হবে এবং ধর্মের প্রতি আনুগত্য থেকে যা সত্য তা'কে মানতে হবে। তা'হলে রামমোহনের মতে ধর্ম পালনের জন্য কোন আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-অর্চনা প্রভৃতি কোন বাহিক ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র বেদ-উপনিষদ পাঠ, ন্যায়-অন্যায় বিচার, সত্যের পক্ষ অবলম্বন এবং সমাজে সৎ জীবনযাত্রা পালন করলেই ব্রহ্ম তৃপ্ত হবেন।

তা'হলে কি বলা যায় না যে ডিইজম-এর মত রামমোহন প্রচারিত ধর্মমতেরও সারবস্তু নৈতিকতা? প্রকৃতপক্ষে ডিইস্টদের সঙ্গে একই সুরে রামমোহন বলেছেন সঠিক ধর্ম পালনের অর্থ ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং সৎ ও নৈতিক জীবনযাত্রা। তাই রামমোহনের একেশ্বরবাদেরও সারবস্তু নৈতিকতা ভিন্ন কিছু নয়। এই নৈতিকতা ছাড়া রামমোহন ধর্মে অন্য কোন বিষয়কে স্বীকার

করেন নি। এই কারণেই তাঁকে বলতে শোনা যায়; "কিন্তু এই দুটি অপরিহার্য্য বিশ্বাসের (আত্মা ও পরকাল—লেখক) সঙ্গে যে আবার পানাহার শৌচাশৌচ এবং শুভাশুভ ব্যাপার নিয়ে শতশত কষ্টকর ও নিরর্থক বিধিনিষেধ লেজুড়ের মত লাগিয়ে দে'য়া হয়েছে, আর, এ'গুলোই সমাজের উন্নতি না করে অনিষ্টের কারণ হয়েছে, এবং সামাজিক উন্নতি নাকরে সাধারণ লোকেদের উদ্‌ভ্রান্ত বিপর্য্যস্ত করেছে।"[১৬৯]

তৃতীয়তঃ, রামমোহন যে বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস ও পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন তা সর্বজনস্বীকৃত। সেই জন্যই তিনি প্রচার করেছিলেন নিরাকার ব্রহ্ম ও একেশ্বরবাদ। ডিইস্টরাও কিন্তু এই দুটি বিষয়ের চরম বিরোধী ছিলেন। এমন কি তাঁরা বলতেন ধর্ম "খৃষ্টপূর্ব সময়ে দু'বার পৌত্ত-লিকতা দ্বারা ভ্রষ্ট হয়েছিল।"[১৭০] ডিইস্টদের চিন্তাধারা অনুযায়ী বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসও অবশ্য আদিম ধর্মের বিকৃতির অন্যতম কারণ। সুতরাং এ বিষয়েও রামমোহন ও ডিইস্টদের চিন্তাধারার মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য লক্ষ করা যায় না।

ডিইস্টদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, তাঁরা কোন অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু রামমোহন কি করতেন? "অলৌকিকতার আড়ালে অসত্য ও অন্যায়"—এই শিরোনামে রামমোহন লিখছেন, "কিন্তু সেটি (সত্য নির্ণয়—লেখক) বহুলাংশে অজ্ঞানতার আবরণে ঢাকা থাকে বলে সহজে বোধগম্য হয় না। তাই দেখি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী নেতারা তাদের নাম সহজে অক্ষয় করবার জন্য এবং নিজের নিজের যশ বাড়াবার জন্য, বিশুদ্ধ সত্য (pure truth) গুলিকে নিজেদের বিশেষ বিশেষ মতের আবরণে ঢেকে রাখেন। সেগুলিকে কোথাও বা অলৌকিকতার (miracles) উপর দাঁড় করিয়ে দেন, কিম্বা মণ্ডলীর অবস্থার উপযোগী মনভোলান ভাষায়, অথবা নানা ফন্দির ভিতর দিয়ে সত্যের আকারে প্রচার করেন।"[১৭১]

ঐ একই প্রসঙ্গে রামমোহনের আরও বক্তব্য, "বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মমণ্ডলীর কেন্দ্র স্থানীয় নেতারা (অথবা বিভিন্ন ধর্ম্মমতের প্রবর্তকরা) অলৌকিকত্বের (miracles) এমন ব্যাখ্যা করেছেন যে তারাই যেন ভক্তহৃদয়ে ছাড়পত্রের (passport) মালিক। তা'র ফলে সাধারণ লোকের বিশ্বাস ধর্ম্মগুরুদের প্রতি বেড়েই চলেছে।

"সাধারণ লোক প্রচলিত মতের দ্বারাই অভিভূত হয়। তাদের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক যে যখন এমন কোন কিছু দেখতে পায়, যা'র রহস্য তাদের বুদ্ধির অগম্য অথবা যা'র কোন কারণ দেখতে পায় না, তখন তা'রা ইহা এক অলৌকিক বা অতি প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া বলে বর্ণনা করে। এর রহস্য আসলে এই যে জগতের যাবতীয় বস্তুর বর্তমানতাই কোন না কোন আপাত কারণের এবং বিভিন্ন অবস্থার **(conditions)** ও ন্যায় বিধিব **(modes of justice)** উপর নির্ভর করে। সুতরাং আমরা যদি বস্তুর ভাল ও মন্দের মুখ্য ও গৌণ কারণ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করে দেখি, তবেই আমরা বলতে পারি যে ঐ বস্তুর সত্তার সঙ্গে সমস্ত বিশ্বই অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত। কিন্তু, যখন অভিজ্ঞতার অভাবে এবং মতের সংকীর্ণতার জন্য কোন কিছুর কারণ কারো নিকট অপ্রকাশিত থাকে, তখন তা'র সুযোগ নিয়ে অন্য যে কোন মতলবী মানুষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সব ঘটনাকে নিজের অলৌকিক শক্তি বলে বর্ণনা ক'রে তার দলেই লোককে আকর্ষণ করে।"[১৭২]

এখানে রামমোহন শুধু তাঁর অলৌকিকত্ব-বিরোধী মনোভাবই ব্যক্ত করেন নি, তিনি যেমন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সমস্ত জাগতিক বস্তুর বর্তমানতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন তেমনি সমস্ত অতীন্দ্রীয় কাহিনীর মূল কারণ যে অজ্ঞতা ভিন্ন অন্য কিছু নয়, তা'ও সুস্পষ্টভাবে বলতে দ্বিধা করেন নি। ডিইজম-বিশ্বাসী ভিন্ন কোন্ ধর্ম-প্রচারকের পক্ষে এ দুঃসাহস প্রদর্শন করা সম্ভব ?

ধর্ম-ইতিহাসে ডিইস্টদের অন্যতম অবদান হল যুক্তিবাদ। এই যুক্তিবাদের প্রভাবেই তাঁরা সমস্ত ঐতিহাসিক ধর্মকে পরিক্ষণীয় বলে মনে করতেন এবং কোন ধরনের শাশ্বত সত্যের আজগুবী গল্পে বিশ্বাস না করে নির্দিষ্ট কাল-পরিধির ভিত্তিতে সত্যের অনুসন্ধান করতেন। কিন্তু এ বিষয়ে রামমোহনের মনোভাব কি ছিল ? তিনি কি সত্যকে পরিবর্তমান ধবে নিয়ে সর্বকালে নতুন সত্য অন্বেষণের প্রয়োজনবোধ করতেন ?

ভারতীয় ধর্ম-ইতিহাসে রামমোহনের প্রধান কৃতিত্ব হল এই যে তিনিই সর্বপ্রথম ধর্ম-বিচারের জন্য যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বেশীরভাগ ধর্ম-বিষয়ক গ্রন্থই হল এই যুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ। শুধুমাত্র যুক্তির উপর নির্ভর করেই তিনি গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে পর্যুদস্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন

এবং হিন্দু ধর্মের অসারতা প্রমাণ করেছিলেন। এই তীব্র যুক্তিবোধই তাঁকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিরোধী যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেছিল। আর যুক্তিবাদের প্রভাবেই তিনি সত্যের অন্বেষণকে নিজের জীবন দর্শন বলে গণ্য করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। "একেশ্বর-বিশ্বাসীদিগকে উপহার" গ্রন্থে রামমোহনের এই পরিচয়ই পাওয়া যায়। তিনি এখানে "সত্য নির্ণয়ের আনন্দ" শিরোনামে লিখলেন, "মানুষের অভ্যাস ও পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার ফলে যে সকল অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা যাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেষ্টা করেন, আবার সমগ্রভাবে প্রাণীজগতের বিশেষ বিশেষ জাতির (species), কিম্বা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির খেয়াল, স্বভাব যা প্রকৃতির ফলস্বরূপ যে সকল দোষ ও গুণের উদ্ভব হয়, তা যাঁরা পৃথক করে দেখান, এবং যাঁরা নানা ধর্মের বিভিন্ন নীতির (principles) বা তত্ত্বের কোন একটাকে বেশী মূল্য না দিয়ে তার সত্যাসত্যের পরীক্ষা করেন,—শুধু তাই নয়, যাঁরা সাধারণের প্রচারিত মতের প্রতি কোনও পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে, তাঁদের সাধ্যমত, সেই প্রায়-স্বতঃসিদ্ধ মতগুলি বিচার করে দেখেন, তাঁদের সময় কি আনন্দেই কাটে! কাবণ, যেমন নানা প্রয়োজনীয় বস্তুর নানা সার্থকতা (utility) ও তথ্য নিরূপণ কবা আদর্শ মানুষের (perfect man) সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ, তেমনি বিভিন্ন কাজের মাত্রার অনুপাত এবং তা'র বিচিত্র নিগূঢ় ফলের যথার্থ পরিমাণ নির্ণয় করাও তাঁদের শ্রেষ্ঠ কাজ।"[১৭৩]

প্রকৃতপক্ষে এই অনুচ্ছেদটিতে আমরা শুধু একজন ডিইস্ট নয়, যেন একজন বস্তুবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকেরই পরিচয় পাচ্ছি। যাঁর কাছে সমগ্র জীবজগৎ, এমনকি মানুষের আচার-আচরণও আকস্মিক ঘটনা নয়, এবং সেকারণে সেগুলি কোনক্রমে স্বতঃসিদ্ধও নয়, তাঁর পক্ষে কি আন্তরিকভাবে কোন ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব? না কি ধর্ম তাঁর কাছে শুধুই আবরণমাত্র? তাই আদর্শ ডিইস্ট-এর মতই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে কোন জাগতিক ঘটনাই সমালোচনার উর্ধে নয়—তা সে মানুষের স্বভাবই হোক আর প্রচলিত ধর্মই হোক। আর এই কারণেই রামমোহন আদর্শ মানুষের কর্তব্য বলতে বোঝেন—মানুষের দোষ-গুণ পৃথক করে দেখা, অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায় বিচার, নানা ধর্মের বিভিন্ন নীতির সত্যাসত্য পরীক্ষা এবং সমাজে প্রচলিত 'প্রায়-স্বতঃসিদ্ধ' মতগুলির যৌক্তিকতা বিচার। অর্থাৎ সত্য যা অপরিবর্তনীয় নয়, যা যুগে যুগে পাল্টায়, তার অন্বেষণ ও সমাজে প্রচলিত প্রতিটি নীতি বা তত্ত্বের পরীক্ষা করাই হল

যথার্থ বিবেকবান মানুষের কর্তব্য। বলা নিষ্প্রয়োজন যে মানুষের ধর্ম-ইতিহাসে ডিইস্ট ভিন্ন আর কারো মুখে এ ধরনের যুক্তিবাদের অবতারণা আগে কখনও শোনা যায়নি। ডিইস্ট ও রামমোহনের চিন্তাধারার কি আশ্চর্যজনক মিল! পার্থক্য শুধু এই—ডিইস্ট-প্রচারিত বক্তব্যের ভিত্তি ছিল বাইবেল; আর রামমোহন নিজ দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী বেদ-বেদান্তকে ভিত্তি করে নিজস্ব ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। এই পার্থক্যটুকু ছাড়া রামমোহন ও ডিইস্টদের উদ্দেশ্য কিন্তু এক ও অভিন্ন এবং সেটি হল প্রচলিত ধর্মের সংস্কার, অন্ধ গোঁড়া মতবাদের পরিবর্তে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা, কুসংস্কারের জাল ছিন্ন করে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপকে প্রাত্যহিক জীবন থেকে নির্বাসন দেওয়া, এবং প্রচার করা যে যথার্থ ধর্ম পালনের অর্থ সৎ ও নৈতিক জীবনযাপন। এইটিই হল রামমোহন-প্রচলিত ধর্মমতের অন্তঃসার। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতক, তাই বা কেন, বর্তমান যুগেও এই ধর্মমত কি প্রচলিত হিন্দু বা ইসলাম ধর্মের তুলনায় একটি বিপ্লবী মতবাদ নয়?

রামমোহন ও ডিইস্টদের বক্তব্যের আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য ভিন্ন সমকালীন ইউরোপীয় ধর্ম-আন্দোলনের সঙ্গে রামমোহনের সম্পর্কের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে তৎকালীন ইউরোপীয় ধর্ম-আন্দোলনের নেতাদের রামমোহন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়টি। রামমোহনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের পবিপ্রেক্ষিতে এ অনুমান কবা যায় যে তদানীন্তন ইউরোপের ধর্ম-আন্দোলনের প্রভাব রামমোহনের ওপর খুবই স্বাভাবিক ছিল। যাব সঙ্গে ইউরোপের এত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, যিনি বৃটেন, শুধু বৃটেনই বা কেন, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশের বিভিন্ন আন্দোলনের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখতেন, যিনি ১৮৩২ সালেব ইংল্যাণ্ডের রিফর্ম আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁর সঙ্গে সমসাময়িক ইউবোপীয় ধর্ম-আন্দোলনের কোন সম্পর্ক থাকবে না—এ ভাবাই যায় না। ইউরোপীয় ডিইস্ট আন্দোলন অষ্টাদশ শতাব্দীতে সক্রিয় থাকলেও, বিগত শতকেও তা অব্যাহত ছিল। এমন কি উনিশ শতকের মধ্যভাগেও এটি ছিল একটি শক্তিশালী আন্দোলন। ১৮৪০ সালে চতুর্থ ফ্রেডরিখ উইলিয়ামসের রাজত্বকালে জার্মানীতে প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মমত, পিইটিজম (peitism) জোরদার হয়ে ওঠার পরও, ধর্মবিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা

ইউরোপীয় ধর্ম আন্দোলনের উপর রামমোহনের প্রভাব

সম্পর্কে এঙ্গেলস লিখেছেন, "তখনো দার্শনিক অস্ত্র নিয়েই সংগ্রাম চলেছে, কিন্তু তা আর অমূর্ত দার্শনিক আদর্শের জন্য নয়। সরাসরি সাবেকী ধর্ম ও সমসাময়িক রাষ্ট্র উচ্ছেদের কথাই উঠল। Deutsche Jahrbucher-এ এখনো ব্যবহারিক লক্ষ্যের কথাটা দার্শনিক ছদ্মবেশে উপস্থাপিত হলেও ১৮৪২ সালের Rheinische Zeitung-এ তরুণ হেগেলবাদী প্রচার সরাসরি উদীয়মান র‍্যাডিকেল বুর্জোয়ার দর্শন হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করল, **দার্শনিক আলখাল্লাটা ব্যবহৃত হত কেবল সেন্সরকে ছলনা করার জন্য।**

"**সে সময়ে কিন্তু** রাজনীতির ক্ষেত্র নেহাতই কণ্টকিত, তাই প্রধান সংগ্রাম ধর্মের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হল। অবশ্য এ সংগ্রাম পরোক্ষভাবে রাজনৈতিকও ছিল, বিশেষ করে ১৮৭০ থেকে।" ৭৭ (বড় হরফ আমাদের)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে সমস্ত ইউরোপীয় ধর্ম-বিরোধী আন্দোলন সক্রিয় ছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল *Unitarianism* বা একেশ্বরবাদী আন্দোলন। যদিও খৃষ্টধর্মে নানা ধরনের একেশ্বরবাদী চিন্তা বিক্ষিপ্তভাবে ষোড়শ শতাব্দী থেকেই দেখতে পাওয়া যায় এবং *Unitarius* শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৬০০ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে একটি সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত চিন্তাধারা হিসাবে একেশ্বরবাদ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। এই নব-একেশ্বরবাদী আন্দোলনের দার্শনিক ও সংগঠক হিসাবে যাঁর ভূমিকা সবাধিক, তিনি বস্তুবাদী দার্শনিক প্রিস্টলি ভিন্ন অন্য কেউ নন। প্রিস্টলি তাঁর '*Doctrine of Philosophical Necessity Illustrated*'—গ্রন্থে ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন যে, তাঁর মতবাদ 'ঈশ্বরের প্রতি গভীর নম্রতা, ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সর্বস্ব সমর্পণ ও ভগবদ দয়া ও যত্নে নিঃসর্ত প্রত্যয়'১৫ সৃষ্টি করবে। বস্তুবাদী প্রিস্টলি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নিলেও ডিইস্টদের মতই ধর্মে ঈশ্বরের একটিমাত্র সত্তা ভিন্ন অন্য কিছু মেনে নেননি। প্রিস্টলিরই অন্যতম সহযোগী থিওফিলাস লিণ্ডসের (১৭২৩-১৮০৮) উদ্যোগে ইংল্যাণ্ডে একেশ্বরবাদী ভজনালয় স্থাপিত হল ১৭৭৪ সালে। আর এইটিই ছিল ইংল্যাণ্ডে একেশ্বরবাদীদের প্রথম সংগঠিত প্রচেষ্টা। অবশ্য ১৭৮৯ সালে এই আন্দোলনে টমাস বেলশামের (১৭৫০-১৮২৯) যোগদানের পর এটি ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রিস্টলি, লিণ্ডসে ও বেলশামের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল '*Unitarian Society for promoting*

*Christian Knowledge and the Practice of Virtue and Distribution of Books*' ( ১৭৯১ )।১৭৬ উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশে যে বিভিন্ন একেশ্বরবাদী সংগঠন গড়ে উঠেছিল, সেগুলিকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে ১৮২৫ সালে গঠন করা হল '*British and Foreign Unitarian Association*'। এই সময় ইংল্যাণ্ডে যে একেশ্বরবাদী চিন্তাধারা প্রবর্তিত হল, তার বনিয়াদ প্রধানতঃ প্রস্তুত করেছিলেন প্রিস্টলি ও বেলশাম। বস্তুবাদী প্রিস্টলির প্রভাবের ফলে এই নবচিন্তাধারায় খৃষ্ট ধর্মে প্রচলিত যিশু-খৃষ্টের 'ত্রিরূপ' বা 'Trinity'র কোন স্থান ছিল না। তৎকালীন একেশ্বর-বাদীরা যে কেবল যীশুর একটিমাত্র সত্তাতেই বিশ্বাসী ছিলেন তাই নয়, তাঁরা এমন কি যীশুকে একজন সাধারণ মানুষের বেশী স্থান দেন নি। তাই তাঁদের চিন্তাধারা অনুযায়ী যীশু "সব দিক থেকেই অন্যান্য মানুষের মত গঠিত এবং একইরকম ভঙ্গুরতা, অজ্ঞতা, সংস্কার ও নৈতিক দুর্বলতার অধীন।"১৭৭

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এ বিষয়ে তৎকালীন একেশ্ববাদী ও ডিইস্টদের চিন্তাধারার মধ্যে গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দু'একটি বিষয় ভিন্ন একেশ্বরবাদীরা মোটামুটিভাবে ডিইস্ট দর্শনই গ্রহণ করেছিলেন। বলা যেতে পারে উনবিংশ শতাব্দীর একেশ্বরবাদীরা হলেন ডিইস্টদেরই উত্তরসাধক এবং একেশ্ববাদ হল ডিইজমেরই এক বিশেষ রূপ। শুধু ইংল্যাণ্ডেই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এ সময় ডিইজম ও একেশ্ববাদের দ্রুত প্রসার ঘটছিল। উনবিংশ শতকের শুরুতে মার্কিন ডিইস্ট ও একেশ্বরবাদী আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে মার্কিন ইতিহাসে বলা হয়েছে, "যে সব শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিরা ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের জীবনাযাত্রার ধরন অনুসরণ করতেন তাদের মধ্যে যদিও ডিইজম দ্রুত প্রবেশ করেছিল এবং তা কলেজের অধ্যাপক সম্প্রদায় ও ছাত্রদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এটা খুব অল্প পরিমাণেই জনসাধারণকে স্পর্শ করতে পেরেছিল। ক্যালভীয় নয়া ইংল্যাণ্ডে দীর্ঘ-দিনব্যাপী কোন কোন সক্ষম যাজকদের মধ্যে পুরনো মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। ডিইজম তাতে সাহায্যের হাত প্রসারিত করল এবং ফলে এই শতাব্দীর শুরুতেই একেশ্বরবাদের গুরুত্বপুর্ণ ও দুর্দান্ত প্রসার ঘটেছিল। একজন একেশ্বরবাদী, হেনরি ওয়্যার ১৮০৫ সালে

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মশাস্ত্রের 'হোলিস' অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হওয়ার পর ক্যাঁলভাপন্থীরা ১৮০৮ সালে হ্যাণ্ডওভারে তাদের নিজস্ব একটা ধর্মীয় শিক্ষালয় স্থাপন করে। সেই সময় থেকে ১৮২৫ সালে আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এই দুই দার্শনিক মতবাদের মধ্যে সংগ্রাম ছিল নিরন্তর।"১৭৮

যে সময় ইউরোপে খৃষ্ট ধর্মে প্রচলিত অলৌকিক কাহিনীর অন্তঃসার-শূন্যতার স্বরূপ উন্মোচন ও তার পরিবর্তে আদি খৃষ্ট ধর্মের প্রচারের প্রচেষ্টা চলছিল, ঠিক সেই সময়ই রামমোহন যীশু প্রণীত ধর্মের সারবস্তু প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করলেন, 'যীশুর হিতোপদেশ'। প্রচলিত খৃষ্টীয় পুরাকথা যে কেবলমাত্র আজগুবী গল্পের সংকলন এবং সেকারণেই সেগুলি যে কোন বিবেকবান মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, তা উল্লেখ করে রামমোহন ১৮২০ সালে এই পুস্তকের ভূমিকায় লিখলেন, "আমি অনুভব করলাম যে নিউ টেষ্টামেণ্টের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয় থেকে পুস্তকটির নৈতিক ঈশ্বরাজ্ঞাগুলি পৃথক করলে এই ঈশ্বরাজ্ঞাগুলি বিভিন্ন বৃত্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধির বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের হৃদয় ও মানসিকতার উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে আকাঙ্খিত ফল উৎপাদন করতে পারে। কারণ পুস্তকটির ঐতিহাসিক ও অন্য কোন কোন অংশ স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি ও খৃষ্টান-বিরোধীদের সন্দেহ ও বিতর্কের বিষয় হতে বাধ্য, বিশেষ করে অলৌকিক সম্পর্কগুলি, যা অবশ্য এশিয়ার অধিবাসীদের কাছে হস্তান্তরিত আজগুবী গল্পের তুলনায় অনেক কম বিস্ময়কর। ফলে এক্ষেত্রে সর্বাধিক সমুচিত কাজ হবে এগুলো সম্পর্কে কম গুরুত্ব দেওয়া।"১৭৯ স্বভাবতঃ রামমোহনের এই প্রচেষ্টা এদেশীয় খৃষ্টান যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং গোড়া পাদ্রীরা তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। পাদ্রীদের সমালোচনার জবাবে ১৮২০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' নামে এক মিশনারী পত্রিকায় ডিইস্ট দর্শনের প্রতিধ্বনি করে রামমোহন সমালোচনার জবাবে বললেন, "আমি শুধু এই আক্ষেপ করি যে যীশুর অনুজ্ঞা পালন থেকে তাঁর প্রকৃতি অনুযায়ী অনুসন্ধানের দিকে যীশুর অনুগামীদের আরও গভীর মনোযোগ দেওয়া উচিৎ ছিল,...১৮০

'যীশুর হিতোপদেশ' ভারতীয় গোঁড়া পাদ্রীদের বিরাগভাজন হলেও,

ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার প্রগতিশীল মহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়। বিশেষতঃ একেশ্বরবাদী ও অন্যান্য ধর্মসংস্কারকরা বইটির ওপর অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই কারণে লণ্ডনের ইউনিটেরিয়ান এ্যাসোসিয়েশন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ১৮২৩ সালে রামমোহন লিখিত 'যীশুর হিতোপদেশ' ও 'দুটি আবেদন' সংকলন আকারে প্রকাশ কবেন এবং এ্যাসোসিযেশনের পক্ষে উক্ত সংকলনের ভূমিকা লেখেন টমাস বীস। শুধু ইংল্যাণ্ডেই নয়, মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রেও একেশ্বরবাদীবা রামমোহনের এই পুস্তকের প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করেন। ফলে 'যীশুব হিতোপদেশ' ও 'আবেদন'গুলি এঁদেরই উদ্যোগে ন্যু ইয়র্ক (১৮২৫), বোস্টন (১৮২৮) এবং ফিলাডেলফিযা (আমেবিকান ইউনিটেরিয়ান এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক ১৮২৮ সালে প্রকাশিত) থেকে প্রকাশিত হয়। লণ্ডনস্থ ইউনিটেরিয়ান এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক সংকলনটি প্রকাশিত হওয়ার পর রামমোহন কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রীসকে ১৮২৪ সালের ৪ঠা জুন যে পত্র দেন, তার একজায়গায় বললেন, "ইংল্যাণ্ড ও আমেবিকায় সত্যের বেশ কিছু বন্ধু যে খৃষ্টের আদিম বিশুদ্ধ সরল ও বাস্তব ধর্মকে হিদেনীয় মতবাদ ও অবিশ্বাস্য ধারণা, যা ক্রমে ক্রমে রোমান শক্তির আমলে প্রবিষ্ট হয়েছে, তার থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন দেখে আমি আনন্দ প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। ধর্মীয় সংস্কারেব প্রথম ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনার জন্য, মানবিক ধর্মবিশ্বাস থেকে স্বর্গীয় কর্তৃত্বকে এবং হাস্যকর বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ থেকে পরমঙ্গলের কাজকে পৃথক করার উপদেশ দানের জন্য যে লুথার ও অন্যান্যদের কাছে ধর্ম-জগৎ ঋণী, আমি আন্তরিকভাবেই কামনা করি যে পূর্বোক্ত ভদ্রমহোদয়গণের সাফল্য যেন তাঁদের মতই মহান (যদি না মহত্তর) হয়।"[১৮১]

উল্লিখিত এই পত্রে সুস্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে যে রামমোহনের ধর্মীয় মতের ভিত্তি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ছিল না। তাই ডিইস্টরা যে প্রাকৃতিক ধর্মের প্রচার করতেন, রামমোহন সেই প্রাকৃতিক ধর্মেই আস্থা স্থাপন কবেছেন। যখন সত্যের বেশ কিছু মিত্র অবাস্তব, বর্বর ধর্মান্ধতা থেকে শুদ্ধ, সরল, খৃষ্টের বাস্তব ধর্মকে উদ্ধারের চেষ্টায় নিযুক্ত হয়েছেন বলে রামমোহন উল্লাস প্রকাশ করলেন, তখন যেন আমরা একজন ডিইস্টের কণ্ঠস্বরই শুনতে পাই। কোন্ খৃষ্ট ধর্মের উদ্ধারের প্রচেষ্টাকে রামমোহন স্বাগত জানালেন? যে খৃষ্ট ধর্ম

আদি, যার সম্পর্কেই জর্জ টমসন বলেছেন প্রগতিশীল ধর্ম। আর কারা এই খৃষ্ট ধর্মকে কুসংস্কারমুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন? তাঁরা হলেন অষ্টাদশ শতকের ডিইস্টদেরই উত্তরসূরী, প্রিস্টলি পরিচালিত একেশ্বরবাদীগণ। রামমোহনের চিন্তাধারায় এই ডিইস্ট দর্শনের পরিচয় পেয়েই ইংরেজ ও মার্কিন একেশ্বরবাদীরা তাঁর পুস্তক প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অবশ্য লণ্ডনস্থ ইউনিটেরিয়ান এ্যাসোসিয়েশন শুধুমাত্র তাঁর বই প্রকাশ করেই নীরব ছিল না। ইংরেজ একেশ্বরবাদীরা রামমোহনকে এই সমিতির সদস্যরূপে গ্রহণ করে শ্রদ্ধাও জানিয়েছিলেন। রামমোহনের সম্মানার্থে এই সমিতি যে বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করে, সেই সভায় রামমোহন বললেন, "এমন কী কাজ করেছি যার জন্য এই আদর্শের প্রগতির কারণরূপে আমি গণ্য হতে পারি সে সম্পর্কে আমি অবহিত নই। কিন্তু আপনাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে বলতে পারি যে আমিও এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি এবং আপনাদের প্রায় সব মতবাদেই আমি আস্থা স্থাপন করি,.. "[১৮২]

রামমোহনের সমসাময়িক ইউরোপীয় ধর্মসংস্কার আন্দোলন, যা ছিল প্রধানতঃ ডিইস্ট চরিত্রের, তার সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বোঝার জন্য এই ঘটনাগুলিই যথেষ্ট। ওই ইউরোপীয় আন্দোলনের ওপর রামমোহনের প্রভাব যে কি পবিমাণ ছিল তাও এই ঘটনাগুলিই প্রমাণ করে। এমন কি যে টমাস বেলশাম ছিলেন ইংরেজ একেশ্বরবাদীদের প্রধান নেতা তিনিও রামমোহন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন[১৮৩] এবং তাঁব জীবিতাবস্থাতেই রামমোহনের সংকলনটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। শুধু ইংরেজ বা মার্কিন একেশ্বরবাদীদের দ্বারা রামমোহনের পুস্তক প্রকাশনা নয়, রামমোহন তৎকালীন ধর্ম-আন্দোলনের ওপর কি অপরিসীম প্রভাব বিস্তাব করেছিলেন তার আরও একটি নজির হল 'বৃটিশ এ্যাণ্ড ফরেন ইউনিটেরিয়ান এ্যাসোসিয়েশন।' বহু ঐতিহাসিকের মতেই এই সংস্থাটির স্থাপনার পেছনে প্রধান উদ্যোগ ছিল রামমোহনের এবং তাঁর প্রভাবেই সংস্থাটির নামকরণের ক্ষেত্রে 'খৃষ্টান' শব্দটি বর্জিত হয় এবং 'ফরেন' শব্দটি সংযোজিত হয়।[১৮৪] বলা বাহুল্য, এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৃটেন ও অন্যান্য দেশের সর্বপ্রকার একেশ্বরবাদী, যাঁরা হলেন বস্তুতঃ ডিইস্ট দর্শনের অনুগামী, তাঁদের ঐক্যবদ্ধ করে এক শক্তিশালী সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত

করা। সুতরাং রামমোহন প্রচারিত ধর্ম-মতের অন্তঃসার ও বাস্তব কর্মকাণ্ডের প্রকৃতি বিচার করলে আমাদের এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে রামমোহন ছিলেন একজন যথার্থ ডিইস্ট, যা অবশ্য তৎকালীন অগ্রণী ব্যক্তিদের কাছেও অজ্ঞাত ছিল না। তাই দেখা যায় যে তাঁর জীবদ্দশাতেই রামমোহনকে ইংল্যাণ্ডের 'মিশনারি রেজিষ্টার' "এক আত্মপ্রত্যয়ী ডিইষ্ট"[১৮৫] এবং 'মান্থলি রিপোজিটরি' একজন "হিন্দু ডিইষ্ট"[১৮৬] আখ্যা দিতে সংকোচ বোধ করেনি।

**ডিইজমের প্রচারক বস্তুবাদী রামমোহন**

১৮৩২ সালে রামমোহন গর্ডন নামক এক ব্যক্তিকে লেখেন, "আমার সমস্ত বিতর্কের ক্ষেত্রে আমি যে ভিত্তিটা গ্রহণ করেছিলাম তা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধিতা নয়, বরং তা ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিকৃতির বিরুদ্ধাচরণ।"[১৮৭]

বহু বুর্জোয়া তাত্ত্বিক, এমন কি যাঁরা রামমোহনের মহিমা কীর্তন করে থাকেন তাঁরাও, রামমোহন প্রচারিত ধর্মমতের ডিইস্ট চরিত্র সম্পর্কে অবহিত না হওয়ার ফলে এই পত্রটি থেকে প্রমাণ করতে চান যে রামমোহন আসলে ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই সমর্থক। আমরা আগেই লক্ষ করেছি যে রামমোহন প্রকৃতপক্ষে ছিলেন একজন ডিইস্ট। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে রামমোহন ডিইস্ট হলেও, তিনি একজন ভারতীয় হিসাবেই ডিইস্ট আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। তাই তিনি ইউরোপীয় ডিইস্টদের মত আদি খৃষ্ট ধর্মের উদ্ধারের চেষ্টা না করে মনোযোগ দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের আদিধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংস্কারে। রামমোহন যদিও মাত্র ষোলো বছর বয়সেই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে পুস্তক রচনা করেন, কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে তার প্রকৃত ধারণা গড়ে উঠতে যথেষ্ট সময় নেয়। রামমোহনের ধর্মমত কি ভাবে গড়ে উঠল, তা জন ডিগ্‌বিকে লিখিত তাঁর একটি পত্রে দেখতে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, রামমোহন এই জন ডিগ্‌বির অধীনেই ১৮০৫-১৪ সাল পর্যন্ত মুন্সী পদে চাকরী করতেন। ১৮১৪ সালে ডিগ্‌বির ভারত ত্যাগের পর রামমোহনের ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপ কি ভাবে পরিচালিত হয়েছিল তা জানিয়ে রামমোহন এই পত্রে (পত্রটি তারিখবিহীন, তবে অনুমান করা যায় এটি ১৮২৭ সালের কোন এক সময় লিখিত) লিখলেন, "ধর্মীয় সত্য সম্পর্কে আমার সুদীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার ফলস্বরূপ আমি দেখতে পেলাম যে আমার জানা অন্য ধর্মমতের তুলনায় খৃষ্টীয় মতবাদ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে নৈতিক

দিক থেকে অনেক বেশী সঙ্গত ও ব্যবহারগত দিক থেকে বেশী উপযোগী। আমি এও দেখলাম যে হিন্দুরা সাধারণভাবে আচার-আচরণ পালনের ক্ষেত্রে ও গার্হস্থ্য কার্যাবলীতে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় অনেক বেশী কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত। ফলে ঐহিক ও পারত্রিক জগতে তাদের সুখী ও দুর্দশামুক্ত করার উদ্দেশ্যে পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে তাদেব উৎকট বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র মৌখিক যুক্তিই প্রয়োগ করি নি। বরং ঈশ্বরের ঐক্য ও পৌত্তলিকতার অযৌক্তিকতা যে তাদের শাস্ত্রাবলীতেই সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়েছে তা প্রমাণসিদ্ধ করার জন্য আমি তাদের সর্বাপেক্ষা প্রণম্য ধর্মগ্রন্থ, যেমন বেদান্ত এবং বেদের কয়েকটি অধ্যায় বাংলা ও হিন্দুস্থানী ভাষায় অনুবাদ করেছি। অবশ্য আমার এ কাজের শুরুতে আমি তাদের স্বার্থান্বেষী নেতৃবর্গ, ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে সব থেকে বেশী বিরোধিতাব সম্মুখীন হই এবং আমার নিকটতম আত্মীয়বর্গ দ্বারাও পরিত্যক্ত হয়েছিলাম। ফলে আমি খুব বিষন্ন হয়ে পড়ি; সেই সংকট মুহূর্তে একমাত্র যে সুখ আমি লাভ করেছিলাম তা হল ইউরোপীয়, বিশেষ করে স্কটল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের সুহৃদদের সান্ত্বনা ও যুক্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনা।"[১৮৮]

এই পত্রে দেখা যাচ্ছে যে ধর্ম সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে রামমোহনকে দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা চালাতে হয়েছিল এবং সেই গবেষণার ফলে তাঁর এ উপলব্ধি হয় যে প্রচলিত অন্য ধর্মের তুলনায় যীশু খৃস্টের মতবাদ নৈতিকতার দিক থেকে বেশী সঙ্গত এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে বেশী উপযোগী। অর্থাৎ রামমোহনের কাছে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে খৃস্ট ধর্মই শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছিল। রামমোহন যখন এও দেখলেন যে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর তুলনায় হিন্দুরা অনেক বেশী কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত, তখন তিনি কি করলেন? তিনি হিন্দুদের সঙ্গে কেবলমাত্র তর্কযুদ্ধে ব্যস্ত না থেকে, হিন্দুদের প্রণম্য ধর্মগ্রন্থ বেদান্তের তর্জমা বাংলা ও হিন্দী ভাষাতে প্রকাশ করলেন। রামমোহন হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রের সাহায্যেই হিন্দুদের বহু-ঈশ্বরবাদ, পৌত্তলিকতা প্রভৃতির অসারতা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। অর্থাৎ এই পত্রে অতি সুস্পষ্ট, রামমোহন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আদি-শাস্ত্রসমূহের যে তর্জমা প্রচার করেছিলেন, তা তিনি সেই ধর্মশাস্ত্রগুলিতে বিশ্বাস করতেন বলে নয়। তিনি তৎকালীন হিন্দু ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে

বেদ-বেদান্তকে ব্যবহার করেছিলেন শুধুমাত্র সব থেকে সহজলভ্য ও কার্যকরী হাতিয়ার হিসাবে। রামমোহন যে যীশুর মতবাদকে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তার থেকেই ত বোঝা যায় যে তিনি নিজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান তাঁকে বেদ-বেদান্তের সাহায্য নিতে প্রবৃত্ত করেছিল। কারণ তাঁর বাস্তবতা-বোধ তাঁকে সঠিকভাবে বুঝতে সমর্থ করেছিল যে হিন্দুদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ধর্মের ছদ্মবেশেই করতে হবে; এবং সে ছদ্মবেশটি অন্য কোন ধর্ম হলে চলবে না, তাকে হতে হবে হিন্দু সমাজের ব্যাপক সদস্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য। সে ধর্মটি আদি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ভিন্ন অন্য কিছু হতে পাবে না। এই কারণেই ডিইস্ট রামমোহন যীশুর মতবাদকে হিন্দু ধর্ম থেকে বেশী গ্রহণযোগ্য মনে করলেও, বাইবেলের অনুবাদ না করে বেদ-বেদান্তের অনুবাদ প্রচার করেছিলেন।

বেদ-বেদান্তকে ভারতীয়দের কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার এক সহজলভ্য হাতিয়াররূপে ব্যবহার করলেও, রামমোহন নীতিগতভাবে ছাত্রদের বেদান্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। যে বেদ-বেদান্ত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তিনি বেদান্ত-কলেজও স্থাপন করেছিলেন, সেই বেদ-বেদান্ত সম্বন্ধে রামমোহনের প্রকৃত ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর পূর্বোল্লিখিত আমহার্স্টকে লিখিত পত্রে, যেখানে সংস্কৃত প্রথায় শিক্ষাদানের বিরোধিতা করে তিনি বললেন, "বেদান্ত মতবাদ দ্বারা যুবকরাও সমাজের উন্নততর সদস্য হতে পারবে না। কারণ বেদান্ত তাদের এই বিশ্বাস করতে **শিক্ষা দেয় যে, সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুর কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নেই** এবং যেহেতু পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সবই অনিত্য, সেহেতু তাঁরা কোন প্রকৃত অনুরাগ লাভ করার যোগ্য হতে পারেন না; এবং ফলে যত তাড়াতাড়ি তাঁদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ও এই জগৎ ত্যাগ করা যায়, ততই মঙ্গল।"[১৮৯] (বড় হরফ আমাদের) কোন্ শ্রেণীর দার্শনিক বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্বে বিশ্বাসী? বিষয়গত বা বিষয়ীগত—সব ধরনের ভাববাদীরাই যে এ প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তর দেন তা সর্বজনবিদিত। একমাত্র বস্তুবাদীরাই স্বীকার করেন যে সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুরই প্রকৃত অস্তিত্ব আছে। তাই যখন রামমোহন বেদান্ত-মতবাদ সম্পর্কে তাঁর বিরোধিতার কারণ দর্শিয়ে বলেন

যে, বেদান্ত দর্শন ক্ষতিকারক কারণ এই দর্শন শিক্ষা দেয়—'সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুর কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নেই'; তখন শুধুমাত্র তাঁর বেদান্ত-বিরোধী মনোভাবই নয়, আমরা একজন প্রকৃত বস্তুবাদী দার্শনিকেরই কণ্ঠস্বরই শুনতে পাই। বস্তুবাদের একজন দৃঢ় সমর্থক ভিন্ন আর কার কণ্ঠে এই বলিষ্ঠ ঘোষণা শোনা যেতে পারে?

বস্তুবাদের স্বপক্ষে রামমোহনের এটি কোন বিচ্ছিন্ন উক্তি নয়। যখন তিনি আধুনিক যুগের প্রথম বস্তুবাদী লর্ড বেকনের মতবাদকে সমাজের অগ্রগতির পথ বলে বলে বর্ণনা করেন তখনও আমরা সেই বস্তুবাদী রামমোহনেরই পরিচয় পাই। রামমোহনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হল এই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। তবে যেহেতু তিনি একজন আদর্শ ডিইস্ট, তাই তাঁর বস্তুবাদ ছিল ধর্মের আবরণে আবৃত। এই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন বলেই তিনি ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে ব্যক্তিগত ভাবাবেগ ও কল্পনাপ্রবন দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা বিচলিত হন নি। তার পরিবর্তে তিনি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ভারতের পরাধীনতার বাস্তব কারণ অনুসন্ধানে এবং তৎকালীন ভারতীয় সমাজের বস্তুবাদী পর্যালোচনায়। আর এই বস্তুবাদী বিশ্লেষণের ফলেই কার্ল মার্কসের প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে জন্মেও রামমোহনের পক্ষে স্বাধীনভাবে ভারত বিষয়ে মার্কসের অনুরূপ সিদ্ধান্ত করা সম্ভবপর হয়েছিল। সঠিক বাস্তব বিশ্লেষণের এই ক্ষমতাই রামমোহনকে প্রগতিশীল ব্যক্তিতে উত্তীর্ণ করেছিল। তাই অবাধ প্রতিযোগিতার দর্শনই যে আধুনিকতম দৃষ্টিভঙ্গী এবং বুর্জোয়া শ্রেণীই যে উদীয়মান ও যথার্থ প্রগতিশীল শ্রেণী তা রামমোহনের চিনে নিতে কোন ভুল হয় নি। সমাজের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে রামমোহনের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীই তাকে অনুধাবন করতে সাহায্য করেছিল যে, ভারতীয় সামন্তশ্রেণীসহ ধনতান্ত্রিক বিকাশের পরিপন্থী সব শ্রেণী ও দর্শনই হল সমগ্র মানবজগতের অগ্রগতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। এই প্রগতিশীল বুর্জোয়া দর্শনই রামমোহনকে ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা অবলম্বন করতে প্রবুদ্ধ করেছিল। তবে ভারতীয় সমাজের বাস্তব বিশ্লেষণ তাঁকে এই শিক্ষাই দিয়েছিল যে, স্বাধীনভাবে ধনতান্ত্রিক বিকাশের জন্য ভারতীয় সমাজ তখনও পরিপক্ক হয়ে ওঠে নি। একারণে ভারতীয় জনগণের অবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ও ভারতের

স্বাধীনতা অর্জনের বৈষয়িক ভিত্তি স্থাপন করার উদ্দেশ্যে রামমোহনকে আহ্বান জানাতে হয়েছিল প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের। ভারতে এই ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন সংস্কারকামী পথ। সে সময় ভারতে বিপ্লবী পরিবর্তনের বাস্তব ভিত্তিই যে অনুপস্থিত, সে সম্বন্ধে তাঁর পূর্ণ সচেতনতা ছিল। ফলে তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিল—বিবর্তনুগত পরিবর্তনের পথই তৎকালীন ভারতে একমাত্র পথ, যা পরবর্তীকালে প্রস্তুত করবে বিপ্লবী পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র। রামমোহনের এই সংস্কারকামী কর্মসূচীরই অন্তর্ভুক্ত হল—পুঁজিবাদী ব্যবসার প্রচলন, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিকাশ, সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের শিকল থেকে নারীমুক্তি, এবং সর্বোপরি প্রাত্যহিক জীবন থেকে ভারতীয় স্বৈরাচারের আদর্শগত ভিত্তি—কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে নির্বাসন দেওয়া। সমাজের বাস্তব অবস্থাই তাঁকে সতর্ক করেছিল—নাস্তিকতা প্রচার নিষ্ফল হতে বাধ্য ; হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করতে হবে ধর্মেরই ছদ্মবেশে। তাই তিনি ভারতীয়দের ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রচার করেছিলেন একেশ্বরবাদ, যা ছিল আবার সর্ব ধর্ম ও সর্ব জাতির মিলনের মাধ্যমে সর্বভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এক বাস্তব কর্মসূচী। প্রকৃতপক্ষে রামমোহন হলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় এনলাইটেনারদেব এক যোগ্য উত্তরসূরী। এজন্য তিনি যেমন সামন্ততন্ত্রের প্রতিটি বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে এক অবিচল শত্রু ছিলেন, তেমনি ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের স্বার্থে বৃটিশ শাসনকে শর্তাধীন সমর্থন জানালেও ভারতীয় জনগণের ওপর যে-কোন অন্যায় বৃটিশ অত্যাচারের তিনি ছিলেন কঠোর বিরুদ্ধবাদী। অষ্টাদশ শতাব্দীর এনলাইটেনারদের প্রভাবেই রামমোহন ভারতকে এক অখণ্ড ইউরোপীয় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। যে বুর্জোয়া চিন্তাধারা রামমোহনকে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের এক আপোষহীন শত্রুতে পরিণত করেছিল, সেই চিন্তাধারাই তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পথই হল ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র পথ। আর সে আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা যে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ছাড়া অন্য কোন পথে অর্জিত হতে পারে না, তা তাঁর কাছে সুস্পষ্ট ছিল। অষ্টাদশ শতকের এনলাইটেনারদের মত রামমোহনও ছিলেন যথার্থ মানবপ্রেমিক। তাই শুধু নিজ

দেশের শোষিত জনগণের অবস্থাই তাঁকে পীড়া দিত না, বিশ্বের সমস্ত মুক্তিকামী মানুষের ব্যর্থতাতেই তিনি বিচলিত হতেন। এই মানব মুক্তির ইচ্ছা থেকেই তিনি যেমন প্রকাশ্যে অঙ্গীকার করেন যে, রিফর্ম বিলের পরাজয় ঘটলে তিনি বৃটেনের সংস্রব ত্যাগ করবেন, তেমনিই রুশিয়া, প্রুশিয়া—অষ্ট্রিয়া-সার্ডিনিয়া-নেপল্‌সের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রের যৌথ উদ্যোগে যখন নেপল্‌সবাসীদের বিপ্লব পরাজিত হয় তখনও রামমোহন দুনিয়ার সমস্ত স্বৈবতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল চক্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। আমরা কি ভুলে যেতে পাবি নেপল্‌সের বিপ্লবী জনগণেব পরাজয়ের পর রামমোহনের সেই ঐতিহাসিক উক্তি—" · নেপল্‌সবাসীদের কারণকে আমার কাবণ বলে মনে করি, তাদের শত্রুকে আমাব শত্রু বলে মনে করি। মানব-মুক্তির শত্রুবা ও স্বৈরতন্ত্রেব মিত্রেবা কখনই সফল হতে পারে নি, আর কোনদিন তা পারবেও না"।[১২০] দুনিয়ার সমস্ত প্রতিক্রিয়াপন্থী চিন্তাধারার এক আপোষহীন শত্রু ভিন্ন ইতিহাসে কাব কণ্ঠে মানবমুক্তির স্বপক্ষে এ ধরনের উক্তি শোনা গেছে? বৃটিশ চাটুকারিতার জন্য নয়, এই মানবতাবাদী ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারার জন্যই রামমোহন বিশ্বের প্রগতিশীল মহলে সমাদৃত। তাঁব এই উদার আন্তর্জাতিকতাবাদেব পরিচয় পেয়েই সেই ১৮১২ সালে স্পেনেব বিপ্লবী জনগণ রামমোহনকে সর্বাধিক 'উদার, মহৎ, জ্ঞানী ও নৈতিক উৎকর্ষসম্পন্ন ব্যক্তি'রূপে অভিহিত করে স্পেনের সংবিধান তাঁর নামে উৎসর্গ করেছিলেন। তাই রামমোহন যেমন গান্ধী চিত্রিত 'বামন'ও নন, তেমনি রমেশ মজুমদার চিত্রিত 'ঘুষখোর'ও নন। রামমোহন হলেন একজন মানবদরদী প্রকৃত বিপ্লবী আর তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারা ভারতে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। একই চবিত্রে আন্তর্জাতিকতাবাদ, স্বদেশপ্রেম ও বস্তুবাদের এমন বিচিত্র সমাবেশ ভাবতে বিরল। রামমোহন যথার্থই নবযুগের ভারতের পথিকৃৎ।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা ঃ প্রতিক্রিয়াপন্থী না প্রগতিপন্থী ?

যে বিদ্যাসাগরের গলা কেটে দ্বিতীয় পর্যায়ের মূর্তিভাঙার কাজ শুরু হয়েছিল, সেই ঈশ্বরচন্দ্র শর্মার একমাত্র পরিচয় নাকি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল ও ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলনকারী রূপে ; আর তাঁর সংস্কৃতি ছিল নাকি সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী সংস্কৃতি। ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কৃতি সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী চরিত্রের ছিল কি না, অথবা তিনি বৃটিশ শাসকবর্গ ও ভারতীয় সামন্তশ্রেণীর স্বার্থেই ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন কি না—সে বিচারের জন্য প্রয়োজন বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা ও বাস্তব কর্মসূচীর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ। কারণ বিদ্যা-সাগরের কর্মকাণ্ড প্রধানতঃ বিস্তৃত ছিল তৎকালীন বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে। এ প্রসঙ্গ আলোচনার আগে একবার বিদ্যাসাগরের সময়কালটি স্মরণ করা যেতে পারে। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম ১৮২০ ও মৃত্যু ১৮৯১ হলেও, বলা হয়, "তাঁর কর্মজীবন মোটামুটি ১৮৪৬ (সংস্কৃত কলেজে যোগদান) থেকে প্রায় ১৮৭৫ পর্যন্ত বিস্তৃত।"[১১] অর্থাৎ তাঁর কর্মজীবনের শেষ দিকে বৃটিশ ধনতন্ত্রের অবাধ প্রতিযোগিতা স্তর থেকে একচেটিয়া পুঁজিবাদে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটি সক্রিয় হয়ে উঠেছে ; বিশ্ব পুঁজিবাদ তখনও অবাধ প্রতিযোগিতা-স্তরের ; আর অবশেষে ১৮৭১ সালে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। লেনিন বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের শেষ দিকের আমলা-তন্ত্র ও সামরিকচক্রবিহীন ইংল্যাণ্ডকেও 'যে-কোন বিশুদ্ধ ধনতান্ত্রিক দেশের

**বিদ্যাসাগরের সময়কাল ও বৃটিশ ধনতন্ত্র**

আদর্শ বলেই মনে করতেন। "মার্কসের উদ্ধৃত বক্তব্যের বিশেষ করে দুটি জায়গা লক্ষ্য করা চিত্তাকর্ষক হবে। প্রথমতঃ তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত সীমাবদ্ধ রেখেছেন ইউরোপীয় ভূখণ্ডে। ১৮৭১ সালের ক্ষেত্রে এটা বোধগম্য, **তখন ইংলণ্ড ছিল বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী দেশের আদর্শ, কিন্তু সামরিক চক্র ছিল না, এবং বেশ খানিকটা মাত্রায় আমলাতন্ত্রও ছিল না।** সেইজন্যই মার্কস ইংলণ্ডকে বাদ দিয়েছেন, সেখানে তৈরী **রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে চূর্ণ করার প্রাথমিক সর্ত ছাড়াও** তখন বিপ্লব এমন কি গণবিপ্লব কল্পনা করা যেত ও সম্ভব ছিল।"[১২২] (বড় হরফ আমাদের)

ভারতীয় সমাজের আভ্যন্তরীণ কাঠামো, বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম, সমাজ বিকাশের পথে কি ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল এবং বৃটিশ পণ্য-অর্থনীতি ঐ চিরায়ত ভারতীয় সমাজের ভাঙনের ক্ষেত্রে কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, সে বিষয়ে আমরা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। রামমোহন যে অচলায়তন সমাজ, ধর্মীয় লোকাচার, অন্ধতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূত্রপাত করেন, বলা যায় বিদ্যাসাগর-সময়েও তার বিশেষ হেরফের হয় নি। বিদ্যাসাগর শিক্ষাক্ষেত্রে কোন্ পথ অবলম্বন করলেন—সেটি বিচারের আগে প্রাক্-বিদ্যাসাগর ভারতবর্ষে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষা-পদ্ধতির দু'একটি নমুনা দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সকলেই জানেন, ভারতীয় সমাজের চিরাচরিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল চতুষ্পাঠী, টোল, পাঠশালা, মাদ্রাসা, মকতব প্রভৃতি। টোল-চতুষ্পাঠী অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত হিন্দুদের জন্য, আর পাঠশালা নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষাদানের বিষয়টি যে কিভাবে পালিত হত, তা আমাদের কল্পনায় আনাও কষ্টকর। তাই এ সম্পর্কে উনবিংশ শতকের একজন ব্যক্তির বর্ণনা শোনা যাক্ঃ "পাঠশালে পাঠনার রীতি ছিল এই যে, বালকেরা প্রথমে মাটিতে খড়ি দিয়া বর্ণ পরিচয় করিত; তৎপরে তালপত্রে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জন বর্ণ, যুক্ত বর্ণ, শটিকা, কড়াকিয়া, বুড়িকিয়া প্রভৃতি লিখিত; তৎপরে তালপত্র হইতে কদলীপত্রে উন্নীত হইত; তখন তেরিজ, জমা-খরচ, শুভঙ্করী, কাঠাকালী, বিঘাকালী প্রভৃতি শিখিত; সর্বশেষ কাগজে উন্নীত হইয়া চিঠি-পত্র লিখিতে শিখিত।"[১২৩] পাঠশালায় কি ধরনের পাঠ্য-পুস্তক ছিল? "বালকেরা স্বীয় স্বীয় মাদুরে বসিয়া লিখিত। লিখিত এই

বাংলার চিরাচরিত শিক্ষালয়ের চরিত্র

জন্য বলিতেছি, তৎকালে **পাঠ্যগ্রন্থ বা পড়িবার রীতি ছিল না।**"[১২৪] ( বড় হরফ আমাদের )

এখনও ছাত্ররা দুষ্টুমি করে, মনে হয় তখনও করত। দুষ্টুমি করলে ছাত্রদের কি ধরনের শাস্তি দেওয়া হত? "১৮৩৪ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক, মিষ্টার উইলিয়াম এডামকে দেশীয় শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শনার্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি পাঠশালা সকলের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট একটি রিপোর্ট প্রেরণ করেন। তাহাতে প্রায় চতুর্দশ প্রকার সাজা দিবার প্রণালীর উল্লেখ দেখা যায়। তাহার অনেকগুলি বিবরণ শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বালক মাটিতে বসিয়া নিজের একখানা পা নিজের স্কন্ধে চাপাইয়া থাকিবে; বা নিজের উরুর তল দিয়া নিজের হাত চালাইয়া নিজের কান ধরিয়া থাকিবে; বা তাহার হাত পা বাঁধিয়া পশ্চাদ্দেশের বস্ত্র তুলিয়া জলবিছুটী দেওয়া হইবে, সে চুলকাইতে পারিবে না; বা একটা থলের মধ্যে একটা বিড়ালের সঙ্গে বালককে পুরিয়া মাটিতে গড়ান হইবে এবং বালক বিড়ালের নখর ও দংষ্ট্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।"[১২৫]

বৃটিশ রাজপুরুষদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৮০০ সালে কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা। স্বভাবতঃ এই কলেজে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার ছিল না। কলেজ কেন, আধুনিক স্কুল বলতেও কিছু কি ছিল? শেরবোর্ণ ( চিৎপুর রোড ), মার্টিন বাউল ( আমড়াতলা ), আরটুন পিট্রাস প্রমুখ ব্যক্তি পরিচালিত যে স্কুলগুলো ছিল, আধুনিক শিক্ষা ত দূরের কথা, তাতে কাজ চালানো গোছের ইংরেজীও শেখানো হত ব্যাকরণ ছাড়া। তৎকালীন এই স্কুলগুলোতে অনুসৃত ইংরেজী শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, "সে সময়ে যে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহার বিষযে কিছু বলা আবশ্যক। সে সময়ে বাক্য রচনা-প্রণালী বা ব্যাকরণ প্রভৃতি শিক্ষা দিবার দিকে দৃষ্টি ছিল না। কেবল ইংরাজী শব্দ ও তাহার অর্থ শিখাইবার দিকে প্রধানতঃ মনোযোগ দেওয়া হইত। যে যত অধিকসংখ্যক ইংরাজী শব্দ ও তাহার অর্থ কণ্ঠস্থ করিত, ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত বলিয়া তাহার তত খ্যাতি প্রতিপত্তি হইত। এরূপ শোনা যায় শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ সে সময়ে এই বলিয়া তাঁহাদের আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে সার্টিফিকেট দিতেন যে,

এ ব্যক্তি দুইশত বা তিনশত ইংরাজী শব্দ শিখিয়াছে। এই কারণে সে সময়ে কোন কোন বালক ইংরাজী অভিধান মুখস্থ করিত।”[১২৬]

১৮১৫ সালে শ্রীরামপুর কলেজের স্থাপনা হলেও সেখানে একমাত্র খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীরাই শিক্ষা গ্রহণ করতেন। দেশীয়দের শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রথম কলেজ, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ১৮১৭ সালে। ভারতীয় আলোকপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবী ও কিছু বিদ্যোৎসাহী ইংরেজদের প্রচেষ্টায় প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও, বৃটিশ সরকার ভারতে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের বিষয়ে তখনও কোনরকম আগ্রহ প্রদর্শন করেননি। ফলে সে সময় স্কুল শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। ১৮১৮ সালে হেয়ার কর্তৃক ‘স্কুল সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠা সর্বপ্রথম স্কুল শিক্ষার সূচনা করে। এই সময় হেয়ার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঠনঠনিয়া, কালীতলা, আড়পুলী প্রভৃতি স্থানে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা আগেই লক্ষ করেছি যে, বৃটিশ সরকার এদেশীয় শিক্ষা সহ ভারতবর্ষের প্রতিটি দেশজ সংস্কৃতি রক্ষা করার বিষয়ে বদ্ধপরিকর ছিল। এই চিন্তাধারা থেকেই তারা বারাণসী সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সরকারী অর্থ মঞ্জুর করে। কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ গঠনের সিদ্ধান্তও বৃটিশ সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচায়ক। আর এই সরকারী শিক্ষানীতির প্রতিবাদ করেই রামমোহন ১৮২৩ সালে আমহার্স্টকে তার ঐতিহাসিক পত্রটি লেখেন। অবশ্য এর পরও সরকারী শিক্ষানীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। ১৮৩৫ সালে মেকলের শিক্ষাসংক্রান্ত মিনিট্‌স্‌কেই বলা যেতে পারে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে প্রথম সরকারী সিদ্ধান্ত। এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন সম্ভব কিনা—সে অনুসন্ধানের দায়িত্ব মেকলেকে দেওয়া হলে, ১৮৩৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী মেকলে তাঁর সুপারিশে মন্তব্য করলেন, “আমি যা বলেছি তা এক কথায় দাঁড়ায়ঃ আমি মনে করি যে আমরা কোন প্রকার ব্যক্ত অথবা অন্তর্নিহিত শপথের বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ নই, আমাদের তহবিল পছন্দমত কাজে নিয়োগ করার অধিকার আমাদের আছে; যে শিক্ষা সব থেকে বেশী মূল্যবান সেই শিক্ষাতেই আমাদের এই তহবিল ব্যয় করা উচিত; সংস্কৃত বা আরবী থেকে ইংরাজী জানার মূল্য বেশী; দেশীয় ব্যক্তিরা সংস্কৃত বা আরবী ভাষাতে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী নয়, তারা ইংরাজীতেই শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক; আমাদের উৎসাহের কারণ হিসাবে, আইন অথবা

ধর্মের ভাষারূপে আরবী এবং ইংরাজীর বিশেষ কোন দাবী নেই ; এদেশীয় ব্যক্তিদের কৃতি ইংরাজী পণ্ডিত হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব ; এবং এই উদ্দেশ্যেই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা পরিচালিত করা উচিত।"[১১৭]

মেকলের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ঘোষণা করলেন যে ভারতবর্ষে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ টাকা সেই সময় থেকে শুধুমাত্র ইউরোপীয় সাহিত্য বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষায় ব্যয় করা হবে। রাজনারায়ণ বসুও ১৮৩৫ সালকেই ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূত্রপাত বলে বর্ণনা করেছেন। "১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে আমাদিগের ইংরাজ রাজ-পুরুষেরা সাধারণ লোককে অন্য কোন ভাষায় শিক্ষা প্রদান না করিয়া প্রজা-পুঞ্জের মনোরঞ্জন জন্য তাঁহাদিগের প্রাচীন পরম শ্রদ্ধাস্পদ সংস্কৃত ও আরবি ভাষাদ্বয়ের বিদ্যালয় সকল প্রধান প্রধান নগরে সংস্থাপন করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেন।"[১১৮]

১৮৩৫ সালে ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের বিষয়ে সরকারী নির্দেশ জারী হল ; আর বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ছেড়ে সংস্কৃত কলেজের সহকারী-সম্পাদক পদে যোগদান করেন ১৮৪৬ সালে। অর্থাৎ যখন ভারতে আধুনিক শিক্ষা সবেমাত্র প্রবেশ করতে শুরু করেছে, সেই সময়ে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন শুরু। অবশ্য পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত ১৮৩৫ সালে গৃহীত হলেও, ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তার বিশেষ প্রভাব তখনও পড়ে নি।

**বিদ্যাসাগরের প্রথম শিক্ষা পরিকল্পনা**

এই সময়কালে একজন প্রকৃত প্রগতিশীল শিক্ষাকর্মীর কাজ কি ছিল? মাতৃভূমির অনুগত সেবক হিসাবে স্বাধীনতা প্রিয়তার প্রমাণ দেওয়ার জন্য চরক-সুশ্রুত আবিসেন্না সম্বলিত ভারতবর্ষের চিরাচরিত শিক্ষাপদ্ধতির পথ অবলম্বন ? না ভারতীয় কূপমণ্ডূকতা ধ্বংস করার জন্য, ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য সে যুগের সর্বাধুনিক শিক্ষা, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ? একমাত্র গান্ধীর মত রক্ষণশীল ব্যক্তির পক্ষেই বলা সম্ভব, "ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থা হল চরম ক্ষতিকর। এই ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য আমি আমার সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছি, ..।"[১১৯] আর সম্ভবতঃ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে একমাত্র নৈরাষ্ট্রবাদীরাই তাদের সমাজ বিকাশের ধারা সম্পর্কে সহজাত

অজ্ঞতা থেকে গান্ধীর সঙ্গে ঐকতানে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু যে কোন সমাজ সচেতন ব্যক্তি, যিনি শিক্ষার প্রসারকে যে কোন সমাজের সাংস্কৃতিক উন্নতির উপায় হিসাবে দেখেন, তিনিই বলবেন ভারতীয় সমাজের অন্ধতা, লোকাচার ও আদিভৌতিক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে একটি কার্যকরী অস্ত্র হল আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান। তাই প্রশ্ন হল—বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা কোন ধারার অন্তর্গত ?

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় সংস্কৃত কলেজে তাঁর প্রথম পরিকল্পনায়, যেটি তিনি সংস্কৃত কলেজে যোগদানের মাত্র তেরো দিনের মধ্যে রচনা করেন ( ১৯শে এপ্রিল, ১৮৪৬ )। এই পরিকল্পনাটি ছিল পঠন-প্রণালী সম্পর্কিত। সে সময় সংস্কৃত কলেজে যে বিশৃঙ্খল পঠনপ্রণালী প্রচলিত ছিল, বিদ্যাসাগর প্রথমেই তার সংস্কারের জন্য সুপারিশ করলেন। এই পরিকল্পনার উপসংহারে তিনি বললেন :

"এই প্রণালীর কার্যকারিতা আমি সযত্নে বিচার করে দেখেছি। একত্রে সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষার সর্বোত্তম জ্ঞান আহরণের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত করা হয়েছে। আমি এ'প্রস্তাব রাখছি এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, এরূপ শিক্ষা এমন সব ব্যক্তি সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে যারা আমাদের মাতৃভাষাকে পাশ্চাত্য জগতের বিজ্ঞান ও সভ্যতা দ্বারা সমৃদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত হবে।"[২০০]

বিদ্যাসাগরের এই উক্তি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য কিছু ইংরেজী জানা দেশী সাহেব তৈরী নয় ; এর উদ্দেশ্য পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষিত একদল শিক্ষাকর্মীর সৃষ্টি, যাঁরা দেশীয়ভাষায় বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রসারে সমর্থ হবেন। সমাজের সাংস্কৃতিক ও সামগ্রিক উন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষার কি ভূমিকা সে সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তাই ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে ভারতবাসীকে মুক্ত করার এক ফলপ্রসূ অস্ত্র হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে। এই কারণে তাঁর শিক্ষাপরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রসার।

১৮৪৭ সালের এপ্রিল মাসে সহকারী সম্পাদক পদে ইস্তফা দেওয়ার পর

বিদ্যাসাগর সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে সংস্কৃত কলেজে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করেন ১৮৫০ সালের ৬ই ডিসেম্বর। আর অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন ১৮৫২ সালের ২২শে জানুয়ারী। অধ্যক্ষ পদে যোগদানের মাত্র তিন মাসের মধ্যে তিনি উপস্থাপিত করলেন তাঁর দ্বিতীয় পরিকল্পনা—*"Notes on the Sanskrit College"* (১২ই এপ্রিল, ১৮৫২)। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত কলেজে প্রচলিত পাঠক্রম, পঠন প্রণালী প্রভৃতির সংস্কার। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর মতামত মোট ছাব্বিশটি অনুচ্ছেদে ব্যক্ত করেন। সংস্কারের অন্যতম বিষয় ছিল গণিত শাস্ত্র। ১১শ-১৩শ অনুচ্ছেদে তিনি বললেন, "বর্তমানে গণিতশাস্ত্রের পাঠ্য হল লীলাবতী ও বীজগণিত। গণিতবিজ্ঞানের পক্ষে এই দুখানি বই যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া এমন এক পদ্ধতিতে বই দুখানি রচিত, প্রচলিত ছড়া, আর্যা ইত্যাদির সাহায্যে, যে আসল বিষয়বস্তু এক-একটি প্রহেলিকা হয়ে উঠেছে। সহজ বিষয় সরল করে না বলার জন্য ছাত্রদের অনেক বেশী সময় লাগে এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে। প্রায় তিন চার বছর ধরে তাদের বই দুখানি পড়তে হয়। বইয়ের মধ্যে দৃষ্টান্ত না থাকার জন্য অনেক 'সমস্যা' ছাত্রদের বোধগম্য হয় না। আসল কথা হল, সংস্কৃত-গণিত ছাত্রদের পড়ানোর কোন সার্থকতা নেই, কারণ এতে ছাত্রদের প্রচুর সময় ও শ্রমের অপব্যয় হয়।······

**দ্বিতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা।**

"এ থেকে একথা বুঝলে ভুল হবে যে আমি শিক্ষার ব্যাপারে গণিতবিদ্যার যথাযথ গুরুত্ব দিই না। আমি শুধু বলতে চাই যে সংস্কৃতের বদলে ইংরেজীর মাধ্যমে গণিতবিদ্যার শিক্ষা দেওয়া উচিত, কারণ তাতে ছাত্ররা অর্ধেক সময়ে দ্বিগুণ শিখতে পারবে।"[২০১]

যে যুগে অঙ্ক বলতে লীলাবতী-বীজগণিত বোঝানো হত, সে সময়ে ইংরেজী গণিতবিদ্যার সূচনা যে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা তা কী অস্বীকার করা যাবে?

এই পরিকল্পনাতে বিদ্যাসাগর কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন হিন্দু দর্শনও পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, যদি বিদ্যাসাগরের প্রকৃত উদ্দেশ্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচলনই হয়, তা'হলে কেন তিনি প্রাচীন হিন্দু দর্শন পড়াবার জন্য সুপারিশ করলেন? এই পরিকল্পনাতেই বিদ্যাসাগর এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন, তা হল :

"একথা ঠিক যে হিন্দু দর্শনের অনেক মতামত আধুনিক যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না, কিন্তু তা হলেও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত। ছাত্ররা যখন দর্শনশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে, তার আগে ইংরেজী ভাষায় তারা যে জ্ঞান অর্জন করবে তাতে ইউরোপের আধুনিক দর্শনবিদ্যা পাঠ করারও সুবিধা হবে তাদের। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দুই দর্শনেই সম্যক জ্ঞান থাকলে, এ দেশের পণ্ডিতদের আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা কোথায় তা বোঝা সহজ হবে।"২০২

এই উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে যে 'সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির বাহক' বিদ্যাসাগর প্রাচীন হিন্দু দর্শনের বেশ কিছু বিষয়কে ভ্রান্ত বলেই মনে করতেন এবং সেই ভ্রান্তি দূর করার জন্য তিনি একত্রে পাশ্চাত্য ও হিন্দু দর্শন পড়াবার সুপারিশও করেছেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গীটি কি ছিল এবং কি কারণে তিনি এ বিষয়গুলিকে সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তা এখানে স্পষ্ট নয়।

বিদ্যাসাগর কোন দৃষ্টিতে প্রাচীন হিন্দু দর্শনকে দেখতেন তার পরিচয় তদানীন্তন শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক, এফ. জে. ময়েটকে লিখিত বিদ্যাসাগরের একটি পত্রে দেখতে পাওয়া যায়। বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালান্টাইন কলকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনের পর যে রিপোর্ট দেন, বিদ্যাসাগর সে সম্পর্কে মন্তব্য করে ১৮৫৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর ময়েটকে লিখলেন, "কতকগুলি কারণে, যা এখানে বিবৃত করার প্রয়োজন নেই, আমরা সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন পড়াতে বাধ্য হই। বেদান্ত ও সাংখ্য, বিশেষতঃ বেদান্ত যে **ভ্রান্ত দর্শন** তা আর মতপার্থক্যের বিষয় নয়। তবে এগুলি ভ্রান্ত হলেও, এই দর্শনগুলি হিন্দুদের কাছ থেকে অসীম শ্রদ্ধা আদায় করে থাকে।"২০৩ ( বড় হরফ আমাদের )

**প্রাচীন হিন্দু দর্শন ও বিদ্যাসাগর**

এই পত্রে বিদ্যাসাগর প্রাচীন হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উপস্থিত করেছেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যাঁর চিঠির উপর 'শ্রীশ্রীদুর্গাসহায়' দেখে কোন কোন ব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে আস্তিক্যবাদী রূপে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন, সেই বিদ্যাসাগরই আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করলেন—সমগ্র বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন হল ভ্রান্ত দর্শন। কিন্তু বেদান্ত ও

সাংখ্যকে ভ্রান্ত দর্শন বলার পরেও তিনি কেন এগুলিকে কলেজের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন? এই পত্রে তিনি সেই কারণকে বিবৃত করতে চান নি, তাই তিনি বললেন, 'কতকগুলি কারণে, যা এখানে বিবৃত করার প্রয়োজন নেই, আমরা সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন পড়াতে বাধ্য হই।' কিন্তু এই দর্শন যে তিনি নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও পড়াতে বাধ্য হন তা এখানে সুস্পষ্ট।

**বিদ্যাসাগরের শাস্ত্র-ব্যবহারের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে নৈরাষ্ট্রবাদীদের কাল্পনিক অভিযোগ**

যে অন্যতম কারণে বিদ্যাসাগর বেদান্ত-সাংখ্যের মত ভ্রান্ত দর্শনকে পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই কারণটি সামাজিক কারণ ভিন্ন অন্য কিছু হতে পারে না। বিদ্যাসাগর যে সামাজিক অবস্থায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের চেষ্টা করেছিলেন, সেই সমাজটিব আসল কর্তৃত্ব ছিল গোঁড়া হিন্দুধর্মের অনুগামীদের হাতে। তখনও পর্যন্ত ওই সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল অন্ধতা। পণ্য অর্থনীতির প্রচলন ও ইউরোপীয়দের সংস্পর্শের ফলে সমাজের এক অতিক্ষুদ্র অংশের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে উৎ-সাহের সৃষ্টি হলেও, ব্যাপক সমাজে এর কোন প্রভাব তখনও পড়েনি। উপরন্তু এক শ্রেণীর বিত্তশালী ব্যক্তিদের আশীর্বাদে গোঁড়া পণ্ডিত ও যাজক শ্রেণী এই পাশ্চাত্য শিক্ষার সক্রিয় বিরোধিতা করাই মনস্থ করেছিল। শুধুমাত্র হিন্দুরাই নয়, মুসলমান সম্প্রদায়ও এই আধুনিক শিক্ষাব প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ ছিল। সুতরাং বলা যেতে পারে, বিদ্যাসাগব-সময়ে ভারতে পুরোপুরি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের উপযুক্ত ক্ষেত্রই গড়ে ওঠেনি। তাই যে সমাজের মানুষরা গোঁড়া পণ্ডিতদের প্ররোচনায় প্রাচীন হিন্দু দর্শনকে ঈশ্বরের মুখ-নিঃসৃত বাণী বলে মনে করে, এবং যে সমাজের সাধারণ মানুষরা শাস্ত্র লঙ্ঘনের ভয়ে সদাশঙ্কিত, সেই সমাজে ঐ বেদান্ত-সাংখ্যকে উপেক্ষা করার কি কোন উপায় ছিল? উপায় যে ছিল না তা বিদ্যাসাগরের বাস্তব-সচেতন মন উপলব্ধি করতে অপারগ হয় নি। বিদ্যাসাগরেব এই বাস্তব সচেতনতারই পরিচয় পাই 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না'—পুস্তিকায়, যেখানে তিনি বলছেন, "কিন্তু বিধবা বিবাহ যদি কর্তব্য কর্ম না হয়, তাহা হইলে কোনওক্রমে প্রবর্তিত ও প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। কারণ, কোন্ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি অকর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন? অতএব, বিধবা-

বিবাহ কর্তব্য কর্ম কি না, অগ্রে ইহার মীমাংসা করা অতি আবশ্যক। যদি যুক্তি মাত্র অবলম্বন করিয়া, ইহাকে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে, এতদ্দেশীয় লোকেরা কখনই ইহাকে কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাঁহারা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশে শাস্ত্রই সর্বপ্রধান প্রমাণ এবং শাস্ত্র সম্মত কর্মই সর্বতোভাবে কর্তব্য কর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে।"[২০৪]

সুতরাং, যে সমাজে শাস্ত্রই একমাত্র পথ নির্দেশ, সে সমাজে যে বেদান্ত সাংখ্য ব্যতীত কোন পাঠ্যসূচীই রচিত হতে পারে না, তা বলা বাহুল্য। অবশ্য বিদ্যাসাগরের এই শাস্ত্রের সাহায্যগ্রহণের মধ্যেই ভারতীয় নৈরাষ্ট্রবাদীরা তাঁর 'সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি'র পরিচয় পান। এই কারণে একদল নৈরাষ্ট্রবাদী অভিযোগ করেছেন, "'বাল্যবিবাহ' (১৮৫০), 'বিধবা বিবাহ' (১৮৫৫-৫৬) এবং 'বহু বিবাহ' (১৮৫৭-৫৮) প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে বিদ্যাসাগর তাই কোথাও মানবিকতার ও নৈতিকতার যুক্তি অবতারণা করেনি, বার বার তুলে ধরেছিল শাস্ত্রের অনুমোদনকে, একই সঙ্গে বর্ণাশ্রমের অনুশাসনকে ও বৃটিশ প্রসাদ লোভী এক পিতৃতান্ত্রিক সামন্তশাসনকে।"[২০৫]

কি চমৎকার যুক্তি! যেহেতু শাস্ত্রের অনুমোদন দ্বারা বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের প্রচলন অথবা বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন, সেহেতু বিদ্যাসাগর হয়ে গেলেন সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধি! কি ধরনের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ও দৃঢ় মনোবল থাকলে এবিষয়গুলির বিরুদ্ধে বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব—সে বিচারের কোন প্রয়োজন নেই। আর যেহেতু এঁরা নিজেরা কোন সময় বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করে বাস্তবোপযোগী কর্মসূচী গ্রহণ করেন না, সেহেতু সেযুগের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে শাস্ত্র ব্যবহারের আবশ্যকতাও এঁদের কাছে মূল্যহীন। আসলে সর্ব কালের নৈরাষ্ট্রবাদীদের মত এঁদের কাছেও যে কোন ধরনের সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অর্থ হল মানবিকতা ও নৈতিকতার দোহাই দিয়ে কিছু অশ্রুসজল 'আবেগময়ী রোষ'-এর প্রকাশ, সমাজে অত্যাচার নিবারণের জন্য কোন ফলপ্রসূ কাজ নয়। বিদ্যাসাগর যদি বিধবা বিবাহের পক্ষে কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের পরিবর্তে শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ শব্দগুলি

যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে যেতেন, তা'হলেই তিনি এই সব ব্যক্তিদের চোখে প্রগতিশীল ব্যক্তিতে পরিণত হতেন, আর তাঁর বাগাড়ম্বর হত সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী 'তীব্র' সংগ্রামের প্রমাণ। আসলে এই সব নৈরাষ্ট্র-বাদীদের কাছে সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতি শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ বোধগম্য না হওয়ার ফলে, এবং এঁদের কোন বিষয়ে গভীরে প্রবেশ করার অক্ষমতার দরুন, এঁরা বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিদ্যা-সাগরের প্রকৃত কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণের পথ এড়িয়ে গিয়ে, শুধুমাত্র দু'একটি বাক্যবাণ বর্ষণেই নিজেদের বিপ্লবী কর্তব্য সম্পাদন করেন। বস্তুতঃ আধা-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে শিক্ষা-দীক্ষার নিকৃষ্টমানের জন্য, নৈরাষ্ট্রবাদীদের মানেরও যে অধঃপতন ঘটেছে, তা নৈরাষ্ট্রবাদের জনক প্রুধোঁ-বাকুনিনকেও রীতিমত লজ্জা দেয়।

শুধু নৈরাষ্ট্রবাদীরাই বা কেন, কোন কোন প্রথিতযশা ঐতিহাসিকও বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে প্রায় একই ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। বিদ্যাসাগরের সহবাস-সম্মতি আইনের 'বিরোধিতা' সম্পর্কে বিনয় ঘোষ লিখেছেন,

বিদ্যাসাগর-বিরোধিতায় বিনয় ঘোষ ও নৈরাষ্ট্র-বাদীদের ঐক্য

"শেষজীবনে সহবাস-সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে তিনি যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন, তার মধ্যেও অসংগতির আভাস পাওয়া যায়। এ-বিষয়ে তিনি সরকারকে লিখেছিলেন; '…I should like the measure to be so framed as to give something like an adequate protection to child wives, without in any way conflicting with any religious usage. I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before his wife has had her first menses…such a law would not only serve the interests of humanity …but would, so far from interfering with religious usage, enforce a rule laid down in the Sastras.'

[ "আমি মনে করি এমনভাবে আইন প্রণীত হোক যাতে কোনরকম ধর্মীয় রীতি-নীতির সাথে সংঘাত ব্যতিরেকেই বালিকা বধূদের যথেষ্ট নিরাপত্তা

প্রদান করা যায়। তাই আমার প্রস্তাব হল, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর প্রথম ঋতুর আগেই তাকে বিবাহ করে, তবে ওই ব্যক্তির পক্ষে তা একটা অপরাধ বলেই গণ্য হবে। এইরকম একটা আইন শুধু মানবতার স্বার্থই চরিতার্থ করবে না; এটি ধর্মীয় রীতি-নীতিতে হস্তক্ষেপ না করেই শাস্ত্র-প্রণীত বিধানকে কার্যকরী করবে।" ( অনুবাদ আমাদের—বর্তমান লেখক ) ]

"১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১, বিদ্যাসাগর এই পত্রখানি সরকারকে লিখেছিলেন। তার কয়েক মাস পরে ২৯ জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়। বোঝা যায় না, কেন এই পত্রের মধ্যে তিনি 'religious usage' কথাটির উপর এত জোর দিয়েছিলেন! যিনি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক এবং বহু বিবাহের ঘোর বিরোধী, তিনি কেন 'বাল্যবিবাহপ্রথা' আইনের দ্বারা নির্মূল করতে চাইলেন না? এ কি তাঁর বার্ধক্যের দুর্বলতা ও মানসিক দ্বন্দ্ব?"[২০৬]

ধন্যবাদ! অসংখ্য ধন্যবাদ পণ্ডিত প্রবর! বিদ্যাসাগর-চরিত্রের এই অসংগতি আবিষ্কারের জন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ না থেকে আমাদের উপায় নেই। কিন্তু আপনাকে নিভৃতে একটু জিজ্ঞাসা করি—বিদ্যাসাগরের উদ্ধৃতির মধ্যবর্তী অনুল্লিখিত অংশগুলি কি ছিল বলুন ত? নিশ্চয় অপ্রাসঙ্গিক বলেই আপনি উদ্ধৃত করেন নি? তাই আমরাই না হয় সে কষ্টটুকু স্বীকার করি।

"....I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before his wife has had her first menses. As the majority of girls do not exhibit that symptom before they are thirteen, fourteen, or fifteen, the measure I suggest would give larger, more real and more extensive protection than the Bill. At the same time, such a measure could not be objected to on the ground of interfering with a religious observance.

"From every point of view, therefore, the most reasonable course appears to me, to make a law declaring it penal for a man to have intercourse with his wife, before she has her first menses.

"Such a law……laid down in the Sastras. The punishment, which the Sastras prescribe for violation of the rule, is of a spiritual character and is liable to be disregarded. The religious prohibition would be made more effective, if it was embodied in a penal law."২০৭

অর্থাৎ এর সরল বাংলা হল : "…আমার প্রস্তাব হল, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর প্রথম ঋতুর আগেই তাকে বিবাহ করে, তবে ওই ব্যক্তির পক্ষে তা একটা অপরাধ বলেই গণ্য হবে। যেহেতু অধিকাংশ বালিকাদের মধ্যে তের, চোদ্দ অথবা পনের বছরের আগে ওই লক্ষণ দেখা যায় না, সেহেতু আমি যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করছি, **তা আলোচ্য 'বিল' থেকে অনেক বেশী, অনেক বাস্তব এবং অনেক ব্যাপক নিরাপত্তা প্রদান করবে। একই সঙ্গে ধর্মীয় আচরণে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে—এই অজুহাতে, এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করাও সম্ভব হবে না।**

"সুতরাং সব দিক থেকেই আমার মনে হয়, সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত পথ হল এমন একটা আইন প্রণয়ন, যা কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর প্রথম ঋতুর আগে সহবাস করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করবে।

"এইরকম একটা আইন শুধু মানবতার স্বার্থই চরিতার্থ করবে না,… শাস্ত্রপ্রণীত বিধানকে কার্যকরী করবে। এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে শাস্ত্র যে শাস্তির বিধান দেয় তা হল আধ্যাত্মিক প্রকৃতির এবং সে কারণে তা উপেক্ষিত হতে বাধ্য। **যদি একে ফৌজদারী আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তা'হলে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা আরও কার্যকরী করা যাবে।"** (বড় হরফ আমাদের)

তা'হলে কি দাঁড়াল? 'Religious usage' সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর অস্বাভাবিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বিনয় ঘোষ-এর যে মনোবেদনা দেখা দিয়েছিল, মনে হয় এই উক্তির মধ্যে তার উত্তর যেন রয়েছে। খুব স্পষ্ট-ভাবেই কি দেখা যাচ্ছে না যে সহবাস-সম্মতি আইন প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিরোধিতার বিষয়টি বিনয় ঘোষ নামক ইতিহাসবিদ সুকৌশলে উদ্ভাবন করেছেন? বরং বিদ্যাসাগর যে এই আইনকে বাস্তবে কার্যকরী করার জন্য, বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে এমন আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেছিলেন, যাকে

শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে স্বার্থান্বেষীরা কোনক্রমেই লঙ্ঘন করতে না পারে—তা অতি সুস্পষ্ট। যা হোক, ইতিহাস বিচারের ক্ষেত্রে এই বিকৃতিকরণের জন্য বিনয় ঘোষ অবশ্য স্মরণীয় হয়েই থাকবেন।

আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আধুনিক নৈরাষ্ট্রবাদীরা হয়ত জানেন না যে বিদ্যাসাগর প্রাচীন হিন্দু দর্শন কলেজের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হলেও, ছাত্রদের মনে এই দর্শনগুলি যাতে কোনভাবে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, সে বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন। তাই তিনি এমনভাবে পাঠ্য বিষয়ের বিন্যাস করলেন, যে ব্যবস্থায় ছাত্ররা আগে পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করবে, আর সেই অর্জিত জ্ঞানের আলোকেই তারা হিন্দু দর্শনের ভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন হবে। এই বিষয়ে তদানীন্তন 'শিক্ষা সংসদ' নিয়োজিত পরিদর্শক ব্যালান্টাইন কিন্তু ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন। তিনি তাঁর রিপোর্টে সুপারিশ করলেন পাঠ্যসূচীর বিন্যাস এমনভাবে করা হোক, যার ফলে, "হিন্দুদের দার্শনিক আলোচনা যেসব মৌলিক সত্যে পৌঁছেচে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে তাদের পূর্ণতর বিকাশ দেখিয়ে উভয়ের সমন্বয়ের পথ খুলে দেবেন।"[২০৮]

বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে পূর্বোল্লিখিত পত্রে ময়েটকে জানালেন, "দুঃখের বিষয়, আমি এ-বিষয়ে ব্যালান্টাইনের সঙ্গে একমত নই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে সব জায়গায় মিল দেখানো সম্ভব নয়। যদিও তা সম্ভব ধরে নেওয়া যায়, তবু আমার মনে হয়, প্রগতিশীল ইউরোপীয় বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য ভারতীয় পণ্ডিতদের কাছে সমাদরযোগ্য করা রীতিমত কঠিন। তাঁদের কুসংস্কারগুলি বহুকালের সঞ্চিত ও দৃঢ়মূল। সেগুলি নির্মূল করা সহজ ব্যাপাব নয়। কোন নতুন তত্ত্ব, এমন কি তাঁদের নিজেদের শাস্ত্রে যে তত্ত্বের বীজ আছে তারই বর্ধিত রূপ যদি তাঁদের গোচবে আনা যায়, তাও তাঁরা গ্রাহ্য করবেন না।"[২০৯] এর পরই তিনি আরব খলিফাদেব গোড়ামি সম্পর্কে একটি প্রচলিত কাহিনীর উল্লেখ করে লিখলেন, "আমার বলতে সংকোচ হয়, ভারতীয় পণ্ডিতদের গোঁড়ামি আরব খালিফের চেয়ে কম নয়। তাঁদের বিশ্বাস, যে-ঋষিদের মস্তিষ্ক থেকে শাস্ত্রগুলি বেরিয়েছে তাঁরা সর্বজ্ঞ, অতএব তাঁদের শাস্ত্র অভ্রান্ত।"[২১০]

যে সমাজে কুসংস্কারগুলি বহুকালের সঞ্চিত ও দৃঢ়মূল, যেগুলি নির্মূল করা

সহজ নয় এবং যে সমাজে শিক্ষা-দীক্ষা চালিত হয় আরব খলিফাদের মত গোঁড়া পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে, সেই সমাজে বিদ্যাসাগর প্রণীত শিক্ষা কি ভাবে কুসংস্কার দূর করবে? বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে তাঁর প্রথম পরিকল্পনাতেই বলেছেন যে, এই নতুন শিক্ষা পরিকল্পনা এদেশে দেশীয়ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার পথ প্রশস্ত করে তুলবে। ময়েটকে লিখিত তাঁর পূর্বোক্ত পত্রে দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষকদের গুণাগুণ বর্ণনা করে তিনি বললেন, "শিক্ষকদের এই সব গুণ থাকবে; তাঁরা নিজেদের ভাষায় সুশিক্ষিত হবেন, বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করবেন এবং দেশের প্রচলিত কুসংস্কার থেকে যতদূর সম্ভব মুক্ত থাকবেন। এই ধরণের এক শ্রেণীর শিক্ষক গড়ে তোলাই আমার জীবনের লক্ষ্য এবং সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কারের ব্যাপারে আমি আমার সমস্ত উদ্যম এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে চাই।"২১১

**বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-কর্মসূচীর অন্তঃসার**

তাঁকে এই উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করতে বারবার শোনা গেছে। এই একই প্রসঙ্গে তিনি অন্য একটি পত্রে ময়েটকে লিখলেন, "এই সুযোগ পেলে আমি নিশ্চিত হয়ে আপনাদের বলতে পারি যে সংসদের উৎসাহ ও সমর্থন থাকলে, আমি কয়েক বছরের মধ্যে এমন একদল শিক্ষিত যুবক তৈরী করে দিতে পারব, যারা নিজেদের রচনা ও শিক্ষার দ্বারা দেশের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানেব প্রসারে, আপনাদের প্রাচ্যবিদ্যার অথবা শুধু ইংরেজী বিদ্যার পণ্ডিতদের চেয়ে, অনেক বেশী সাহায্য করতে পারবে।"২১২

ধর্মীয় অন্ধতা দূর করার অন্যতম উপায় যে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার, বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ — তিনি নাকি সেই শিক্ষাকে কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। আমরা যদি নৈরাষ্ট্রবাদীদের মত বাস্তবতাবোধ হারিয়ে না ফেলি এবং 'বিপ্লবী আবেগে' এক আঘাতে সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষার দ্বার মুক্ত হওয়া সম্ভব বলে না মনে করি, তা'হলে নিশ্চয়ই আমরা দেখতে ব্যর্থ হব না যে সর্বজনীন শিক্ষার আগে থাকে সমাজে বিদ্যাচর্চার এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। সাধারণ কেন, একটু অপেক্ষাকৃত ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের জন্য অবশ্য তিনটি প্রাথমিক উপাদানের প্রয়োজন—শিক্ষাদানের উপযুক্ত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষক, যে ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হবে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সেই ভাষাকে

উপযোগী করে তোলা, এবং আধুনিক স্কুলব্যবস্থা।

কিন্তু আলোচ্য সময়ে কি বাংলা দেশে সর্বসাধারণের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় এই তিনটি উপাদান উপস্থিত ছিল? এর কোনটিই যে উপস্থিত ছিল না তা সকলেরই জানা। রামমোহন লিখিত বাংলা ত এখনকার উচ্চ শিক্ষিত বাঙালীদের কাছেও প্রায় দুর্বোধ্য। রামমোহনের পরবর্তী সময়ে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার সূচনা হলেও, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে তাও সম্পূর্ণ অনুপযুক্তই ছিল। আর শিক্ষক? প্রকৃতপক্ষে হিন্দু কলেজে কিছু কিছু উচ্চ শ্রেণীর বাঙালী পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করলেও, তাঁদের সঙ্গে সমাজের কোন সম্পর্ক ছিল না। একদিকে তাঁদের অতিনাস্তিকতার ফলে তাঁরা যেমন আক্ষরিক অর্থে সমাজচ্যুত ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে তাঁরা ভারতীয় সমাজের কুসংস্কারকে ঘৃণা করলেও, সামাজিক কুসংস্কার দূর করার বিষয়ে যে-কোন ধরনের বাস্তব কাজকে অবহেলা করতেন। এমন কি শোনা যায় তাঁদের মধ্যে অনেকে নাকি বাংলা ভাষায় কথা বলাকেও অসম্মানজনক কাজ বলে মনে করতেন। সুতরাং বলা নিস্প্রয়োজন, যেমন এই নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়, তেমনি সংস্কৃতজ্ঞ টুলো পণ্ডিত—উভয় শ্রেণীর পক্ষে বাংলা ভাষায় উপযুক্ত শিক্ষক সরবরাহ করা সম্ভব ছিল না। আর শেষ উপাদান, আধুনিক স্কুল ব্যবস্থা এদেশে কেমন প্রচলিত ছিল, তা আমরা আগেই লক্ষ করেছি।

বিদ্যাসাগর এই ত্রিবিধ কাজকেই তাঁর শিক্ষা-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তিনি শিক্ষক তৈরীর কাজটি সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজে, যেখানে তিনি অধ্যাপনা ও পবিচালনার দায়িত্বে আছেন। এই শিক্ষক তৈরীর উদ্দেশ্যেই বিদ্যাসাগরের প্রতিটি শিক্ষা-পরিকল্পনা। বাংলা ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন এমন এক দল ব্যক্তির যাঁদের একাধারে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষার উপর যথেষ্ট কর্তৃত্ব থাকবে। কেবলমাত্র ইংরেজী শিক্ষায় যে এই কাজটি সম্ভব নয়, সে ত হিন্দু কলেজের ছাত্ররাই প্রমাণ করেছিল। এই কারণে বিদ্যাসাগর ব্যালাণ্টাইনের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সমন্বয়ের তত্ত্বটি না মেনে, তার পরিবর্তে চেষ্টা করলেন ইংরেজী সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের সমন্বয়ের। বিদ্যাসাগরের বুঝতে কোন অসুবিধা হয় নি যে ইংরেজী ভাষায় যেমন এদেশে প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার সম্ভব নয়, তেমনি

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের উপযুক্ত শিক্ষক

দেশীয় ভাষা বলতে যে সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভাষার প্রচলন আছে, সে ভাষাগুলিতেও শিক্ষাদান অসম্ভব। কারণ ইংরেজীর মত আরবী, ফারসী, এমন কি সংস্কৃত ভাষাও বাঙালী সমাজের উপরতলার এক মুষ্টিমেয় অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে একমাত্র মাধ্যম হওয়া উচিত বাংলা ভাষার। কিন্তু যেহেতু শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সেই ভাষা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল, সেহেতু বিদ্যাসাগর কলেজ-শিক্ষার জন্য বেছে নিলেন ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষাকে। একদিকে ইংরেজী শিক্ষার সাহায্যে ছাত্ররা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ব করার সুযোগ পাবে; অপরদিকে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান তাদের বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করবে। তাই '***Notes on Sanskrit College***'-এ তিনি বললেন,

"১। বাংলা দেশে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।

২। যাঁরা ইউরোপীয় আকর থেকে জ্ঞানবিদ্যার উপকরণ আহরণ করতে সক্ষম নন, এবং সেগুলিকে ভাবগম্ভীর, প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম, তাঁরা এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।

৩। যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নন, তাঁরা সুসংবদ্ধ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় রচনা সৃষ্টি করতে পারবেন না। সেইজন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে সুশিক্ষার প্রয়োজন।

৪। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যাঁরা কেবল ইংরেজী বিদ্যায় পারদর্শী, তাঁরা সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাংলা ভাষায় কিছু প্রকাশ করতে পারেন না। তাঁরা এত বেশী ইংরেজীভাবাপন্ন যে তাঁদের যদি অবসর সময়ে খানিকটা সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলেও তাঁরা শত চেষ্টা করেও, পরিমার্জিত দেশীয় বাংলা ভাষায় কোন ভাবই প্রকাশ করতে পারবেন না।

৫। তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজী সাহিত্য ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তারাই একমাত্র সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে।"[২১৩]

এইভাবেই বিদ্যাসাগর মাতৃভাষায় শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে

সুশিক্ষিত, ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত, অথচ বাংলা ভাষায় ভাবপ্রকাশে সমর্থ একদল শিক্ষক সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তিনি যেমন সেযুগের অনেক ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তির মত পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধ অনুকরণকারী ছিলেন না, তেমনি আধুনিককালের উগ্রজাতীয়তাবাদীদের মত বৃটিশ-বিরোধিতার অছিলায় সংস্কৃত ভাষার প্রতি অন্ধ অনুরাগ প্রদর্শনকেও নিজের কর্তব্য বলে স্থির করেন নি। বাস্তবিকপক্ষে বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-ধারা বাংলা ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের প্রথম বনিয়াদটি তৈরী করে। তাই তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়েছিল ইংরেজী ও সংস্কৃত—উভয় সাহিত্যের সাহায্যে ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্য সম্বন্ধে রসবোধ ও সাবলীল বাংলা ভাষা লেখার জন্য নিপুণতা সৃষ্টির প্রচেষ্টায়। তিনি যে সংস্কৃত কলেজকে হিন্দু কলেজের মত শুধু ইংরেজী শিক্ষার কেন্দ্র করতে চান নি, সে কথা তিনি একাধিকবার ঘোষণা করেছেন। ব্যালান্টাইনের শিক্ষা-সংক্রান্ত পত্রের উপসংহারেও বিদ্যাসাগরের এই উদ্দেশ্যই ব্যক্ত হয়েছে। "অবশেষে আমি সবিনয়ে শুধু এইটুকুই নিবেদন করতে চাই যে আমাকে যদি আমার নিজের পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করতে দেওয়া হয়, তাহলে সংসদের কাছে এইটুকু বেশ জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে সংস্কৃত কলেজ কেবল যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষার আদর্শ পীঠস্থান হবে তাই নয়, মাতৃভাষা চর্চারও প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠবে। এমন একদল ভবিষ্যতের শিক্ষক তৈরী হবে এখান থেকে, যাঁরা দেশের জনসাধারণের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের পথ সুগম করবেন।"[২১৪]

**শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ভাষায় বিকাশে বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক ভূমিকা**

জনশিক্ষার মাধ্যম রূপে উপযুক্ত বাংলা ভাষা গড়ে তোলা ও সেই ভাষার উৎকর্ষ সাধনের দায়িত্ব কিন্তু বিদ্যাসাগর এই নতুন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে অর্পণ করেই বসেছিলেন না। তিনি নিজেই জনশিক্ষার উপযোগী বাংলা ভাষা সৃষ্টির কাজে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর বাংলা ভাষা উন্নতির প্রচেষ্টা কেবলমাত্র সাহিত্য রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ পুস্তকই রচিত হয়েছিল পাঠ্যপুস্তক রূপে এবং সেই পুস্তকগুলোই হল বাংলা ভাষায় প্রথম যথার্থ পাঠ্যপুস্তক। সে পুস্তক যেমন বাংলা অক্ষর পরিচয় ও বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্যও আবশ্যক, তেমনি এই পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমেই বিদ্যাসাগর ছাত্রদের মনে সামাজিক নীতিবোধ ও মূল্যবোধ জাগিয়ে

তোলার চেষ্টা করেন। বাংলায় লিখিত কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, লিনিয়স প্রমুখ পৃথিবীখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও মনীষীদের সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয়ও কম চিত্তাকর্ষক, কম যুগান্তকারী ঘটনা নয়। বিদ্যাসাগর প্রণীত এই সব পুস্তকের বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে গেলে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (২য় ভাগ)-এর প্রসঙ্গও এসে পড়ে। কারণ আধুনিক বিদ্যাসাগর-সমালোচকরা বিদ্যাসাগরের 'ইংরেজ শাসকদের প্রতি নিঃসর্ত অনুরাগ'-এর নিদর্শন স্বরূপ এই পুস্তকটিকেই দাখিল করেন। তাঁদের মতে এই পুস্তকে যেমন জনগণের কাহিনী কোথাও বিবৃত হয় নি, তেমনি বৃটিশ শাসকদের মহিমা কীর্তনকেই বিদ্যাসাগর বাংলার ইতিহাস বলে পরিবেশন করেছিলেন। অবশ্য এই পুস্তকটির সঠিক বিচার করলে বিদ্যাসাগরের ইংরেজ-তোষণ থেকে ঐসব বিদ্যাসাগর-সমালোচকদের আদর্শের দৈন্যই বেশী পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তা না হলে কি আর তাঁরা বলতে পারেন, "বইটা পড়লে মনে হতে পারে যে সারা বাংলাদেশে বাঙ্গালী বলে কোন জাতি নেই, গ্রামে কৃষক নেই, শহরে মধ্যবিত্ত নেই, নেই কোন মেহনতী মানুষ এবং থাকলেও তাঁরা মানুষ বলে বিবেচিত হবার যোগ্য নন—আছে শুধু ইংরেজ গভর্নর, ইংরেজ সৈনিক আর ইংরেজ বণিকেরা—এবং পণ্ডিতের ভাষায় বলতে গেলে, আছে শুধু 'ইংরেজ মহাত্মারা'।"[২১৫] যে ১৮৪৮ সালে সবেমাত্র কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হচ্ছে, সেই ১৮৪৮ সালে লিখিত একটি ইতিহাসে তাঁরা জনগণের ইতিহাস দাবী করে বসেন! এই মর্মান্তিক ইতিহাসবোধ থেকেই এঁরা ধারণায়ও আনতে পারেন না—যে সময় ভারতীয় ভাষায় কোন ধরনের ইতিহাস রচিত হয়নি, সে সময় সংক্ষিপ্ত, একটা যেমন-তেমন ধরনের ইতিহাস রচনাও কি ধরনের দুঃসাধ্য কাজ। এছাড়া এই সব ব্যক্তিরা স্মরণে আনতে চান না যে প্রকৃত অর্থে "বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ, শ্রীযুক্ত মার্শমন সাহেবের রচিত ইঙ্গরেজী গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বনপূর্বক সঙ্কলিত,...।"[২১৬] প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগর যদিও দু'একজায়গায় কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (দ্বিতীয় ভাগ) হল মার্শম্যানের "আউট-লাইন অফ দি হিস্টরী অফ বেঙ্গল কমপাইল্ড ফর দি ইউজ অফ দি ইয়ুথ্স অফ দি ইণ্ডিয়া" গ্রন্থটির প্রায় অনুবাদ। সুতরাং বলা যেতে পারে যে 'বাঙ্গালার ইতিহাস'-এ উপস্থাপিত বক্তব্য মার্শম্যানেরই বক্তব্য।

অনেকে আবার বলেন, যদি উক্ত বইতে উপস্থাপিত বক্তব্য বিদ্যাসাগরেরই না হবে, তা'হলে তিনি নিজে ইতিহাস রচনা না করে কেন ওই বইটির অনুবাদ করতে গেলেন ? সেক্ষেত্রে কিন্তু এই সব ব্যক্তিদের ইতিহাস সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞান-হীনতাটা আর একটু বিশেষভাবেই প্রকট হয়ে পড়ে। কারণ যে সময় পৃথিবীতে শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস রচনার প্রণালীই প্রায় অজ্ঞাত, যখন ইতিহাস বলতে সাধারণভাবে অতীত ঘটনাবলীর একটা মামুলী বিবরণ বোঝান হত এবং যেখানে ভারতের ইতিহাস রচনার জন্য প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তথ্যাবলী প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, তখন ঐ ইংরেজ লিখিত হাতে-নাতে পাওয়া ইতিহাসের অনুসরণ ভিন্ন অন্য কোন বিকল্প পথ কি ছিল ? বাস্তবিকপক্ষে বিদ্যাসাগর যেমন একজন ঐতিহাসিক ছিলেন না, তেমনি 'বাঙ্গালার ইতিহাস'ও একটি যথার্থ ইতিহাস পুস্তক নয়। যেহেতু সে সময় ভারতীয় ভাষায় লিখিত আধুনিক কালের ভারতের কোন ইতিহাস ছিল না, সেহেতু ছাত্রদের ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচিত করার উদ্দেশ্যেই 'বাঙ্গালার ইতিহাস'-এর প্রকাশনার পরিকল্পনা করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যাসাগর দ্বারা দ্বিতীয় ভাগটি রচিত হলেও, প্রথম ও তৃতীয় ভাগ যথাক্রমে রামগতি ন্যায়রত্ন ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচনা করেন। বিদ্যাসাগরকে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' যে শুধুমাত্র নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা দেওয়াব জন্যই লিখতে হয়েছিল, তা এই সময়কালে বিদ্যাসাগরের অন্যান্য রচনা, 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা',. 'জীবনচরিত', 'বোধোদয়' প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

বিদ্যাসাগর কিন্তু শুধু 'বাঙ্গালাব ইতিহাস'-এর ক্ষেত্রেই অন্য ভাষায় লিখিত পুস্তকের অনুসরণ করেননি। 'ভ্রান্তিবিলাস', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও মূল ইংরেজী অথবা সংস্কৃত পুস্তকেব বিষয়বস্তু অবলম্বনেই লিখিত। কি কারণে তিনি অন্য ভাষায় লিখিত এই সব পুস্তকের উপজীব্য বিষয় নিয়ে রচনা প্রকাশ কবেছিলেন ? বিদ্যাসাগরের এই ইতিহাসবোধ ছিল যে, অন্য বিকশিত ভাষায় লিখিত সাহিত্যের সাহায্য ভিন্ন কোন ভাষাই তার ভ্রূণাবস্থা থেকে বিকশিত হতে পারে না। এই সমস্ত ভাষার রচনাগুলির উপজীব্য বিষয়, রচনাশৈলী, আধুনিক চিন্তাধারা ও পরিশীলিত সাহিত্যরসের

অনুসরণ হল যে-কোন নতুন ভাষা গড়ে তোলার প্রকৃষ্ট পথ। তাই যিনি একদিকে একটা ভাষায় শিক্ষাচর্চার প্রায় গোড়াপত্তন করছেন এবং অন্যদিকে নানাবিধ সমাজ সংস্কার সংক্রান্ত বাস্তব কাজে সদাব্যস্ত, তাঁর পক্ষে ছাত্রদের ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ও বাংলা ভাষার বনিয়াদ তৈরী করার জন্য সহজতম ও কার্যকর পথ ছিল এই অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ। শুধু তাই নয়, এই অন্যান্য ভাষার সাহায্য গ্রহণ ছাড়া যেমন বিদ্যাসাগরের পক্ষে এককভাবে বাংলা ভাষায় রচনা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াত, তেমনি মৌলিক ইতিহাস রচনাও তাঁর যে সময়ের দাবী করত, সে দাবী মেনে নেওয়া বিদ্যাসাগরের মত একজন বাস্তব শিক্ষা কর্মী ও সমাজ সংস্কারকের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

নৈরাষ্ট্রবাদীরা শুধু যে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (২য় ভাগ)-এর প্রকাশনার প্রেক্ষাপটটি সম্বন্ধেই অজ্ঞ তা নয়, এঁদের সমগ্র বিদ্যাসাগর-বিরোধিতারই ভিত্তি হল উগ্র-জাতীয়তাবাদ। বাল্য-বিবাহ প্রথা বাঙালীদের দৈহিক দুর্বলতার অন্যতম কারণ—এই ধারণা থেকে বিদ্যাসাগর 'বাল্যবিবাহের দোষ' পুস্তিকায় লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষে নিতান্তই যে বীর্যবন্ত বীরপুরুষের

**'বাঙ্গালার ইতিহাস' বিচারে নৈরাষ্ট্রবাদীদের উগ্র-জাতীয়তাবাদী মনোভাব**

অসদ্ভাব ছিল, এমত নহে,...এবং এক্ষণেও পশ্চিমপ্রদেশে ভূরি ভূরি পরাক্রান্ত পুরুষেরা অনেকানেক বিষয়ে সাহস ও শৌর্যগুণের কার্য দর্শাইয়া পূর্বপুরুষীয় পরাক্রমের দৃষ্টান্ত বহন করিতেছে। এতদ্দেশীয় হিন্দুগণ সেই জাতি ও সেই বংশে উৎপন্ন হইয়া যে এতাদৃশ দুর্বলদশাগ্রস্ত হইয়াছে, **বাল্যপরিণয় কি ইহার মুখ্য কারণ নয়?** ...পশ্চিমদেশীয়রা যখন অন্যবিধ জীবিকার উপায় না পায়, তখনি রাজকীয় সৈন্যশ্রেণীতে ও অন্যান্য ধনাঢ্য লোকের দৌবারিকতা কর্মে নিযুক্ত হইয়া অক্লেশে আজীবন নির্বাহ করে। এতদ্দেশীয়েরা অন্নাভাবে জঘন্য বৃত্তিও স্বীকার করে, তথাপি কোন সাহসের ও পরাক্রমের কার্যে প্রবৃত্ত হয় না। এই জন্যই রাজকীয় সৈন্য মধ্যে কখন বঙ্গদেশোৎপন্ন ব্যক্তিকে দেখা যায় নাই।"[২১৭] (বড় হরফ আমাদের) পশ্চিম ভারতীয়দের তুলনায় বাঙালীদের দৈহিক দুর্বলতার মুখ্য কারণ একমাত্র বাল্য-বিবাহই কি না তা অবশ্যই অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু বাস্তব সত্য অস্বীকার করে নিজ-জাতির মিথ্যা গৌরব কাহিনী প্রচার করার মত কোন

—১৩

সাম্প্রদায়িক মনোভাব যে বিদ্যাসাগরের ছিল না তা এই উক্তিটিই প্রমাণ করে। আর দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, এই সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার অনুপস্থিতির জন্যই আধুনিক নৈরাষ্ট্রবাদীরা বিদ্যাসাগরকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে দায়ী করেছেন। তাঁরা লিখছেন, "নিজের লেখা বই 'বাল্য বিবাহের দোষ'-এ পণ্ডিত বাঙ্গালীদের **এক কাপুরুষ জাতি বলে** অভিযুক্ত করেছে।"[২১৮] ( বড় হরফ আমাদের ) বিদ্যাসাগর রচিত 'বাঙ্গালার ইতিহাস' বিচারের ক্ষেত্রেও নৈরাষ্ট্রবাদীরা এই উগ্রজাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা দ্বারাই পরিচালিত হন। তাই বিদ্যাসাগর সিরাজউদ্দৌলাকে দুরাচারী ও কপট বলাতে এঁদের জাত্যাভিমান আঘাত পায়। আসলে এঁদের কাছে স্বদেশ প্রেমের অর্থ হল লম্পট নবাবের স্তুতি। আর যেহেতু সেই নবাব জন্মাধিকার সূত্রে ভারতীয়, সেহেতু সে-নবাব যত লম্পট, অত্যাচারীই হোক কখনও জনগণের শোষক হতে পারে না; এঁদের মতে সে হল জনগণের স্বার্থরক্ষার একমাত্র অছি। বাংলার 'শেষ স্বাধীন নবাব' সিরাজউদ্দৌলার 'স্বাধীনতা' ও জনগণের 'স্বার্থ-রক্ষা'র স্বরূপ উন্মোচনের সুযোগ এখানে নেই। তবে উগ্রজাতীয়তাবাদের অহিফেন সেবন করেই যে নৈরাষ্ট্রবাদীরা বিদ্যাসাগর-বিরোধিতায় নিমগ্ন হয়েছেন তা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটিই প্রমাণ করে। "পণ্ডিতের মতে **বাংলার স্বাধীন রাষ্ট্রশক্তির শেষ স্তম্ভ সিরাজউদ্দৌলা** হচ্ছে 'নৃশংস রাক্ষস' এবং ক্লাইভ, মার্কস যাকে বলেছিলেন, 'দস্যুচূড়ামণি', সে হচ্ছে 'অকুতোভয় ও অত্যন্ত সাহসী' এবং সে নাকি 'কঠোর পরিশ্রমের' মধ্যে দিয়ে কোম্পানীর রাজস্ব বৃদ্ধি করে গেছে।"[২১৯] ( বড় হরফ আমাদের )

'বাঙ্গালার ইতিহাসে' ক্লাইভকে অকুতোভয় বলাতে নৈরাষ্ট্রবাদীরা খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু দস্যু চূড়ামণি যে অকুতোভয় হতে পারে না, তা অবশ্য আমাদের জানা নেই। তবে এই ক্লাইভের চরিত্রায়ণেই ওই পুস্তকে বলা হয়েছে, "এই সংবাদ পাইয়া, ক্লাইব প্রথমতঃ একেবারে হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি **ধূর্ত্ততা ও প্রচারকতা** বিষয়ে উমিচাঁদ অপেক্ষা **অধিক পণ্ডিত** ছিলেন, .।"[২২০] ( বড় হরফ আমাদের ) ওই বইতে আরও বলা হল, "ওয়াটসন সাহেব, **ক্লাইবের ন্যায়, নিতান্ত ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য** ছিলেন না। ...ক্লাইব কোনও কর্ম অঙ্গহীন করিতেন না, এবং অভিপ্রেত সাধনের নিমিত্ত সকল কর্মই করিতে পারিতেন। **তিনি ওয়াট্সন সাহেবের**

**নাম জাল করিলেন।**"[২২১] (বড় হরফ আমাদের) ক্লাইভের যুদ্ধ জয়ের একমাত্র কারণ যে তার সাহসিকতা নয়, তা'ও এই পুস্তকে দেখতে পাওয়া যায়। "যদি মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক না হইতেন এবং ঈদৃশ সময়ে এরূপ প্রতারণা না করিতেন, তাহা হইলে, ক্লাইবের, কোনও ক্রমে, জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল না।"[২২২] যে ব্যক্তি প্রকৃত দস্যু চূড়ামণি সে ব্যক্তিই ত একই সঙ্গে 'অকুতোভয়', 'অত্যন্ত সাহসী', 'ধর্মজ্ঞানশূন্য', 'ধূর্ত' ও 'প্রতারক' হতে পারে। এতে ক্লাইভ-প্রশস্তির কি করে প্রমাণ পাওয়া যায়, একমাত্র নৈরাষ্ট্রবাদীরাই তার উত্তর দিতে সক্ষম।

হেষ্টিংস সম্বন্ধে 'বাঙ্গালার ইতিহাসে' কিরকম মূল্যায়ন করা হয়েছে? 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ও মার্শম্যান সাহেবের মূল বইটির তুলনামূলক বিচার করে কোথায় কোথায় বিদ্যাসাগর মূল বই অনুসরণ করেন নি, তা এখানে দেখান সম্ভব নয়। তবে বিদ্যাসাগর মূল বইটির যে সব জায়গায় কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হল নন্দকুমার-হেষ্টিংস সংক্রান্ত বিষয়টি। নন্দকুমার সম্বন্ধে মার্শম্যানের বইতে লিখিত হয়েছে, "...The death of Nundu Koomar has been charged upon Mr. Hastings, because it was believed that he supported the prosecution. But the fact is, that it was the act of Supreme Court, and this was among the complaints which were made against that tribunal some years after. There can be no doubt that Nundu Koomar was one of the most infamous characters among the natives. The Governors of Bengal had, one after another declared him to be unworthy of trust."[২২৩]

১৮৪০ সালে গোবিন্দ চন্দ্র সেন মার্শম্যানের এই বইটির যে অনুবাদ করলেন তাতে এই অংশে বলা হল,

"....নন্দকুমারের মৃত্যুতে সকলে হেষ্টিংসসাহেবকে দোষী বোধ করিলেন কারণ তাঁহাদের বোধ হইল যে তিনি এই বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন কিন্তু ইহার যথার্থ্য এই যে বড়আদালতের ঐরূপ নিয়ম ছিল এবং কিয়ৎ-বর্ষপরে ঐ আদালতের প্রাতিকূল্যে যে সকলবিষয়ের অভিযোগ হয় তাহার

ঐ এক বিষয় ছিল কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে এতদ্দেশীয় সকল লোক অপেক্ষা **নন্দকুমারের চরিত্র অতি কুৎসিত ছিল** বাঙ্গালার বড় সাহেবরা একে ২ অনেকে তাঁহাকে অবিশ্বাসী বলিয়াছিলেন তিনি ইংরাজদিগের বিপক্ষের সহিত মিল করিয়া তাঁহাদের বিদ্রোহ করিবার চেষ্টায় ছিলেন তাহার প্রকাশ হইয়াছিল এবং পলাশীর যুদ্ধের পরে নানাজাতীয়ের সহিত ঐক্য করিয়া ছলনার চেষ্টায় ছিলেন…"২২৪ ( বড় হরফ আমাদের )

আর এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর 'বাঙ্গালার ইতিহাস'-এ কি লিখলেন ? তিনি নন্দকুমারের বিচার সম্পর্কে মন্তব্য করলেন,

"নন্দকুমার এতদ্দেশের একজন অতিপ্রধান লোক ছিলেন। ইংরেজদিগের সৌভাগ্যদশা উদিত হইবার পূর্বে, তাঁহার এরূপ আধিপত্য ছিল যে, ইংরেজরাও বিপদ পড়িলে, সময়ে সময়ে, তাঁহার আনুগত্য করিতেন ও শরণাগত হইতেন। নন্দকুমার দুরাচার ছিলেন, যথার্থ বটে; **কিন্তু ইম্পি ও হেষ্টিংস তাহা অপেক্ষা অধিক দুরাচার, তাহার সন্দেহ নাই।**

"নন্দকুমার, হেষ্টিংসের নামে, নানা অভিযোগ উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস দেখিলেন, নন্দকুমার জীবিত থাকিতে তাঁহার ভদ্রস্থতা নাই; অতএব, যে কোনও উপায়ে, উহার প্রাণবধ করা নিতান্ত আবশ্যক। তদনুসারে, কামালউদ্দীনকে উপলক্ষ করিয়া, সুপ্রীম কোর্টে পূর্বোক্ত অভিযোগ উপস্থিত করেন। ধর্মাসনারূঢ় ইম্পি, গবর্ণর জেনেরলের পদারূঢ় হেষ্টিংসের পরিতোষার্থে, একবারেই **ধর্মাধর্মজ্ঞান ও ন্যায় অন্যায় বিবেচনায় শূন্য হইয়া, নন্দকুমারের প্রাণবধ করিলেন।** হেষ্টিংস, তিন চারি বৎসর পরে, এক পত্র লিখিয়াছিলেন; তাহাতে ইম্পিকৃত এই মহোপকারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছিল।"২২৫ ( বড় হরফ আমাদের )

শুধু ক্লাইভ বা হেষ্টিংসই নয়, 'বাঙ্গালার ইতিহাসে'র কোথাও বৃটিশ শাসকদের প্রশস্তি যেমন গাওয়া হয়নি, তেমনি তারা যে ভারতীয়দের উন্নতির বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে, এমন কথাও বলা হয় নি। তবে তারা প্রত্যেকেই যে নিজেদেব যোগ্যতা অনুযায়ী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোষাগার বৃদ্ধি বা ভারতে কোম্পানির প্রভুত্ব বিস্তার করতে সাহায্য করেছে, তা ত সত্যি। তাই সে উল্লেখ বাঙ্গালার ইতিহাসে মাঝে মাঝেই পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ( ২য় ভাগ ) হল

সিরাজউদ্দৌলার পতন থেকে বেন্টিঙ্ক-এর অবসর গ্রহণ পর্যন্ত তৎকালীন বাংলার প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর বিবরণী মাত্র। আর যেহেতু ভারতীয় ইতিহাসের উপাদানসমূহ তখনও সংগৃহীত হয় নি, সেহেতু বিদ্যাসাগর এই পুস্তকে নিজের ভাষ্য সংযোজন থেকে বিরত থেকেছেন। তাই এই পুস্তকের প্রকৃত মূল্যায়ন হল—এটি কোনক্রমেই বিদ্যাসাগরের বৃটিশ শাসকদের বন্দনার নিদর্শন নয়; বরং সে যুগের বাংলা ভাষায় ইতিহাস রচনার বাস্তব অসুবিধা স্মরণ করলে আমাদের একথাই বলতে হয় যে, আশি বছরের প্রধান প্রধান ঘটনা সম্বলিত 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (২য় ভাগ) ছাত্রদের প্রাথমিক ইতিহাস শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করেছে।

সুতরাং বিদ্যাসাগর প্রণীত সমস্ত পুস্তক পর্যালোচনা করলে এই চিত্রই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, ভাষা-শিক্ষণ পদ্ধতি, রচনাশৈলী ও উপজীব্য বিষয়ের দিক থেকে এই পুস্তকগুলি বাংলা দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করেছে। আর এইভাবে বিদ্যাসাগর সাহিত্যমূলক রচনা ও প্রাথমিক জ্ঞান সম্বলিত পুস্তকাবলীর সাহায্যে আক্ষরিক অর্থে মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রথম ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এই কারণে বাংলা ভাষা সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা রামমোহনের মতই উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগরের এই ভূমিকার কথা স্মরণ করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্য-সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলা নৈপুণ্যের অবতারণা করেন।·· বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছিলেন।"[২২৬]

বাংলা দেশের শিক্ষাবিস্তারের জন্য আধুনিক স্কুল প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন কোন একজন ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় সেকালেও সম্ভব ছিল না, একালেও নয়। তাই বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে বৃটিশ সরকার সৃষ্ট সুযোগের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য আধুনিক নৈরাষ্ট্রবাদীরা বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টার মধ্যেও বৃটিশ স্বার্থ রক্ষার নিদর্শন দেখতে পান। তদানীন্তন বাংলা দেশে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে হ্যালিডের ভূমিকা কি পরিমাণে বিদ্যাসাগর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল অথবা আধুনিক স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিদ্যাসাগরের

উদ্যোগ কতটা কার্যকর হয়েছিল তা বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এখানে শুধু দুটি পরিসংখ্যান স্মরণ করাই যথেষ্ট। ১৮৫৫ সালের ১লা মে থেকে ১৮৫৬ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয় সমূহের সহকারী পরিদর্শক, বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে উক্ত এলাকায় মোট কুড়িটি স্কুল স্থাপিত হয়। আর 'নভেম্বর ১৮৫৭ থেকে মে ১৮৫৮, এই কয় মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।'২২৭ মনে হয়, বর্তমান সরকারী অপদার্থতার যুগে বিদ্যাসাগবেব মত সরকারী কর্মচারীর কার্যকুশলতা সাধারণ মানুষের প্রশংসাই অর্জন কববে।

বিনয় ঘোষ ও নৈরাষ্ট্রবাদীদের সত্য-দর্শনের স্বরূপ

বাংলায় শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের এই ঐতিহাসিক ভূমিকাকে নৈরাষ্ট্রবাদীরা ভারতে বৃটিশ স্বার্থরক্ষা বলে মনে করেন। এঁরা যেহেতু শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক সামাজিক কাবণের উপস্থিতির আবশ্যকতা বোধ করেন না এবং শোষিত মানুষকে নিছক দেবতায় রূপান্তরিত করাকেই বিপ্লবী কাজ বলে ভাবেন, তাই তাঁরা শ্রমিক-কৃষকের নাম শুনলেই উদ্বেল হয়ে পড়েন। এই কারণেই এই সব নৈরাষ্ট্রবাদীরা **সামাজিক পটভূমি** সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে, সেই বিদ্যাসাগরীয় যুগে, শ্রমিক কৃষকের জন্য শিক্ষার চেষ্টাকেই শিক্ষা-বিস্তারের একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। সে যুগের শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে বাস্তব প্রতিকূলতা বিচার না করে এঁরা অভিযোগ করেন,—"সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের দালাল বিদ্যাসাগর জানত যে উদীয়মান শ্রমিক শ্রেণীকে শিক্ষিত করে তুললেই ইংরেজের সোনার লঙ্কায় আগুন লাগবে..... " ইত্যাদি।২২৮

এই একই অভিযোগ উত্থাপন করে 'বৃটিশ ভারতের শিক্ষা ষড়যন্ত্র' প্রবন্ধে লেখা হয়েছে, "প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা চলে যে বিদ্যাসাগরও শিক্ষাকে উচ্চ শ্রেণীগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাব পক্ষপাতী ছিলেন। বাংলা সরকারের কাছে লেখা তাঁর ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯ এর চিঠির বক্তব্য ছিল: 'আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় বাংলা দেশে শিক্ষাবিস্তারের সর্বোত্তম—এবং হয়তো একমাত্র উপায় হিসেবে সরকারের উচিত উচ্চতর শ্রেণীগুলির মধ্যে ব্যাপক শিক্ষার প্রসার করেই ক্ষান্ত থাকা'।"২২৯

কেবলমাত্র নৈরাষ্ট্রবাদী ভাবাদর্শ দ্বারা আচ্ছন্ন ব্যক্তিরাই নন, তথাকথিত

সমাজসচেতন ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষও বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে ঠিক একই অভিযোগ এনেছেন। যেহেতু 'ইতিহাসের গতির পরিবর্তনের সঙ্গে ইতিহাস-বোধও পরিবর্তনশীল', সেহেতু এই পরিবর্তিত ইতিহাসবোধের অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ বিনয় ঘোষ যে সাম্প্রতিক কালে বিদ্যাসাগরের শ্রেণীবদ্ধতা উদ্‌ঘাটনে মনোনিবেশ করেছেন, তা আমরা আগেই দেখেছি। বিনয় ঘোষ বিদ্যাসাগরের শ্রেণীবদ্ধতার স্বরূপ উন্মোচন করে লিখেছেন, "২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯ বিদ্যাসাগর ছোটলাটকে এ বিষয়ে লেখেন :

**An impression appears to have gained ground both here and in England, that enough has been done for the education of the higher classes and that attention should now be directed towards the education of the masses··· An enquiry into the matter will however show a very different state of things. As the best, if not the only practicable means of promoting education in Bengal, the Government should, in my humble opinion, confine itself to the education of the higher classes on a comprehensive scale."**[২৩০]

[ 'এখানে ও ইংল্যাণ্ডে উভয় জায়গাতেই দৃশ্যতঃ একটা ধারণা মূর্ত হয়ে উঠেছে যে, উচ্চতর শ্রেণীগুলোর শিক্ষার জন্য যথেষ্ট করা হয়েছে ; এখন ব্যাপক জনসাধারণের শিক্ষার দিকেই মনোযোগ দেওয়া উচিৎ···এ বিষয়ে অনুসন্ধান করলে অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থাই দেখতে পাওয়া যাবে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় বাংলা দেশে শিক্ষার প্রসারের সর্বোত্তম এবং হয়ত বা একমাত্র বাস্তব উপায় হিসেবে সরকারের প্রচেষ্টা উচ্চতর শ্রেণীগুলোর মধ্যে ব্যাপক আকারে শিক্ষাদানেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।' ( অনুবাদ আমাদের—লেখক ) ]

বিদ্যাসাগরের এই চিঠি থেকে বিনয় ঘোষের সিদ্ধান্ত কি? লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইতিহাসবিদের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত :

"বিদ্যাসাগর, অন্তত শিক্ষার ক্ষেত্রে, নিজের চিন্তাকে যে স্বশ্রেণীর সীমানার বাইরে বেশী দূর পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারেননি, তা তাঁর এই

শিক্ষানীতিব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায়।"২৩১

সাধু! সাধু! বুদ্ধিমান পাঠকমাত্রই অনুমান করতে পারেন যে ইতিহাস বিচারের ক্ষেত্রে বিনয় ঘোষের 'নিজস্ব পদ্ধতি'টি এখানেও অনুসৃত হয়েছে। তাই একবার অনুসন্ধান করে দেখা যাক উপরোক্ত বিদ্যাসাগর-পত্রের প্রথমাংশ কি ছিল। বিনয় ঘোষ উদ্ধৃত বিদ্যাসাগরের উপরোক্ত মন্তব্যের ঠিক আগের অংশটি হল :

"...But I must remark that such education, insignificant as it would be, will not extend to the masses, if by that word is meant the labouring classes; for even now, both in Behar and in Bengal, few, if any, from these classes are to be found among the pupils of those schools.

"This state of things is to be ascribed to the condition of the labouring classes. It is generally so low that they cannot afford to incur any charge on account of the education of their children. Neither can they continue their boys in School, after the latter have attained that age when they become fit for any sort of work, which would secure some kind of remuneration however trifling it may be. They think, and perhaps rightly, that if this children learnt a little of reading and writing, it will not better their condition, and therefore they feel no inducement whatever in sending them to School. It is too much to expect that they would educate their children merely for the sake of knowledge, when even the higher classes do not yet properly appreciate the benefits of education. Under such circumstances it is needless to attempt the education of the lobouring class. But should it be in the contemplation of Government to try the experiment it must be prepared for giving

**education free of all charges. It may be mentioned here, that experiments have been made by private individuals, the results of which have not however satisfactory."**২৩২

বিদ্যাসাগরের এই উক্তির তর্জমা করলে দাঁড়ায় : " কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এইরকম শিক্ষা, যা যতই অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন, তা কিছুতেই জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত হবে না। যদি অবশ্য জনসাধারণ বলতে শ্রমজীবী শ্রেণীগুলিকেই বোঝান হয়। কেননা এখনও পর্যন্ত বিহার ও বাংলার স্কুলগুলোতে যদি কখনও ছাত্রদের এই শ্রেণীগুলি থেকে আসতে দেখা যায়ও তাহলেও তাদের সংখ্যা অল্পই।

"শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির জীবন-ধারণের অবস্থাকেই এই ধরনের অবস্থার কারণরূপে গণ্য করা যায়। সাধারণভাবে তাদের অবস্থা এতই নিম্নমানের যে, তাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য তারা কোনরকম ব্যয়ই বহন করতে পারে না। এমনকি যখন তাদের সন্তানরা যে-কোন ধরনের কাজ করার মত উপযুক্ত বয়সে পদার্পণ করে এবং যত সামান্যই হোক কিছু পারিশ্রমিক আয় করার জন্য সক্ষম হয়ে ওঠে, তখন এই সন্তানদের আর তারা স্কুলেও পাঠাতে পারে না। তারা মনে করে, এবং সম্ভবতঃ তা সঠিকভাবেই মনে করে যে, যদি তাদের সন্তানরা সামান্য কিছু হাতের লেখা ও পড়া শেখেও তা তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটাবে না। ফলতঃ তারা সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর জন্য কোন প্রেরণাই বোধ করে না। যখন এমনকি উচ্চতর শ্রেণীগুলোই এখনও শিক্ষার সুফলকে পর্যাপ্তভাবে প্রশংসা করে উঠতে পারে নি, তখন এ-প্রত্যাশা বোধ হয় খুবই বেশী হয়ে যাবে যে শ্রমজীবী শ্রেণীগুলো নিছক জ্ঞান লাভের জন্য তাদের সন্তানদের লেখা-পড়া শেখাবে। এরকম অবস্থায় শ্রমজীবী শ্রেণীগুলোর শিক্ষার প্রচেষ্টা অর্থহীন। কিন্তু যদি এটা পরীক্ষা করে দেখা সত্য সত্যই সরকারের অভিপ্রায় হয়, তা'হলে সরকারকে অবশ্যই **সম্পূর্ণ অবৈতনিক শিক্ষাদানের** জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এইরকম পরীক্ষা কিছু করা হয়েছে, যার ফল অবশ্য সন্তোষজনক হয় নি।" ( বড় হরফ আমাদের )

এই পত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, বিদ্যাসাগর কি কারণে শিক্ষাকে সে সময়ে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁর

পরামর্শটি কোন অসৎ উদ্দেশ্যে রচিত ছিল না ত বটেই, বরং এটি ছিল একটি বাস্তব পরামর্শ। বিদ্যাসাগর কোন কল্পনাপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন নি বলেই শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বাস্তব অসুবিধাগুলি অনুধাবন করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপব হযেছিল। নিছক কিছু অক্ষর-পরিচয় থেকে শ্রমজীবী জনগণ যে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে ক্ষুন্নিবৃত্তিকেই অগ্রাধিকার দেন—তা কি বাস্তব সত্য নয় ? বাস্তব অভিজ্ঞতাই বিদ্যাসাগরকে শিক্ষা দিয়েছিল, শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উপযুক্ত সময তখনও বাংলাদেশে আসেনি। তাই তাঁব সুপারিশ—উচ্চশ্রেণীর (মধ্যবিত্ত সহ) মধ্যে ব্যাপক শিক্ষার প্রসার। আব যদি সবকাবেব একান্ত ইচ্ছা হয়, সাধাবণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন, তা'হলে তা পরীক্ষামূলকভাবে করা যেতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে শিক্ষা হবে **সম্পূর্ণ অবৈতনিক** ('free of all charges')। এইটি হল বিদ্যাসাগরের মন্তব্যের অন্তঃসাব। বিদ্যাসাগর যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন—তা তর্কাতীত। আব এই কাবণে বিদ্যাসাগরের কাছে শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রত্যাশা যেমন বেকুবি ছাড়া কিছু নয়, তেমনি তাঁর মধ্যবিত্ত শ্রেণী-চরিত্র প্রমাণের চেষ্টাও পণ্ডশ্রম মাত্র। এক্ষেত্রে আসল বিচার্য বিষয় হল, আলোচ্য সময়ে ভারতবর্ষে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্র কতদূর প্রস্তুত ছিল ? যে কোন বুর্জোযা সমাজেব ইতিবৃত্তেই বিদ্যাসাগর-উক্তির যাথার্থ্যের প্রমাণ মেলে। পৃথিবীব কোন দেশে ধনতান্ত্রিক বিকাশেব প্রথম পর্বেই শ্রমজীবী জনগণের জন্য শিক্ষাব দ্বাব উন্মুক্ত হয়নি। বস্তুতঃ আধুনিক শিল্পই শ্রমজীবী জনগণ ও শিক্ষাব মধ্যে সেতু রচনা করে। একদিকে আধুনিক শিল্পে শিক্ষিত শ্রমিকের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা আর অন্যদিকে শিল্পের সংস্পর্শে শ্রমিকশ্রেণীর শিক্ষাব প্রতি আগ্রহ—এই যুগপৎ প্রক্রিয়ার ফলেই বিভিন্ন দেশে সাধারণেব মধ্যে শিক্ষার প্রচলন। এ ছাড়া শোষিত মানুষের শিক্ষা (বুর্জোয়া), শুধু বুর্জোয়া শিক্ষা কেন, রাজনৈতিক শিক্ষার প্রথম পর্বেও বুদ্ধিজীবীদের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। তা না হ'লে ত কোন একজন শ্রমিক-সন্তানের পক্ষেই মার্কসবাদ আবিষ্কার সম্ভব হত। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে, যেখানে নবজাগরণের দিন থেকে শিক্ষার দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, সে সমস্ত দেশে কি বিগত শতকের মধ্যভাগেও সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ছিল না ? তাই প্রতিটি আধুনিক দেশে

সর্বজনীন শিক্ষার আগে থাকে পণ্য-অর্থনীতি এবং সমাজের এক ক্ষুদ্রাংশের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এক সুদীর্ঘ ইতিহাস, যার মধ্য থেকেই জন্ম নেয়, শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে শিক্ষা-প্রসারের জন্য উপযুক্ত বুদ্ধিজীবীশ্রেণী। উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিঃসন্দেহে গত শতাব্দীর মধ্যভাগের ভারতবর্ষ থেকে অনেক উন্নত ছিল। কিন্তু সেখানেও সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-গত অবস্থা কি রকম ছিল? "সরল কৃষিজ জীবনে সে সময় (উনিশ শতকের শুরুতে—বর্তমান লেখক) সর্বজনীন শিক্ষার জন্য কোন বিশেষ অর্থনৈতিক প্রেরণা ছিল না,…। এই শতকের সূচনায় শিক্ষা জনগণের জন্যে ছিল না, ছিল শ্রেণীগুলির জন্যে; এবং তা'ও ছিল পুরুষদের জন্যে, নারীদের জন্যে নয়।"[২৩৩]

এই সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়, হার্ভার্ড-এর ছাত্র সংখ্যা ছিল মোট তিনশ। আর প্রিন্সটনের ছাত্র সংখ্যা সেখানে মাত্র ষাট থেকে সত্তর।

সুতরাং ভারতের মত একটি দেশে যখন রেলওয়ে প্রচলনের মাধ্যমে সবেমাত্র আধুনিক শিল্পের সূচনা হয়েছে, যখন উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি এবং শিক্ষার বাহক বুদ্ধিজীবীরা শ্রেণী হিসাবে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, সে সময় সর্বজনীন শিক্ষার প্রচেষ্টা কি অনিবার্যভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য নয়? বিদ্যাসাগর সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আগে প্রয়োজন উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা, যা একদিকে সাধারণ মানুষকে সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করবে, এবং অপরদিকে সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক সরবরাহ করবে। আর এই প্রক্রিয়ার ফলে সাধারণ মানুষ ক্রমশঃ শিক্ষার প্রতি আকৃষ্টও হবে। তাই বিদ্যাসাগরের উক্ত পরামর্শকে কোনক্রমেই শ্রমিক-বিরোধী মতামত আখ্যা দেওয়া যায় না, বরং এটি হল তাঁর তীক্ষ্ণ বাস্তবতাবোধ ও ইতিহাসবোধের পরিচায়ক।

এই হল সমাজ সচেতন বিনয় ঘোষের সত্য-দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ। আর উল্লিখিত পত্রের যে অংশে বিদ্যাসাগর তৎকালীন শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে অসুবিধাগুলির বাস্তব বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে সম্পূর্ণ অবৈতনিক শিক্ষার সুপারিশ করেছেন, সেই অংশটি উল্লেখ না করে কেবলমাত্র শেষাংশ উদ্ধৃত করাই হল তাঁর শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু এ বিষয়ে

বিদ্যাসাগর উত্থাপিত যুক্তি খণ্ডনে ব্যর্থ হয়ে, বিদ্যাসাগরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী-চরিত্র প্রমাণের জন্য অবশেষে বিনয় ঘোষ নামক তথাকথিত প্রগতিশীল ইতিহাস-বিদকে বিমূর্ত মানবিকতার সুড়সুড়ি দিয়ে বলতে হয়েছে, "তাঁর বিবৃতির মধ্যে যুক্তিহীন কথা নেই। সাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করে তিনি যা বলেছেন তাও ঐতিহাসিক সত্য।" তা'হলে? "কিন্তু যুক্তি ও সত্যের উপরেও, অন্তত তাঁর মতো উদার আদর্শবাদী পুরুষের কাছ থেকে, দেশের জনসাধারণ বড়ছোট নির্বিশেষে আরও বেশী সহানুভূতি দাবী করতে পারে। সেই সহানুভূতি এই উক্তির মধ্যে বেশ একটু বেসুরে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে, একথা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বললে নিশ্চয় রূঢ় শোনাবে। কিন্তু তা শোনালেও যা সত্য তা বলতে হয়। বিদ্যাসাগর, অন্তত শিক্ষাব ক্ষেত্রে ....." ইত্যাদি।[২৩২] বাহবা পরিবর্তিত ইতিহাসবোধ!

ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বলে অনেকেই বিদ্যাসাগরকে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলনকারীরূপে চিত্রিত করে থাকেন। যদি বিদেশী শাসনাধীন একটি দেশে শাসক দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অনুসরণই ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার একমাত্র নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্য হয়, তা'হলে হয়ত ১৮৩৫ সালের মেকলের শিক্ষা-সংক্রান্ত ঘোষণাকেই ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সূত্রপাত বলা যেতে পারে।

**বিদ্যাসাগর—ঔপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলনকারী?**

কিন্তু এখানে যে বিষয়টি স্মবণ রাখা প্রয়োজন তা হল, শাসক দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা অনুসরণের অর্থই ঔপনিবেশিক শিক্ষা নয়। আসলে কোন একটি শাসিত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যথার্থ ঔপনিবেশিক চরিত্রের কি না, তা বিচারের প্রধান বিষয় হল—দেশীয় প্রয়োজন ও ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতির প্রগতিশীল উপকরণ সমূহকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সেই দেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা—কাঠামো ও অন্তঃসারের দিক থেকে শাসক দেশ কর্তৃক শোষণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে কি না। বিদ্যাসাগরীয় সমাজে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার বিশ্লেষণ বর্তমান আলোচনার পরিধি-বহির্ভূত এবং তার জন্য পৃথক ও গভীর বিশ্লেষণের প্রয়োজন। তাই আমরা দু'একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করছি মাত্র। প্রথমতঃ স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যে কোন পরাধীন দেশে কেবলমাত্র শাসকদের পক্ষে ঔপনিবেশিক ভাবাদর্শ প্রচার সম্ভব নয়। শাসকগোষ্ঠী

শাসিত দেশে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে তার যে আশ্রয়ী, পরজীবী অংশের সৃষ্টি করে, একমাত্র তারাই এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম। আলোচ্য সময়ে ভারতবর্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিকাশের সূচনা হচ্ছিল মাত্র, আর সেই শিক্ষিত ব্যক্তিদের সংখ্যাও ছিল নিতান্ত নগণ্য। এই নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু কিছু যোগ্যতাসম্পন্ন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি থাকলেও, একটি ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য শাসকগোষ্ঠীর আশ্রিত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির যে ব্যাপক সংখ্যার প্রয়োজন তা ভারতবর্ষে তখনও সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের শেষ দিকেই ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা একটি শ্রেণী হিসাবে গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রধান উপকরণ—স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূত্রপাতও গত শতকের মধ্যভাগে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ-যোগ্য যে স্কুল বা কলেজের নয়, কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু, ছিন্নমূল অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী একদল বুদ্ধিজীবী মারফৎই কোন একটি শাসিত দেশে ঔপনিবেশিক শিক্ষাদর্শ প্রচার সম্ভব, যা অবশেষে স্কুল ও কলেজ শিক্ষাকেও প্রভাবিত করে। আলোচ্য সময়ে ভারতবর্ষে কলেজের সংখ্যা ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এমনকি যে বিশ্ববিদ্যালয় হল ঔপনিবেশিক ভাবাদর্শ প্রচারের পীঠস্থান, সেগুলির আনুষ্ঠানিক সূচনাও ১৮৫৭-৫৮ সালে। সুতরাং বলা যেতে পারে আলোচ্য সময়ে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহের গোড়াপত্তন হচ্ছে মাত্র।

তৃতীয়তঃ, যে কোন দেশের শিক্ষাগত মান নির্ভর করে সেই দেশের অর্থনৈতিক স্তরের ওপর। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে বৃটিশ শিল্প-বাণিজ্যের যে স্তর ছিল, তার জন্য সামান্য ইংরেজী জানা ব্যক্তিই যথেষ্ট ছিল। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় পারদর্শী ব্যাপক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির প্রয়োজন তৎকালীন ইংরেজ পরিচালিত ভারতীয় অর্থনীতির দেখা দেয় নি। তাই বিগত শতকের প্রথম দিকে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার কোন তাগিদ অনুভব করে নি। একমাত্র কিছু সংখ্যক প্রগতিশীল ভারতবাসীই দেশীয় উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁদের সাধ্যানুযায়ী কিছু বাস্তব কাজও করেছিলেন। আমহার্স্টকে লিখিত রামমোহনের পত্রটিই হল ভারতবাসীর

পক্ষ থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর চরম উদাসীনতার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ। রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের দাবীতে যে আন্দোলনেব সূত্রপাত করেন সেটি পরবর্তীকালে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এছাডা ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রবর্তনের বিষয়ে বৃটিশ শাসক-গোষ্ঠীর প্রগতিশীল অংশ ও বেশ কিছু বিদ্যোৎসাহী ইংরেজরাও আগ্রহ প্রদর্শন করেন। বলা বাহুল্য, এই সব ইংরেজরা ছিলেন অবাধ প্রতিযোগিতার দর্শনেরই অনুগামী। তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডে বুর্জোয়া আঁলোকপ্রাপ্তির সর্বাত্মক বিকাশের ফলে এবং অবাধ প্রতিযোগিতার দর্শনের প্রভাবে যে শিক্ষা আন্দোলন সুরু হয় তার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বেব অনগ্রসব দেশগুলিতে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। আর সেই আন্দোলন ছিল সাধারণ মানুষকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত ধর্মীয় আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের এই প্রগতিশীল ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সাফল্যেব ফলেই ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার সূত্রপাত।

এছাড়া যদি তদানীন্তন ভাবতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঔপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থা হিসাবেও গণ্য করা যায়, তা'হলেও সে সময় একজন প্রগতিশীল শিক্ষাবিদের পক্ষে কি স্বাধীনতা প্রেমেব পরিচয় দেওয়ার জন্য মৃতপ্রায় দেশীয় শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণ কবাই যুক্তিযুক্ত ছিল? যাঁরা আজ বিদ্যাসাগরের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন তাঁরা ভুলে যান যে, সে যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষাই ছিল সর্বাধুনিক শিক্ষা। শুধু তাই নয়, সেই পাশ্চাত্য শিক্ষা ছিল বিশুদ্ধ বুর্জোয়া শিক্ষা, যা ছিল সাধারণ মানুষকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার এক ফলপ্রসূ অস্ত্র। আর এই শিক্ষার মধ্য দিয়েই ত পৃথিবীর সর্বাধুনিক রাজনৈতিক মতবাদগুলির জন্ম; এমন কি মার্কসবাদেরও। তাই ভারতবর্ষে বিদ্যাসাগবের পাশ্চাত্য শিক্ষার স্বপক্ষে বাস্তব কাজ হল প্রকৃত প্রগতিশীল কাজ, যা শেষ বিচারে আঘাত করেছিল ভাবতীয় সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতিকে, এবং প্রস্তুত করেছিল পরবর্তীকালের রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য উপযুক্ত বাস্তব ভিত্তি। আলোচ্য সময়ে ভারতবর্ষে বুদ্ধিজীবীরা যে একটি শ্রেণী হিসাবে গড়ে ওঠে নি এবং এই আধুনিক শিক্ষাই যে ভারতবাসীর প্রগতির অন্যতম কারণ হবে তার উল্লেখ কার্ল মার্কসের রচনায়ও লক্ষ করা যায়। "কলকাতায়

ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছা সহকারে ও স্বল্প পরিমাণে শিক্ষিত ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠছে যাঁরা সরকার পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত। ... সেদিন দূরে নয়, যখন রেলওয়ে ও বাষ্পীয় পোতের সমন্বয়ে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যেকার দূরত্ব সময়ের পরিমাপে কমে আসবে আট দিনে এবং এই **একদা-রূপকথার দেশটা এই ভাবে সত্য করেই পাশ্চাত্য জগতের অন্তর্ভুক্ত হবে।**"[২৩] ( বড় হরফ আমাদের )

মার্কস যখন ভবিষ্যৎ ভারতকে পাশ্চাত্য জগতের অন্তর্ভুক্ত হতে দেখে আনন্দ পান, তখন তা নিশ্চয়ই তিনি ঔপনিবেশিক স্বার্থরক্ষার তাগিদে করেন না ; সে আনন্দ তিনি লাভ করেন একটা সেকেলে ঘুণধরা সমাজের আধুনিকী-করণ দেখে। বলা বাহুল্য, এই আধুনিকীকরণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সর্ত ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার। আর সেই জন্যই সেই শিক্ষা হল একটি যথার্থ প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা।

সুতরাং, যে শিক্ষাব্যবস্থা একটা দেশের প্রগতির কারণ তাকে আর যাই বলা যাক ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে যে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে তার সূত্রপাত বলা যেতে পারে বিগত শতকের শেষ দিকেই। এই সময় থেকে একদিকে যেমন বৃটিশ শাসকবর্গ অর্থনৈতিক শোষণের জন্য দেশীয় প্রয়োজন উপেক্ষা করে নিজ-পরিকল্পিত শিক্ষার ব্যবস্থা করে, তেমনি অন্যদিকে বেশ কিছুটা সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন ক'রে বৃটেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের স্বার্থে ভারতে গড়ে তুলেছিল ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থ নয়, এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই হল ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান কারক। এই পরিকল্পনার ফলেই উনিশ শতকের মধ্যভাগে যে বিশুদ্ধ বুর্জোয়া শিক্ষার আলো ভারতে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল, সেই শিক্ষার অন্তঃসার বর্জন করে শুধুমাত্র তার কাঠামোগত ও প্রথাগত দিকটাই হয় ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর সে শিক্ষার উদ্দেশ্য জনসাধারণের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন নয়, তার একমাত্র উদ্দেশ্য বৃটিশ সমর্থক একদল পরজীবী বুদ্ধিজীবী ও আমলা সৃষ্টি। সে সময় ভারতবর্ষে অপেক্ষাকৃত বিকশিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের অস্তিত্ব ও আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রসার বৃটিশ শাসকবর্গের এই পরিকল্পনাকে

সার্থক করে তুলেছিল। একটি দেশ যেহেতু একটি বিদেশী শক্তি দ্বারা শাসিত ও শোষিত হচ্ছে, অতএব তার শিক্ষাব্যবস্থাও হবে ঔপনিবেশিক চরিত্রের—এ হল সম্পূর্ণ যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। বাস্তবিকপক্ষে যাঁরা উনিশ শতকের মধ্য ভাগের ভারতবর্ষে সীমিত পরিমাণে প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ঔপনিবেশিক চরিত্রের বলে বর্ণনা করেন, তাঁবা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের কষ্টকর পথ পরিহার করে এই যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীই গ্রহণ করছেন।

আধুনিক নৈরাষ্ট্রবাদীরা ইতিহাস বিচারের ক্ষেত্রে এই যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন বলেই তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ভারতীয় সমাজের অগ্রগতির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করার কোন কারণ খুঁজে পান না। আর সে-কারণে এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরেব সক্রিয় ভূমিকা তাঁদের কাছে বৃটিশ স্বার্থ রক্ষারই নামান্তর মাত্র। শুধু তাই নয়, বিদ্যাসাগর কলেজ পাঠ-ক্রমের মাধ্যমে যে ছাত্রদের ভাববাদী হিন্দু দর্শনের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, অথবা বিধবা বিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিষয়ে বিদ্যাসাগরের বাস্তব কার্যক্রম যে ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে একটি প্রকৃত সংগ্রাম ছিল তাও এই সব বিদ্যাসাগর-সমালোচকদের চোখে মূল্যহীন। এই কারণেই বিধবা বিবাহ প্রবর্তন বা বাল্যবিবাহ নিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় জনমত গঠনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের হিন্দু শাস্ত্র ব্যবহারের মধ্যে এঁরা হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্যাসাগরের গভীর আসক্তির প্রমাণ পান এবং বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতিকে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি আখ্যা দিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন না। আসলে ইতিহাস সম্পর্কে সহজাত অজ্ঞতার ফলে এঁরা সে যুগের ধর্মীয় পরিমণ্ডলের পাশাপাশি বিদ্যাসাগরের উজ্জ্বল বস্তুবাদী কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন।

**হিন্দু পুনরুত্থানবাদ ও সর্বভারতীয় রাজনৈতিক অনৈক্য**

সে যুগেব ধর্মীয় পরিমণ্ডলের স্বরূপ কেমন ছিল? সাধারণভাবে হয়ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুধর্ম ও গোঁড়া পণ্ডিতদের কার্যকলাপের উল্লেখই যথেষ্ট। কিন্তু কেবলমাত্র গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিতবাই নয়, বৃটিশ শক্তিও এই হিন্দু ধর্মকেই বেছে নিয়েছিল তৎকালীন ক্রমবর্ধমান সামাজিক অগ্রগতি শুদ্ধ করার এক ফলপ্রসূ অস্ত্র হিসাবে। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দর্শনের সান্নিধ্যে সীমীত পরিমাণে হলেও ভারতীয়দের মধ্যে যে জাতীয় চেতনা ও রাজনৈতিক সচেতনতার সঞ্চার হচ্ছিল তাকে বিপথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ শাসকবর্গ বিগত

শতকের ষষ্ঠ দশকে যে পরিকল্পনা রচনা করল তার পরিণামেই হিন্দু পুনরুত্থান-বাদী আন্দোলনের সৃষ্টি। এই হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন কিন্তু গোঁড়া, অশিক্ষিত ও অসংস্কৃত পণ্ডিতদের পরিচালনায় গড়ে উঠল না। এর নেতৃত্বের পদে দেখা গেল বহু ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত খ্যাতনামা ব্যক্তিদের। তাই যে ধর্মীয় আন্দোলন বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল ও আপামর জনসাধারণকে বেশ কিছুটা প্রভাবিতও করেছিল, একমাত্র সেই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই বিদ্যাসাগরের ভাববাদী হিন্দু দর্শন ও লোকাচারের প্রবল বিরোধিতার অসাধারণ গুরুত্বটি অনুধাবন করা সম্ভব।

বৃটিশ রাজশক্তি ভারত অধিকারের প্রথম দিন থেকেই যে সম্প্রদায়কে তার সব থেকে বিপদের কারণরূপে গণ্য করে সেটি হল মুসলমান সম্প্রদায়। কারণ শুধু কেন্দ্রীয়ভাবে নয়, আঞ্চলিকভাবেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল এই ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়েরই করায়ত্ত। তাদের শাসনক্ষমতা থেকে উৎখাত করেই বৃটিশ শক্তি ভারত অধিকার করে। মুসলমান সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ সংহতি ও ভারতের পার্শ্ববর্তী বহু মুসলমান রাজ্যের অস্তিত্বের ফলে বৃটিশ শাসকবর্গ সব সময়ই ভারতীয় মুসলমানদের বিদ্রোহ সম্পর্কে শঙ্কিত থাকত। বিশেষতঃ সিপাহী বিদ্রোহের পরে তাদের এই আতঙ্ক আরও বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে সাধারণভাবে হিন্দুরা মুসলমান সাম্রাজ্যের পতন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনই ছিল। সেকারণে বৃটিশ রাজশক্তি ভারতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য এই হিন্দুদের ওপরই নির্ভর করে।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মোকাবিলা করার জন্য বৃটিশ শক্তি যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে তার মূল বিষয় হল মুসলমানদের প্রতিযোগী হিসাবে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠা করা, এবং সর্বভারতীয় ঐক্য যাতে গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। ষষ্ঠ দশক থেকে শুরু হয় বৃটিশ পক্ষ থেকে হিন্দুদের ধর্ম, ঐতিহ্য প্রভৃতি সম্পর্কে অবিশ্রান্ত প্রশংসাবাণী বর্ষণ। বৃটিশ ধনতন্ত্র যতই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করতে থাকে ততই এই কৌশলটি বৃটিশ শাসকবর্গের একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা হিসাবে স্থান পায়। তাই দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিভিন্ন ইউরোপীয়দের গবেষণাকে ব্যবহার করে বৃটিশ শাসকরা

হিন্দুদের প্রাচীন ঐতিহ্যের জয়গানে মুখরিত হয়ে ওঠে। এই সময় কোন কোন গবেষক যেমন প্রচার করলেন যে 'ভারতীয় ইতিহাস মানে হিন্দুদের ইতিহাস', তেমনি কোন কোন গবেষক প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলেন—হিন্দু ও ইউরোপীয়দের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ উভয় সম্প্রদায়ই আর্য-গোষ্ঠীর বংশোদ্ভূত। এই সব গবেষকদের প্রচার কি আকার ধারণ করেছিল তা হিন্দু পুনরুত্থানবাদের গোঁড়া সমর্থক, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের জবানীতেই শোনা যাক। "১৮৬১ খৃষ্টাব্দ থেকে আলেকজাণ্ডার ক্যানিং-হামের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত নিয়মিত পুরাতাত্ত্বিক অভিযান ও খননকার্য এবং ম্যাক্সমূলার, উইলসন, ফার্গুসন্, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও অন্যান্যদের আরও জনপ্রিয় ধরনের রচনা শিক্ষিত ভারতবাসীর সামনে প্রাচীন ভারতবর্ষের অতীত গৌরব ও মহত্ত্ব, যা ভারতকে গ্রীস ও রোমের সঙ্গে এক আসনে স্থাপিত করেছিল, সে সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট ও বৃহৎ চিত্র তুলে ধরে। এটি হিন্দুদের অতীত সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং পৃথিবীর ইতিহাসে তারা যে একদা একটা মহান জাতিরূপে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল—এই চেতনায় হিন্দুদের উদ্দীপিত করে তোলে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে তাদের মনে একটা আত্মবিশ্বাসের বোধ জেগে ওঠে এবং তাদের সামনে ভবিষ্যতের একটা উজ্জ্বল ছবি ফুটে ওঠে। ইউরোপীয় গবেষকদের দ্বারা উপস্থাপিত মতবাদ—**ইউরোপের প্রাচীন ও বিখ্যাত জাতিসমূহ ও হিন্দুদের পূর্ব পুরুষগণ একই মানবগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত;** হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদ জগতের প্রাচীনতম সাহিত্যকীর্তি, উপনিষদে এমন সব সুগভীর দার্শনিক চিন্তাভাবনার প্রকাশ আছে যা এখনও মানুষ ধাবণা করতে পারে নি · এই সব কিছু হিন্দুদের হৃদয়কে গভীরভাবে আলোড়িত করতে ব্যর্থ হয় নি। আর তার ফলেই **তারা জাতীয়তাবাদ ও জ্বলন্ত দেশপ্রেমের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল।**"[২৩৬] (বড় হরফ আমাদের)

হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য সম্পর্কে এই পরিকল্পিত প্রচারের পরিণাম কি হল? একদিকে প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য সম্পর্কে বৃটিশ শাসকদের আকাশচুম্বী প্রশংসা ও অন্যদিকে ডিরোজিওপন্থীদের অতি নাস্তিকতা—যুগপৎ এই দুই প্রক্রিয়ার ফল হিসাবে দেখা গেল যে একদল উচ্চশিক্ষিত বাঙালী হিন্দু-ভাবধারার পুনরুজ্জীবনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এই বিষয়ে প্রধান ভূমিকা

গ্রহণ করলেন রাজনারায়ন বসু। ১৮৬৫ সালের ৭ই অগাষ্ট এই হিন্দুভাবধারা প্রসারের উদ্দেশ্যে রাজনারায়ন বসুর উদ্যোগে ও নবগোপাল মিত্রের সম্পাদনায় প্রতিষ্ঠিত হল 'ন্যাশনাল পেপার'। বিদেশী শিক্ষার কুফল নিবারণের জন্য রাজনারায়ন বসু প্রয়োজন বোধ করলেন জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির, অর্থাৎ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের গৌরব বৃদ্ধির এবং সেই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হল 'গৌরবেচ্ছু সঞ্চারিণী সভা।' ১৮৬৬ সালে রাজনারায়ন বসু '*A society for the Promotion of National feeling among the Natives of Bengal*' গঠন করার প্রাক্কালে যে অনুষ্ঠানপত্র রচনা করলেন তাতে বিবৃত হল এ বিষয়ে কর্তব্যাবলী। আর অনুষ্ঠান পত্রে যা বিবৃত হল তাকে রূপ দেওয়ার জন্য ১৮৬৭ সালে 'হিন্দুমেলা' বা 'জাতীয় মেলা'র আয়োজন করা হল। উক্ত সোসাইটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রাজনারায়ন বসু বললেন :

"এখন বাংলার অভ্যন্তরে ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা প্রবেশ করেছে। বাঙালী চেতনা ঘুম থেকে জেগে উঠছে। বাঙালী সমাজে অবিরাম আলোড়ন চলছে। সর্বত্র পরিবর্তন ও প্রগতির ইচ্ছা দেখা যাচ্ছে। পুরনো রীতি-নীতি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তিরা সংস্কার সাধনের জন্য আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছে। ইতিমধ্যে একদল যুবক এখনই হিন্দু সমাজ থেকে নিজেদের বিযুক্ত করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। আশঙ্কা হচ্ছে যে আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে যে সব ভাল জিনিস আমরা অর্জন করেছি তা বুঝি বা এই বিপ্লবের জোয়ারে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং সংস্কারগুলোকে একটা জাতীয় রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা যাচ্ছে যে, বাংলার শিক্ষিত অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয় চেতনার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দেশীয় সমাজের প্রভাবশীল সদস্যদের একটি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা হোক। জাতীয় চেতনার প্রকৃত অনুশীলন ব্যতীত কোন জাতিই মহান হয়ে উঠতে পারে না। সকলের কাছেই এটি ইতিহাস দ্বারা একটি পরীক্ষিত সত্য।"[২৩৭]

বিদেশী শিক্ষার কুফল প্রতিহত করার জন্য এবং শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে জাতীয়ভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজনারায়ণ বসু যে কর্মসূচী প্রণযন করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল—

"১। ন্যাশনালিটি প্রমোশন সোসাইটি সর্বপ্রথম **জাতীয় ব্যায়াম** ও

খেলাধূলার পুনরুজ্জীবনের জন্য সর্বোত্তম প্রচেষ্টা চালাবে।

"২। **হিন্দু সঙ্গীত** শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে…সোসাইটি একটি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করবে।

"৩। ……সোসাইটি একটি **হিন্দু ঔষধের স্কুল**ও প্রতিষ্ঠা করবে যেখানে ভুলভ্রান্তি ও অবিশ্বাস্যতা থেকে মুক্ত করে হিন্দু ভৈষজ্যবিদ্যা ও ব্যবহারিক চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হবে।

"৪। ……সোসাইটি ভারতীয় সভ্যতা বিষয়ে **ইউরোপের সংস্কৃত গবেষকগণের গবেষণার ফলাফল বাংলা ভাষায় প্রকাশ করবে**; বিশেষ করে প্রাচীন ভারতের শ্রীবৃদ্ধি ও গৌরবের বিষয়, শারীরিক, বুদ্ধি-বৃত্তিগত, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক দিকগুলি সম্বন্ধে তাঁদের বর্ণনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।"[২৩৮] (বড় হরফ আমাদের)

ধীরে ধীরে প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য সম্পর্কে পরিকল্পিত বৃটিশ প্রচার তৎকালীন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেলল। ডিরোজিওপন্থীদের অতিনাস্তিকতা ও গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিতদের মিথ্যা প্রচারে সে সময় সমাজে যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই অবস্থাই হিন্দুধর্ম প্রসারের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করল। ফলে 'ন্যাশনাল সোসাইটি' ও 'হিন্দু মেলা' হল হিন্দু পুনরুত্থানবাদেব সূত্রপাত। ন্যাশনাল সোসাইটি বা হিন্দু মেলার উদ্যোক্তারা সবাই বৃটিশ শাসকদেব আশ্রয়ী ছিলেন, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে রাজনারায়ণ বসুর মত ব্যক্তিরা ছিলেন যথার্থই স্বদেশপ্রেমিক এবং প্রথম দিকে তাঁদেব উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র বাঙালীদের অন্ধ ইংরেজ-অনুকরণপ্রিয়তারই বিরোধিতা করা। কিন্তু স্বচ্ছ রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞানেব অভাবের দরুন তাঁরা বাস্তবে বৃটিশ কৌশলের অচেতন শিকারে পরিণত হন। হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠাতা রাজনারায়ণ বসু সঠিকভাবেই বলেছিলেন, 'জাতীয় চেতনার প্রকৃত অনুশীলন ব্যতীত কোন জাতিই মহান হয়ে উঠতে পারে না', কিন্তু ভ্রান্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে ভারতবর্ষে একটি ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয়দের একাংশকে ঐক্যবদ্ধ করে জাতি গঠন করাই তদানীন্তন ভারতবাসীর কর্তব্য। তাঁর জাত্যাভিমানের ফলে তিনি ভারতবাসী বলতে

শুধুমাত্র হিন্দুদেরই দেখতে পেলেন। আর বুঝতে অপারগ হলেন যে, সে যুগের দাবী ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু বা মুসলমান জাতি গঠন নয়, সে যুগে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সর্বভারতীয় ঐক্য, যা বিভিন্ন ভারতীয় জাতির বিভেদ দূর করে গড়ে তুলবে একটা সর্বভারতীয় চিন্তাধারা এবং সেটাই হবে ভারতের বৈষয়িক উন্নতি ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় পূর্বসর্ত। এই ভ্রান্ত দৃষ্টিই ছিল ন্যাশনাল সোসাইটির উদ্যোক্তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই অন্ধ ইংরেজ-অনুকরণপ্রিয়তা 'দূর করার জন্য তাঁরা যেমন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলেন, তেমনি হিন্দুজাতির গৌরব বৃদ্ধিকেই বেছে নিলেন ইংরেজ অনুকরণপ্রিয়তা প্রতিরোধের একমাত্র অস্ত্র হিসাবে। ঠিক সেই কারণে তাঁদের কর্মসূচীতে স্থান পেল সর্বপ্রকার হিন্দু ভাবধারা—হিন্দু ব্যায়াম থেকে হিন্দু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন। কালক্রমে এই হিন্দু ভাবধারার প্রতি নিঃসর্ত আসক্তিই সৃষ্টি করল প্রবল হিন্দু ধর্মোন্মাদনা। এমন কি রাজনারায়ণ বসুর মত ব্যক্তিও স্বদেশ প্রেম থেকে বিচ্যুত হয়ে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতায় অন্ধ বিশ্বাসী হয়ে পড়লেন। ১৮৭২ সালে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু যে বক্তৃতা করেন, সে সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন; "১৮৭২ সালে তিনি এক বক্তৃতায় 'ইউরোপীয় ও খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্র ও সভ্যতা থেকে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতা' সম্পর্কে জোরাল দাবী জানান।"[২৩৯]

এইভাবে বৃটিশ পরিকল্পনাকে সফল করে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ সৃষ্টি করল উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও চরম মুসলমান বিদ্বেষ। একদিকে এই দৃষ্টিভঙ্গীর চরম প্রকাশ ঘটল বঙ্কিমচন্দ্রেব বহু উপন্যাসে আর অন্যদিকে জন্ম নিল শ্রীরামকৃষ্ণের 'ভাবধারা'। ব্রাহ্মধর্মের প্রবক্তারাও এর প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে অক্ষম হলেন। তাই কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দু ভাবধারায় সিক্ত করার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্ম ধর্মে সংযোজন করলেন হিন্দু ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ। মনে রাখা প্রয়োজন, হিন্দু পুনরুত্থানবাদের ফলাফল কিন্তু এখানেই শেষ হল না, উনবিংশ শতক অতিক্রম করে বিংশ শতকে এরই সূত্র ধরে এল অরবিন্দের উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ সম্পৃক্ত নৈরাষ্ট্রবাদ।

উনিশ শতকের হিন্দু পুনরুত্থানবাদের ফলাফল হয়ত এককথায় হিন্দু মুসলমান বৈরিতা বললেই শেষ হয়ে যায়; কিন্তু এই আন্দোলনের পাশাপাশি

যে অন্য একটি আন্দোলন চলছিল তার চরিত্রটি স্মরণ না করলে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের ফলটা ভারতের জাতীয় ঐক্যের পক্ষে কতটা মারাত্মক হয়েছিল তা অনুধাবন কবা যাবে না। এই দ্বিতীয় আন্দোলনেব চরিত্রটি ছিল সম্পূর্ণ বাজনৈতিক, আব তাব প্রধান নেতা ছিলেন সুবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। ইউবোপেব ১৮৪৮ সালেব বিপ্লবেব পর এদেশে শিক্ষিত মানুষের মনে রাজনৈতিক কার্যকলাপেব প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হলেও, বিগত শতকেব সপ্তম দশকেব আগে প্রকৃত বাজনৈতিক কাজকর্ম বিশেষ একটা দেখা যায় নি। প্রকৃতপক্ষে বামমোহন যে সর্বভাবতীয় ঐক্যের কথা চিন্তা করেছিলেন, কার্ল মার্কস যে বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী কবেছিলেন, তাবই সূচনা হয় ঐ সময়। সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে ছিলেন নৈবাষ্ট্রবাদী মাৎসিনিব ভাবাদর্শে বিশ্বাসী এবং পরবর্তীকালে তিনি কংগ্রেসেব মডারেটদেব পক্ষও অবলম্বন কবেন, কিন্তু ইতালিব মুক্তি আন্দোলনেব প্রভাবে তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম ভারতীয় জাতি গঠনের প্রয়োজনীযতাব কথা প্রচার কবেন এবং সর্ব ভারতীয় রাজনৈতিক ঐক্যেব জন্য বাস্তব কর্মসূচীও প্রণয়ন করেন। হিন্দু পুনরুত্থানবাদের প্রবক্তাদের মত ভারতীয় জাতি সম্পর্কে সুবেন্দ্রনাথের ধারণা কোন ধর্মের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেনি। তাই তিনি ১৮৭৮ সালে প্রকাশ্যে আহ্বান জানালেন সর্বভারতীয় ঐক্যের জন্য।

"তিনশ বছর আগে পানজাবে শিখ ধর্মের অমর প্রতিষ্ঠাতা, বিনম্র, অমায়িক, মহিমান্বিত নানক ঐক্যের মতবাদ প্রচার করেছিলেন এবং সর্বজনীন বিশ্বাসের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমানদের একত্র করাব জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁব প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ করেছিল। নানক শিখ সাম্রাজ্যের আত্মিক প্রতিষ্ঠাতা রূপে গণ্য হলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও শুভ ইচ্ছার মহান মতবাদ প্রচার করেছিলেন। তাঁর এই মহৎ দৃষ্টান্তের সামনে দাঁড়িয়ে আমবা অবশ্যই হিন্দু ও মুসলমান, খৃষ্টান ও পারসী— বিশাল ভারতীয় সমাজের সব সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সম্প্রীতি ও শুভ ইচ্ছার মহান মতবাদ প্রচার করব।...

"তাই আসুন আমরা আমাদের দেশ-মাতৃকার নামে, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পারসী—মহান ভারতীয় সমাজের সব সদস্যেরা আমাদের অতীতকালের ঈর্ষা-বিদ্বেষ, বিবাদ সবকিছুর ওপর এক বিস্মৃতির আচ্ছাদন নিক্ষেপ

করি; এবং একে অপরকে সৌভ্রাতৃত্বমূলক স্নেহ ও প্রীতিতে আবদ্ধ করে আসুন আমরা আমাদের প্রিয় পিতৃভূমির মঙ্গলার্থে একত্রে জীবন যাপন ও কাজ করি।"[২৪০]

সর্ব ভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ইণ্ডিযান এ্যাসোসিয়েশন'। ১৮৭৬ সালের ২৬শে জুলাই এই সংস্থার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল সাত'শ। বলা নিষ্প্রয়োজন; সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে কোনক্রমেই এই সংখ্যাটিকে নগণ্য বলা যায় না। এই সভায় সুরেন্দ্রনাথ যে কর্মসূচী রাখেন তার মধ্যে প্রধান হল:

"(১) দেশে শক্তিশালী জনমত সৃষ্টি; (২) সর্বজনীন রাজনৈতিক স্বার্থ ও আকাঙ্খার ভিত্তিতে ভারতীয় জনগণ ও জাতিগুলির ঐক্য প্রতিষ্ঠা; (৩) হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি; এবং সর্বশেষে, আজকের এই বিশাল গণ-আন্দোলনে ব্যাপক জনতাকে সামিল করা।"[২৪১]

সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সতীর্থদের কার্যকলাপ কেবলমাত্র এই প্রস্তাব গ্রহণেই সীমাবদ্ধ রইল না। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর এই চিন্তাকে সর্বভারতীয় রূপ দেওয়ার জন্য ১৮৭৭-৭৮ সালে বেনারস, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আলিগড়, দিল্লী, মীরাট, অমৃতসর, লাহোর, বম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে অসংখ্য জনসভায় বক্তৃতা করেন। এর ফলে এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, মীরাট এবং লাহোরে কিছু কিছু রাজনৈতিক সংগঠনও গড়ে ওঠে। এছাড়া ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট ও ইলবারট বিলকে কেন্দ্র করে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের কর্মী ও সমর্থকরা বাস্তব রাজনৈতিক কাজকর্মেও অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব সারা ভারতবর্ষে এত দূর বিস্তৃত হয়েছিল যে, ১৮৮৩ সালে সুরেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আগ্রা, ফয়জাবাদ, অমৃতসর, লাহোর, পুণা সহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্য জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই ঘটনাবলী নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন একটি প্রকৃত সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবেই গড়ে উঠছিল। একারণে দেখা যায় ১৮৮৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ আয়োজিত জাতীয় কনফারেন্সে শুধু উত্তর প্রদেশ থেকে অংশগ্রহণকারী

সংগঠনের সংখ্যা ছিল তিরিশটির বেশী। কিন্তু একটি প্রকৃত সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করাব ক্ষেত্রে বৃটিশ শাসকশ্রেণীর যে দুটি মোক্ষম অস্ত্র সব থেকে কার্যকরী হয়, তা হল জাতীয় কংগ্রেস ও হিন্দু পুনরুত্থানবাদ। একদিকে বৃটিশ অনুচর এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম জাতীয় কনফারেন্সের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করার জন্য জনগণের ক্ষোভের 'সেফটি ভালভ্'-রূপ জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করলেন, আর অপরদিকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করল। হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের কর্মধারা যে উগ্র হিন্দুজাতীয়তাবাদ ও চরম মুসলমান বিদ্বেষ সৃষ্টি করে তারই বিপবীত প্রতিক্রিয়া হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও হিন্দু বিবোধী মনোভাবেব সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশ মুসলমান জাতির অস্তিত্ব প্রচার করতে থাকেন এবং হিন্দু 'জাতি'র সমান্তরাল মুসলমান 'জাতি' গঠনের জন্য বাস্তব কার্যক্রমও গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, মুসলমান 'জাতি' গঠনের প্রচেষ্টাও বৃটিশ শাসকদের পৃষ্ঠপোবকতা লাভে ব্যর্থ হয় নি। এই ভাবেই হিন্দু পুনরুত্থানবাদীরা সফল কবে তোলে ভারতীয়দেব বিভক্ত করার বৃটিশ ষড়যন্ত্র, যার ফলে পরবর্তীকালের আলিগড় আন্দোলন ও মুসলিম লীগের উৎপত্তি। সংক্ষেপে এই হল ভারতীয় সমাজনীতি ও রাজনীতিতে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের অবদান।

বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতেই যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রচাবে সারা বাংলা মুখবিত হয়ে উঠল, 'হিন্দু শাস্ত্রে অন্ধ বিশ্বাসী', 'সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির বাহক' বিদ্যাসাগরই কি এই 'হিন্দুজাতি বিপন্ন' আর্তনাদে বিচলিত হয়ে হিন্দু ধর্মের প্রচারে মেতে উঠলেন? হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের এই কার্যকলাপের প্রতি বিদ্যাসাগবের সামান্যতম সমর্থন ছিল—তা অতি-বড বিদ্যাসাগর সমালোচকও প্রমাণ করতে পারেন নি।

**বার্কলের ভাববাদী দর্শনের বিরোধিতায় বস্তুবাদী বিদ্যাসাগর**

আসলে বিদ্যাসাগর ছিলেন প্রকৃত বস্তুবাদী ও নাস্তিক। তাই ভারতীয় সমাজের চিরাচরিত ধর্মীয় পরিবেশ ও হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের ধর্মোন্মাদনা সত্ত্বেও তিনি হিন্দু ধর্মের আদর্শগত ভিত্তি, ভাববাদের ওপরই সমস্ত আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। শুধু বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনকে ভ্রান্ত দর্শন নামে অভিহিত করাই নয়, বা তার প্রভাব থেকে

ছাত্রদের মুক্ত করার প্রচেষ্টাও নয়, তিনি এমনকি বিশপ বার্কলের ভাববাদী দর্শনকেও ভ্রান্ত দর্শন আখ্যা দিতে দ্বিধা করেন নি। যখন ব্যালাণ্টাইন সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের বার্কলের দর্শন পড়াবার জন্য সুপারিশ করলেন, তখন বিদ্যাসাগর তার প্রতিবাদ করে ময়েটকে লিখলেন, "বিশপ বার্কলের 'অনুসন্ধান' সম্পর্কে আমি এই মতামত ব্যক্ত করতে চাই যে, পাঠ্যপুস্তকরূপে এ বইটির অন্তর্ভুক্তি সুবিধের থেকে অনিষ্টই বেশী করবে। কতকগুলি কারণে যা এখানে বিবৃত করার প্রয়োজন নেই আমরা সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য পডাতে বাধ্য হই। ·· এই দর্শনগুলি ভ্রান্ত হলেও, এগুলি হিন্দুদের কাছ থেকে অসীম শ্রদ্ধা অর্জন করে থাকে। সংস্কৃত পাঠক্রমে এগুলি পড়ানোর সাথে সাথে এর প্রভাব প্রতিরোধ করার জন্য সঠিক ইংরেজী দর্শন দ্বারা আমাদের এই দর্শনগুলির বিরোধিতা করা উচিৎ। বিশপ বার্কলের 'অনুসন্ধান' যা বেদান্ত ও সাংখ্যের সদৃশ বা একইরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে এবং ইউরোপে যেটিকে এখন আর সঠিক দার্শনিক প্রণালী হিসাবে গণ্য করা হয় না, তা আমাদের এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবে না। অপরপক্ষে যখন সংস্কৃত ভাষায় হিন্দু ছাত্ররা এই বই পাঠ করে দেখবে যে, বেদান্ত ও সাংখ্যে প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত সমূহ একজন ইউরোপীয় দার্শনিক দ্বারা দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হচ্ছে, তখন এই দুই দার্শনিক চিন্তাধারার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা কমে যাওয়ার থেকে বৃদ্ধি পেতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, বিশপ বার্কলের এই বইটিকে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে সুপারিশের ক্ষেত্রে আমি ব্যালাণ্টাইনের সাথে একমত হতে পারছি না বলে দুঃখিত।"[২৪২]

এই পত্রটি বিদ্যাসাগরেব কোন্ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক—ভাববাদী না বস্তুবাদী? কোন সন্দেহই নেই যে একমাত্র বিশপ বার্কলের বিষয়ীগত ভাববাদী দর্শনের জন্যই বিদ্যাসাগর বার্কলে প্রণীত পাঠ্যপুস্তক পড়াতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। কারণ বেদান্ত-সাংখ্যের সঙ্গে বার্কলের দর্শনের সাদৃশ্য এই ভাববাদী চিন্তাধারায়। যে সব ভারতীয় নৈরাষ্ট্রবাদীরা বিদ্যাসাগরকে হিন্দু ধর্মের অনুসরণকারী রূপে চিহ্নিত করেন তাঁদের যদি দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান থাকে তা'হলে তাঁরা দেখতে ব্যর্থ হবেন না—বস্তুবাদের ওপর কি প্রগাঢ় আস্থা থাকলে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের যুগে জন্মেও একজন ব্যক্তির পক্ষে বার্কলের মত প্রখ্যাত দার্শনিকের চিন্তাধারার বিরোধিতা করা সম্ভব।

ভারতের মত একটা পশ্চাৎপদ দেশে বিদ্যাসাগরের এই বার্কলের দর্শনের বিরোধিতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা একবার ১৯০৫ সালের বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়ার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। সকলেরই স্মরণে আছে ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের পরাজয়ের পর বগদানভ; লুনাচার্স্কি, বাজারভের মত প্রথম সারিব রুশ নেতাদের একাংশ মার্কসবাদকে বিকৃত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই সমস্ত ব্যক্তিরা নতুন অনুসন্ধানেব নামে যে ম্যাখ-অ্যাভে-নারিয়ুসের দর্শনের প্রশস্তি গাইতেন তাঁর অন্তঃসার ছিল কিন্তু বিশপ বার্কলের বিষয়ীগত ভাববাদ। বগদানভ, লুনাচার্স্কি প্রভৃতির প্ররোচনায় সে সময়ে রুশ মার্কসবাদীদের ওপর বার্কলের ভাববাদী দর্শন এত বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল যে লেনিনকে এই ভ্রান্ত দর্শনের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রামের জন্য ঐতিহাসিক 'মেটিরিয়ালিজম ও এম্পেবিও ক্রিটিসিজম' গ্রন্থটি রচনা করতে হয়েছিল। যখন ১৯০৫ সালের পরও বগদানভ, লুনাচার্স্কি, বাজারভের মত প্রথম সারির রুশ মার্কসবাদীরা বস্তুবাদ পরিত্যাগ করে বার্কলের ভাববাদী দর্শনে অবগাহন করতে সঙ্কোচ বোধ করলেন না, তখন উনিশ শতকের মধ্যভাগের একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত যে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বার্কলের দর্শনের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করলেন, তা কি ভারতীয় বস্তুবাদের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনারূপেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে না?

শুধু ভাববাদের বিরুদ্ধে এই একটিমাত্র উক্তিই নয়, বিদ্যাসাগরের সমগ্র কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হল বস্তুবাদ। বস্তুবাদী চেতনার দ্বারা তিনি তাঁর সমকালীন সমাজের যে বাস্তব বিশ্লেষণ করেন তাতে তাঁর কাছে দুটি চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে—প্রথমতঃ, পাশ্চাত্য ভাবধারার বিকাশ হল সেই সমাজের মুক্তির একমাত্র পথ এবং দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্য ভাবধারা দেশ ও সমাজের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হলেও দেশ ও সমাজের দৃঢ়মূল ধর্মীয় পরিমণ্ডল ও সমাজের সদস্যদের পুঞ্জীভূত রক্ষণশীল মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য ভাবধারা কখনও বিপ্লবী রূপান্তরের মাধ্যমে বিকশিত হতে পারে না, সে বিকাশ হবে পরিমাণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে। এই চিন্তাধারা থেকেই বিদ্যাসাগর সংস্কারকামী পথ বেছে নেন। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁর এ চেতনাও হয় যে, যেহেতু কোন আমূল পরিবর্তন বা একেবারে নতুন চিন্তাধারা

আত্মস্থ করার পক্ষে সমাজ তখনও পরিপক্ক হয়ে ওঠে নি, সেহেতু এই পাশ্চাত্য ভাবধারা কেবলমাত্র ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট করলেই চলবে না ; দেশীয় প্রয়োজন অনুযায়ী সে ভাবধারাকে গ্রহণ করতে হবে দেশীয় রূপ। বিদ্যাসাগর প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা এই চিন্তাধারারই স্বাক্ষর বহন করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধ অনুকরণকারী বা ঔপনিবেশিক শিক্ষার বাহক ছিলেন না বলে তিনি বাংলার আপামর জনসাধারণের সাংস্কৃতিক মানেব উন্নয়নকল্পে শিক্ষা কর্মসূচীর কেন্দ্রবিন্দু করেছিলেন মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধন ও মাতৃ-ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিষয়টি। আর সে যুগের বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করে তিনি শ্রমজীবী জনগণের শিক্ষার একমাত্র সর্ত হিসাবে দাবী করেছিলেন সম্পূর্ণ অবৈতনিক শিক্ষার। বিদ্যাসাগর ছিলেন এমন একজন কট্টর নাস্তিক যে তিনি এমন কি পাঠ্যপুস্তকেও কোন অপার্থিব কাহিনী অন্তর্ভুক্ত করাকে সমীচীন মনে করেননি। কিন্তু বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে তিনি অনুধাবন করেছিলেন—সে যুগে নাস্তিকতা প্রচারের জন্য বাস্তব ভিত্তি তখনও প্রস্তুত হয় নি এবং সে কারণে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ হবে হিন্দুদের কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার এক সহজতম, অথচ কার্যকরী পথ। তাই বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিবর্তন বা বিবধাবিবাহ প্রবর্তনের বিষয়ে জনমত গঠনের ক্ষেত্রে তিনি যেমন পাশ্চাত্য উদার মানবতা-বাদী ব্যক্তিদের যুক্তিবাদ বা মানবতাবাদের ওপর নির্ভর না করে হিন্দুশাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণই প্রকৃষ্ট পথ বলে গণ্য করেছিলেন, তেমনি 'সহবাস সম্মতি আইন' যাতে সত্যসত্যই সমাজের সাধারণ সভ্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে সেজন্য হিন্দুশাস্ত্র দ্বারা প্রস্তাবিত যুক্তির ওপর ভিত্তি করে আইন প্রণয়ন করতে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ঠিক একই ভাবে সামাজিক গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতনতা থেকে তিনি বাঙালীদের মধ্যে অন্ধ ইংরেজ-অনুকরণপ্রিয়তা প্রতিরোধের জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের গৌরববুদ্ধিকে বিন্দুমাত্র সমর্থন করেন নি। অপরপক্ষে প্রকৃত দেশপ্রেম যাতে জাগরিত হয় সেজন্য বিদ্যাসাগর সক্রিয়-ভাবে যুক্ত হলেন শিশির ঘোষ পরিচালিত রাজনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে, আর অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রতি। শুধু তাই নয়, যে বিদ্যাসাগরকে আজ বৃটিশ শাসকদের একনিষ্ঠ অনুচররূপে চিত্রিত করা হচ্ছে, সেই বিদ্যাসাগরেরই নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের

প্রথম সভাপতি হিসাবে। বিদ্যাসাগর একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন না ঠিক এবং শারীরিক ও ব্যক্তিগত কারণ বশতঃ তাঁর পক্ষে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির পদ গ্রহণও সম্ভব হয় নি বটে, তবে বিদ্যাসাগর যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কবেছিলেন, সেটিই পরবর্তীকালে সামাজিক কূপমণ্ডূকতা ও অজ্ঞতা ধ্বংস করে বাংলার সর্বত্র প্রকৃত রাজনৈতিক কার্য-কলাপের জন্য বাস্তব ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল। তাই শেষ বিচারে বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার, শিক্ষানীতি ও সর্বোপরি বস্তুবাদী দর্শন ভারতীয় সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রামে এক অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। বিদ্যাসাগর যথার্থই রামমোহনের উত্তরসূরী।

**সংস্কৃত কলেজে সিপাইদের ছাউনি গড়া প্রসঙ্গে নৈরাষ্ট্রবাদী মিথ্যাচার**

কিন্তু কোন্ উদ্দেশ্যে কে জানে, সাম্প্রতিক কালে-ভারতীয় নৈরাষ্ট্রবাদীরা বিদ্যাসাগরের এই উজ্জ্বল ভাবমূর্তিকে বিকৃত করে তাঁকে বৃটিশ 'সাম্রাজ্যবাদের' একনিষ্ঠ অনুচরে পরিণত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। আর যেহেতু তাঁদের কাল্পনিক সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে ইতিহাস কোন প্রকার প্রমাণ সরবরাহ করে না, সেহেতু প্রকৃত বিপ্লবী কর্মীদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে এইসব ব্যক্তিদের বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে মিথ্যা কাহিনী পরিবেশন করা ভিন্ন উপায় থাকে না। আজ এই কাবণে নকশালপন্থী নামধারী একদল নৈরাষ্ট্রবাদী সমস্ত সততা বিসর্জন দিয়ে মিথ্যা প্রচার কবছে যে বিদ্যাসাগর নাকি সিপাহী বিদ্রোহের সময় সংস্কৃত কলেজে সামরিক শিবির প্রতিষ্ঠার কাজে বৃটিশ শাসক-বর্গকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। এ সম্পর্কে নৈরাষ্ট্রবাদীরা কি ধরনের মিথ্যা প্রচারের আশ্রয় নিয়েছে তা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটিই প্রমাণ করে। "বিদ্যাসাগর বৃটিশের ছত্রছায়ায় বসে একধারে এ সম্পর্কে নীরবতার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছিল এবং বিদ্রোহ দমনের প্রয়োজনে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীকে সংস্কৃত কলেজে ছাউনী কবার আহ্বান জানাচ্ছে, অপরদিকে চক্রান্ত করছে 'বিধবা-বিবাহ' ইত্যাদির মাধ্যমে মূল অর্থাৎ প্রধান সমস্যা জাতীয় পরাধীনতা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দেবার।"[২৪৩] অবশ্য এই মিথ্যা কাহিনী উদ্ভাবনের বিষয়ে পথিকৃৎ হিসাবে একমাত্র গণ্য হতে পারেন প্রখ্যাত নৈরাষ্ট্রবাদী তাত্ত্বিক নেতা, সরোজ দত্ত মহাশয়। কারণ তিনিই প্রথম প্রচার করেন, "ব্যারাকপুরে যখন মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁসী হয় এবং সশস্ত্র বিদ্রোহ সারা বাংলায় জ্বলে উঠার সম্ভাবনা

দেখা দেয়, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর কি তখন তার কলেজকে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনানিবাসে পরিণত হতে দেয়নি? ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাঁড়ে যখন ফাঁসিতে উঠেছিল বিদ্যাসাগর কি তখন সংস্কৃত কলেজে বসে বৃটিশের জয়গান করে 'বাংলার ইতিহাস' রচনা করেন নি?"[২৪৪]

কিন্তু প্রকৃতই কি বিদ্যাসাগর সিপাহী বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজে সামরিক ছাউনি খোলার জন্য সরকারকে আহ্বান জানিয়েছিলেন? বিদ্যাসাগর সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনীর প্রচারকরা এ-বিষয়ে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ দাখিল করার প্রয়োজনবোধ না করলেও, এ বিষয়ে যতটুকু ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় তা এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, যখন সিপাহী বিদ্রোহ দমন করার জন্য ভারত সরকার সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজকে সামরিক শিবিরে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন ১৮৫৭ সালের ১১ই অগাষ্ট বিদ্যাসাগর এসম্পর্কে সরকারকে একটি পত্র দেন। বর্তমানে যদিও বিদ্যাসাগরের এই পত্রটি উদ্ধার করা যায় নি, কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে যে সব প্রমাণাদি উপস্থিত, তাতে অনুমান করা যায় যে বিদ্যাসাগর উক্ত পত্রে সরকারী সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অসন্তোষই প্রকাশ করেছিলেন। তা না হলে ১৭ই অগাষ্ট, ১৮৫৭ বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে সেক্রেটারি বিদ্যাসাগরকে জানাবেন কেন, "আপনার ১১ তারিখের চিঠির উত্তরে আমি ভারত সরকারের সামরিক বিভাগের সেক্রেটারির একখানি চিঠির কপি আপনাকে পাঠাচ্ছি। সেই চিঠিতে আপনি দেখতে পাবেন, হিন্দু ও মাদ্রাসা কলেজের অট্টালিকা দুটি সৈন্যদের বাসের জন্য গবর্ণমেণ্ট সাময়িকভাবে দখল করবেন মনস্থ করেছেন। কলকাতায় শীঘ্র যে সৈন্য-সামন্ত আসবে তাদের এইস্থানে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে। আপনাকে তাই অনুরোধ করছি যে আপনি **আর বিলম্ব না করে এখনই গ্যারিসান কম্যাণ্ডারের হাতে আপনার বিদ্যালয়গৃহ ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করবেন**"[২৪৫] শুধু সংস্কৃত কলেজ নয়। এই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজও সৈন্যদের বসবাসের জন্য দখল করা হয়। ১৮৫৭ সালের ১লা অগাষ্ট বিদ্যাসাগর তৎকালীন ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন্ গর্ডন ইয়াংকে একটি পত্রে জানান, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ তাঁকে জানিয়েছেন—'কর্নেল স্ট্র্যাচির ইচ্ছানুসারে প্রেসিডেন্সি কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছে'।[২৪৬] (বড় হরফ আমাদের)

এর পর ১৮ই অগাষ্ট, ১৮৫৭ বিদ্যাসাগরকে লেখা হল, "সৈন্যরা আপনার বিদ্যালয়গৃহ দখল করলে আপনি আপনার ছাত্রদের শিক্ষাসমস্যার এবং ক্লাসের সমস্যার কিভাবে সমাধান করবেন, সে সম্বন্ধে চিন্তা করে আমাদের জানাবেন।"[২৪৭] এর উত্তরে ২৪শে অগাষ্ট বিদ্যাসাগর গর্ডন ইয়াংকে দুটি পত্র লেখেন। প্রথমটিতে তিনি জানালেন, সংস্কৃত কলেজে 'ভলাণ্টিয়ার কোর'-এর দুটি স্কোয়াড আসার ফলে তিনি আট দিনের জন্য কলেজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন।[২৪৮] আর দ্বিতীয় পত্রটিতে বিদ্যাসাগর লিখলেন, ইয়াং-এর ১৮ই অগাষ্টের চিঠির নির্দেশ অনুযায়ী তিনি মাসিক পঁচাশি টাকা ভাড়ায় সংস্কৃত কলেজকে দুটি বাড়ীতে স্থানান্তরিত করেছেন।[২৪৯]

এই পত্রগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে বিদ্যাসাগর স্বেচ্ছায় সংস্কৃত কলেজকে সামরিক শিবিরে রূপান্তরিত করেন নি। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সরকার যখন সর্বত্র সৈন্য সমাবেশ করছে, তখন সংস্কৃত কলেজে শিবির স্থাপনের জন্য সরকারকে বিদ্যাসাগরের অনুরোধের প্রতীক্ষায় থাকতে হচ্ছে—এ কি উন্মাদ ব্যক্তি ছাড়া কেউ কল্পনা করতে পারে? যে ব্যক্তি তাঁব কলেজের টুল, ডেস্ক প্রভৃতি অন্য কলেজে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরাসরি লিখিত প্রতিবাদ করেন, যে ব্যক্তি তাঁর কলেজ পরিচালনা ও শিক্ষানীতির বিষয়ে সামান্যতম সরকারী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন, সেই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কি সামরিক কারণে সবকার কর্তৃক কলেজ গ্রহণের বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করাই স্বাভাবিক নয়?

**'মকল নবজাগরণ' না বুর্জোয়া এনলাইটেনমেণ্ট ?**

বর্তমানে নৈরাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারা দ্বারা বিভ্রান্ত বিপ্লবীদের যে অংশ রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিদেব প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যা দেন, তাঁরা কিন্তু পরোক্ষভাবে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের বুর্জোয়া বিকাশকেই অস্বীকার করে থাকেন। অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের তুলনায় স্বল্প পরিমাণে হলেও ভারতবর্ষে যে বুর্জোয়া বিকাশ ঘটেছিল, তারই অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বুর্জোয়া বিকাশের প্রথম পর্বে উল্লেখযোগ্য বুর্জোয়া এনলাইটেনমেণ্ট বা বুর্জোয়া আলোকের সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয় বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা যেমন এই আলোকপ্রাপ্তির অধ্যায়কে 'নবজাগরণ' নামে অভিহিত করে অতিশয়োক্তি করে থাকেন, তেমনি নৈরাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারা দ্বারা আচ্ছন্ন এইশ্রেণীর বিপ্লবীরা

ভারতবর্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সেই উল্লেখযোগ্য যুগকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা বশতঃ এই শ্রেণীর বিপ্লবীরা লক্ষ করতে ব্যর্থ হন যে উনবিংশ শতকে, বিশ্বব্যাপী অবাধ প্রতিযোগিতার যুগে, পশ্চিমী প্রগতিশীল বুর্জোয়া মতবাদের সংস্পর্শে পৃথিবীর সর্বত্র, যেখানেই বুর্জোয়া বিকাশ অনুপ্রবেশ করেছিল, সেখানকার সামাজিক পরিবেশেই এক যুগান্তকারী, অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রত্যক্ষ বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম ছিল না। বরং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে বৃটিশ পণ্য অর্থনীতি ও প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের অবাধ সংস্পর্শের ফলে, অন্যান্য পশ্চাৎপদ দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে বুর্জোয়া চিন্তাধারার বিকাশ অনেক বেশী গভীর ও অগ্রসরই ছিল। এই বুর্জোয়া বিকাশের প্রথম পর্বে বেশ কিছু ভারতীয় ব্যক্তি ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-আধুনিকতা দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে ভারতবর্ষেও এই ধরনের বুর্জোয়া আলোকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন এবং বাস্তবে পুঁজিবাদী ইউরোপীয় দর্শন অনুযায়ী তাঁদের কর্মকাণ্ড পরিচালিতও করেছিলেন। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে বহু ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভারতবর্ষে বুর্জোয়া আলোকের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়, রামমোহন হলেন সেই প্রক্রিয়ার প্রথম নায়ক। রামমোহন ছিলেন সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ভাবাদর্শ সম্পন্ন একজন ভারতীয়। তাঁর প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি বাস্তব কাজ, এমন কি জীবন পদ্ধতিও প্রভাবিত ছিল ইউরোপীয় ভাবাদর্শ দ্বারা। রামমোহনের বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার কেনা-বেচার ব্যবসায়িক ক্ষমতা, অথবা 'কমারশিয়াল এ্যাণ্ড প্যাট্রিয়টিক এ্যাসোশিয়েশন'-এর কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন, অথবা একেশ্বরবাদের আবরণে ডিইজমের প্রচার, ভারতবর্ষকে অখণ্ড ইউরোপীয় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা, বা ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের অগ্রগতিতে উল্লসিত হয়ে বিলাসবহুল পার্টি দানের অভ্যাস—এ সব কিছুই হল রামমোহনের সমকালীন বুর্জোয়া শ্রেণীর জীবন পদ্ধতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। আর ফরাসী বিপ্লবের যুগে জন্মে কোন্ ব্যক্তিই বা সমসাময়িক ইউরোপীয় আধুনিকতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন ? রামমোহন ছিলেন একজন প্রগতিশীল বুর্জোয়া, যে কারণে তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে পুঁজিবাদী ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ করার জন্য উৎসাহিত

করেছিলেন। বৃটিশ তোষণের জন্য নয়, রামমোহনের বহুমুখী প্রতিভা ও প্রগতিশীল ধ্যান-ধারনার জন্যই তিনি সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার প্রগতিশীল মহলে সমাদৃত হয়েছিলেন এবং তাঁর পুস্তকাবলী ইংরেজী, জার্মান এমনকি ডাচ ভাষায়ও অনুদিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষে রামমোহন সূচিত এই এনলাইটেনমেণ্ট প্রক্রিয়ারই সৃষ্টি হল ডিরোজিও-মধুসূদন প্রভৃতি ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলনের কর্ণধাররা। যদিও ইয়ং-বেঙ্গল আন্দোলন বিশেষ সফলতা অর্জন করতে পারে নি এবং বহুলাংশেই তা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে কাল্পনিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত ছিল, কিন্তু এই রোমাঞ্চকর আন্দোলনও হল বুর্জোয়া আলোকপ্রাপ্তিরই এক অবশ্যম্ভাবী ফল। ডিরোজিও পন্থীরা তৎকালীন আলোড়নকারী ইউরোপীয় চিন্তাধারা, বিশেষতঃ ফরাসী জ্যাকোবিন দর্শনের সান্নিধ্যে পুরাতনকে বর্জন করে যে নতুনেব উন্মাদনা অনুভব করেছিলেন, সেই নতুনের রোমাঞ্চকর অনুপ্রেরণাই তাঁদের ঐতিহাসিক ও সামাজিক সীমা লঙ্ঘন করতে প্ররোচিত করেছিল। আর কোন্ সমাজবিপ্লবই বা এই ধরনের মাত্রাতিরিক্ত কাজ ভিন্ন ধীরস্থির গতিতে অগ্রসর হয়? ইউরোপীয় নবজাগরণের দিন থেকে ফরাসী বিপ্লব, ১৮৪৮ সালের বিপ্লব বিশ্ববাসীর চিন্তার জগতে যে আমূল পরিবর্তন এনেছিল, তারই প্রভাবে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারায় যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, প্রচলিত ধর্ম-বিরোধী মনোভাব, জ্ঞানান্বেষণের সৃষ্টি। উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে ভারতীয় সমাজে বুর্জোয়া আলোকের যে জোয়ারের সূচনা হয়েছিল, সেই জোয়ারই ঈশ্বরচন্দ্রের মত সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ সন্তানকে নাস্তিকে পরিণত করে-ছিল, এবং বাংলাদেশের সর্বস্তরে এই এনলাইটেনমেণ্টের সুফলকে প্রসারিত করার জন্য বিদ্যাসাগরকে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে অনুপ্রাণিত করেছিল। রামমোহন, দ্বারকানাথ, ডিরোজিও, মধুসূদন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির মাধ্যমে বুর্জোয়া এনলাইটেনমেণ্টের যে প্রবাহ এক সময় সমগ্র ভারতবর্ষকে প্লাবিত করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল, তা কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফলকাম হতে পারে নি। বলা চলে নানা কারণে বুর্জোয়া আলোকের এই স্রোত উনিশ শতকের শেষ দিকেই একটি ক্ষীয়মান স্রোতে পরিণত হয়। যে সমস্ত কারণে বুর্জোয়া বিকাশের এই ধারা ক্রমশই স্তিমিত হয়ে পড়ে, তার মধ্যে সাধারণভাবে তিনটি কারণকে প্রধান বলে ভাবা যেতে পারে। প্রথমতঃ, লৌহদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত

চিরায়ত ভারতীয় সমাজের আভ্যন্তরীণ কাঠামো ও পরম্পরা সমাজের সদস্য-দের মধ্যে যে রক্ষণশীল মানসিকতার সৃষ্টি করেছিল, সেই মানসিকতাই বুর্জোয়া বিকাশের পথে এক প্রতিবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, বৃটিশ পণ্য অর্থ-নীতি চিরাচরিত ভারতীয় উৎপাদন প্রথার আমূল পরিবর্তন আনয়ন করলেও, সেই পরিবর্তনের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর এবং ফলে উৎপাদন প্রথার রূপান্তর জনগণের মধ্যে আশানুরূপ বিপ্লবী চেতনা সঞ্চার করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এবং তৃতীয়তঃ, প্রথমে বৃটিশ ধনতন্ত্র ও পরে বিশ্বপুঁজিবাদের একচেটিয়া পুঁজিবাদে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটি সক্রিয় হয়ে ওঠার পর প্রাগ্রসর দেশগুলির বুর্জোয়ারা বিশুদ্ধ বুর্জোয়া চিন্তাধারার যে বিকৃতি ঘটায় এবং ক্রমবিকাশমান ভারতীয় বুর্জোয়া আলোক ও তার অপরিহার্য অঙ্গ রাজনৈতিক সচেতনতাকে বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পরিকল্পনা রচনা করে, তার দ্বারা সদ্য বিকশিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বিভ্রান্ত হয়। উনবিংশ শতকেব শেষে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের একটি বৃহৎ অংশ কিভাবে বৃটিশ পরিকল্পিত হিন্দু পুনরুত্থানবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, তা আমরা আগেই লক্ষ করেছি। তাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে দেখা যায় ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দুটি ধারার সৃষ্টি হয়েছে—একদল রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন আর অপর দলের কর্মধারা অনেকাংশে বৃটিশ পরিকল্পনা দ্বারা বিপথগামী হতে থাকে। এই শেষোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীই বৃটিশ আশ্রিত ছিলেন তা নয়, বৃটিশ পারিতোষিক দ্বারা প্রলোভিত নন এরকম বহু বিপথগামী বুদ্ধিজীবীও এই পরিকল্পনার শিকারে পরিণত হন। ফলে উনবিংশ শতকের শেষে বুর্জোয়া আলোকের যে স্রোত ক্রমশই মন্দ-গতি হয়ে আসে তা বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দু'এক দশকের মধ্যেই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং ইউরোপীয় নবজাগরণের সঙ্গে তুলনা করলে ভারতবর্ষের **এই বুর্জোয়া আলোকের সংক্ষিপ্ত অধ্যায়কে কোনক্রমেই নবজাগরণ বলা চলে না।** রামমোহনের যুক্তিবাদ, ধর্মবিরোধী মনোভাব, জ্ঞানান্বেষণ, পুঁজিবাদী ব্যবসার প্রচলন প্রভৃতি ভারতবর্ষে যে বুর্জোয়া আলোকের প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিল, যদি তা আরও ব্যাপক, আরও দীর্ঘস্থায়ী হত, তা'হলে তাকে হয়ত নবজাগরণ নামে অভিহিত করা যেত। কিন্তু এই আন্দোলন ভারতীয় শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে বুর্জোয়া চিন্তাধারার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করলেও

যেহেতু এটি কেবলমাত্র সমাজের মুষ্টিমেয় অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং সর্বসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করার মত উপযুক্ত হয়ে ওঠার আগেই স্তিমিত হয়ে পড়ে, তাই **এই বুর্জোয়া বিকাশকে শুধুমাত্র বুর্জোয়া এনলাইটেনমেন্ট বলাই যুক্তিযুক্ত**।

১৮৬১ সালে রাশিয়ার সামন্ততন্ত্রের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটলেও, উনিশ শতকের রুশদেশ ছিল তৎকালীন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় একটা মধ্যযুগীয় দেশ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও উনিশ শতকে রাশিয়ায় বুর্জোয়া আলোকের যে প্রসাব ঘটেছিল, লেনিন তার পূর্ণ মর্যাদাই দিয়েছিলেন। নবজাগরণ না ঘটলেও রাশিয়ায় উনিশ শতকের ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে যে সীমিত বুর্জোয়া আলোকের বিকাশ হয়েছিল, সেই প্রক্রিয়ারই অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন স্কালদিন, এঙ্গেলহার্ট প্রমুখ ব্যক্তিরা। নারদনিকরা রাশিয়ার যে গ্রামগোষ্ঠী সম্পর্কে সহানুভূতিশীল ছিল, এই সমস্ত ব্যক্তিরা কিন্তু তা ছিলেন না, এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষিত জণগণের প্রতি এঁদের সমবেদনা সত্ত্বেও এঁরা রাশিয়ার পুঁজিবাদকেই স্বাগত জানিয়েছিলেন। লেনিন এই স্কালদিন প্রমুখ রুশ বুদ্ধিজীবীদের কোন্ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলেন? স্কালদিনের মূল্যায়নে লেনিন বলছেন, "দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে স্কালদিনকে একজন বুর্জোয়া এনলাইটেনার বলা যায়। তাঁর মতামতগুলো অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থনীতিবিদদের চিন্তা-ধারার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় (যদিও তা অবশ্য রুশী অবস্থার প্রিজমে মানানসইভাবে প্রতিসৃত) এবং তিনি নিখুঁতভাবে ষষ্ঠ দশকের 'ঐতিহ্যে'র সাধারণ 'আলোকপ্রাপ্তি'র চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। পশ্চিম ইউরোপীয় এনলাইটেনারগণ ও ষষ্ঠ দশকের অধিকাংশ সংস্কৃতি সাহিত্যের প্রতি-নিধিদের মত স্কালদিন ভূমিদাস প্রথা ও তার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আইনী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। এইটাই হল 'এন-লাইটেনার'দের প্রথম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সকল রুশী এনলাইটেনারদের মধ্যে যে দ্বিতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তা হল, শিক্ষার প্রসার, স্বায়ত্তশাসন, মুক্তি, ইউরোপীয় ধরণের জীবনযাত্রা এবং সাধারণভাবে রাশিয়ার সার্বিক ইউরোপীয়করণের প্রতি প্রগাঢ় সমর্থন। আর 'এনলাটে-নার'দের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল সাধারণ জনগণ, বিশেষতঃ কৃষকদের (যাঁরা এনলাইটেনারদের আমলে তখনও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারে নি বা মুক্ত হবার

প্রক্রিয়ায় অবস্থান করছে) স্বার্থরক্ষা; ভূমিদাস প্রথা ও তার অবশেষের বিলোপ যে সর্বজনীন উন্নতির কারণ হবে, সে সম্পর্কে প্রগাঢ় আস্থা এবং তাকে সফলকাম করার জন্য আন্তরিক আকুতি।……

"একথা অবশ্যই ভুলে গেলে চলবে না, যে সময়ে এনলাইটেনাররা (সাধারণ মত অনুযায়ী যাঁদের বুর্জোয়া নেতাদের অন্যতম বলে ধরা হয়) লিখতেন এবং যে সময়ে আমাদের চতুর্থ ও ষষ্ঠ দশকের এনলাইটেনাররা রচনা প্রকাশ করতেন, সেই সময় সমস্ত সামাজিক সমস্যাই ছিল ভূমিদাসপ্রথা ও তার অবশেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি ও তাদের দ্বন্দ্বগুলি তখনও ভ্রূণাবস্থায় ছিল। সেই কারণে তখন বুর্জোয়া আদর্শবাদীরা কোন রকম স্বার্থপরতা প্রদর্শন করেন নি। অপরপক্ষে পাশ্চাত্যে ও রুশিয়ায়, উভয় স্থানেই এনলাইটেনাররা পুরোপুরি আন্তরিকভাবেই বিশ্বজনীন কল্যাণে আস্থাশীল ছিলেন এবং আন্তরিকভাবেই তা তাঁরা চাইতেন। প্রকৃতপক্ষে ভূমিদাস প্রথার মধ্য থেকেই যে দ্বন্দ্বগুলি বিকশিত হচ্ছিল তা তাঁরা সত্যসত্যই পর্যবেক্ষণ করেননি (অংশতঃ তখনও তা তাঁরা দেখে উঠতে পারেননি)।"[২০]

বৃটিশ প্রচলিত পণ্য-অর্থনীতি ভারতীয় উৎপাদকদের উৎপাদনের উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল বলে নৈরাষ্ট্রবাদীরা দুঃখ পান এবং সে কারণে রামমোহন প্রমুখ ব্যক্তিদের বৃটিশ শাসন সমর্থনকে প্রতিক্রিয়াশীল কাজ বলে গণ্য করেন। রাশিয়ায় নারদ্‌নিকরাও এই একই কারণে ধনতান্ত্রিক বিকাশের আপোষহীন শত্রু ছিল। অথচ দেখা যায় স্কালদিন, এঙ্গেলহার্টের মত রুশী বুদ্ধিজীবীরা এই ধনতান্ত্রিক বিকাশকেই রুশী জনগণের মুক্তির পথ বলে বর্ণনা করতেন। রুশী এনলাইটেনারদের ও নারদ্‌নিকদের এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে লেনিন কোনটিকে সঠিক হিসাবে গণ্য করলেন? লেনিন স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিলেন, " 'এনলাইটেনাররা' কখনই সংস্কার পরবর্তী অগ্রগতির চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি এবং তাঁরা সংস্কার পূর্ববর্তী প্রথার অবশেষের বিরুদ্ধে সংগ্রামেই নিজেদের পরিপূর্ণভাবে আবদ্ধ রেখেছিলেন। এই সকল ব্যক্তিরা কেবল রাশিয়ায় ইউরোপীয় ধরনের বিকাশের প্রয়োজনীয় নেতিবাচক কাজেই নিমগ্ন ছিলেন। নারদ্‌নিকরা রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের সমস্যা উত্থাপন করে বটে, তবে ধনতন্ত্র প্রতিক্রিয়াশীল—এই অর্থেই এর উত্তর দেয়। সুতরাং নারদ্‌নিকরা এনলাইটেনারদের ঐতিহ্য সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারেনি।

যে সমস্ত ব্যক্তিরা 'অখণ্ড সভ্যতা'র দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রাশিয়াকে ইউরোপীয়-করণ করতে সচেষ্ট ছিলেন, নারদ্‌নিকরা সর্বদাই তাঁদের বিরোধিতা করত। নারদ্‌নিকরা এইসব ব্যক্তিদের আদর্শের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে চাইত না বলেই যে এই বিরোধিতা করত তা নয় ( সেক্ষেত্রে এই সংগ্রাম ন্যায্যই হত ) ; বরং তারা এই সংগ্রাম করত এই আদর্শ, অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ পর্যন্ত অগ্রসর হতে চাইত না বলেই। রুশ 'শিষ্য'রা ( রুশ মার্কস-বাদীরা—লেখক ) ধনতন্ত্র প্রগতিশীল—এই অর্থে রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। এই কারণে রুশ 'শিষ্য'রা এনলাইটেনারদের সামগ্রিক ঐতিহ্য বহন করতে শুধুমাত্র সক্ষম নন, তাঁরা এর সঙ্গে সম্পত্তিহীন উৎপাদক-দের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বগুলির বিশ্লেষণ সংযোজিত করে এই সামগ্রিক ঐতিহ্য অবশ্যই গ্রহণ করবে।"[২৫১]

**ভারতীর সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামে রামমোহন-বিদ্যা-সাগরের বিপ্লবী ভূমিকা**

দেখা যাচ্ছে রাশিয়া ইউরোপীয় নবজাগরণ-বৃত্তের বাইরে অবস্থান করলেও, পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশের তুলনায় রাশিয়ার পুঁজিবাদের বিকাশ অনেক বিলম্বিত, অনেক মন্থর হলেও, লেনিন রাশিয়াব বুর্জোয়া আলোকের বিকাশকে নকল নবজাগরণ বলে বিদ্রূপ করেন নি। বরং স্কালদিন প্রমুখ রুশ বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে পুঁজিবাদী শোষণের চরিত্রটি অনুধাবন করা সম্ভব না হলেও, যেহেতু এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা রাশিয়ায় ইউরোপীয় বুর্জোয়া বিকাশের আবশ্যকতা অনুভব করেছিলেন, সেহেতু লেনিন তাঁদের অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় এনলাইটেনারদের সমতুল্য বলে গণ্য করেছেন, এবং নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছেন যে রুশ মার্কসবাদীরা—নৈরাষ্ট্রবাদী নয়, এই আলোকপ্রাপ্ত বুর্জোয়াদেরই উত্তরসূরী। এমন কি তৎকালীন কোন কোন রুশ বুদ্ধিজীবীর মধ্যে যে শুধুমাত্র সামন্ততন্ত্র ধ্বংস করার একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, লেনিন তাকেও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী বলে বর্ণনা করেছেন। শুধু লেনিন কেন, মাও সে-তুংও কি এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই চীনের বুর্জোয়া বিকাশকে বিশ্লেষণ করেন নি ? "উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে **আলোকপ্রাপ্ত চীনা বুদ্ধিজীবী** পুরনো প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষাপদ্ধতির অবসান করে **আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের**"[২৫২] এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞান, বুর্জোয়া সমাজ-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রচলনের দাবীতে যে সংগ্রাম করেন, সে সম্বন্ধে মাও

সে-তুং-এর মতামত কি ? এই সংগ্রামের মূল্যায়নে মাও বললেন, "চীনে সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার বিরুদ্ধে সংগ্রামে **এই নতুন শিক্ষার ভাবধারা সে যুগে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে এবং পুরনো যুগের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য সাধন করেছে।**"[২০৩] ( বড় হরফ আমাদের ) অর্থাৎ চীন একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও, চীনা বুদ্ধিজীবীদের যে অংশ পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের দাবীতে সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁদের "আলেকপ্রাপ্ত" বুদ্ধিজীবী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং স্বয়ং মাও সে-তুং তাঁদের ভূমিকাকে বিপ্লবী বলে অভিহিত করেছেন।

লেনিন এবং মাও যথাক্রমে রাশিয়া ও চীনের বুদ্ধিজীবীদেব যে দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করেছেন, সেই মানদণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর যে সমস্ত ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-চিন্তাধারা প্রসারের চেষ্টা করেছিলেন, নিঃসন্দেহে তাঁরা সামন্ততন্ত্র বিরোধী ভূমিকাই পালন করেছিলেন এবং তাই তাঁদের ভূমিকা হল **যথার্থ বিপ্লবী**। মনে রাখা প্রয়োজন, বৃটিশের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন থাকাকালীন উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে বৃটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের আনুকূল্যে ভারতবর্ষে যে ইউরোপীয় পুঁজিবাদী চিন্তাধারা প্রবেশ করে, তা ছিল বিশুদ্ধ বুর্জোয়া চরিত্রের। এই বিশুদ্ধ বুর্জোয়াচিন্তাধারার পরিচয়ই রামমোহনের মত ভারতীয় ব্যক্তিদের মানসিকতায় দেখতে পাওয়া যায়। আর এই কারণেই তৎকালীন ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের বিকাশ যৎসামান্য হলেও এই সমস্ত ব্যক্তিরা সমকালীন ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযাগী সামন্ততান্ত্রিক কূপমণ্ডূকতা থেকে ভারতীয় জনগণকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে লেনিন রাশিয়ার বুর্জোয়া আলোকপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবীদের যে মূল্যায়ন করেছেন, তা বিগত শতকের ভারতীয় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেহেতু একটি পশ্চাৎপদ দেশে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব ব্যতিরেকেই পুঁজিবাদের জন্ম হচ্ছে এবং বহির্বিশ্বের প্রগতিশীল আদর্শের প্রভাবে বুর্জোয়া আলোকের সূচনা হয়েছে, তাই সেই বুর্জোয়া বিকাশ কখনও ইউরোপীয় সমান্তরাল হতে পারে না সত্য, কিন্তু তাকে অস্বীকার করা কেবলমাত্র অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন নৈরাষ্ট্রবাদীদের পক্ষেই সম্ভব; কোন প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর পক্ষে নয়। এই সমস্ত ব্যক্তিদের যে সীমাবদ্ধতা ছিল না তা নয়, কিন্তু সেটি ছিল **ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা**। পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্বটি

পরিস্ফুট না হওয়ার ফলে, সে যুগের দুনিয়ার সমস্ত প্রগতিশীল ব্যক্তিদের পুঁজিবাদ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে সীমাবদ্ধতা ছিল, উনিশ শতকের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারায় সেই একই সীমাবদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও, এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিগত শতাব্দীর ভারতীয় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের কার্যকলাপ যে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছিল, সেই ভূমিকা স্মরণ রেখে লেনিনের মত আমাদের ঘোষণা করতেই হবে—বর্তমান আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী নয়, একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই হল সেই ঐতিহ্যপূর্ণ ভারতীয় প্রগতিশীলতার পতাকাবাহী।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# নয়াগণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব কোন পথে ?

রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিগণ ভারতের যে সামাজিক কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম করেছিলেন, সেই সমাজের কি কোন গুণগত পরিবর্তন হয়েছে ? রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগের সেই ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার প্রভৃতি, এক কথায় সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির মূল চরিত্রটি কি আজও অক্ষুন্ন নেই ? যে-কোন সমাজ সচেতন মানুষই বলবেন যে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সংস্কৃতির কিছু কিছু পরিমাণগত পরিবর্তন হলেও, আজও ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির মূল উপাদানগুলির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি শুধু যে বিনষ্ট হয়নি তাই নয়, পবিবর্তিত আন্ত-র্জাতিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে যে পুঁজিবাদী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা'ও বিশ্ব ইতিহাসে ধনতন্ত্র-বিকাশের প্রথম পর্যায়ের পুঁজিবাদী সংস্কৃতি নয়। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে যে বুর্জোয়ারা ধর্মের বিরুদ্ধে এক অভূতপূর্ব সংগ্রাম করেছিল, ধর্মের মুখোশকে ছিঁড়ে-ফুঁড়ে দিয়ে প্রকাশ করেছিল তার আসল স্বরূপ, তারাই আজ শ্রেণী হিসাবে বিশ্বব্যাপী ধর্মের প্রচার চালাচ্ছে। আর ভারতবর্ষে এর ফল দাঁড়িয়েছে—অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক থেকে শুরু করে কট্টর 'বামপন্থী' বলে পরিচিত রাজনীতিবিদ পর্যন্ত কেউই জ্যোতিষীর পরামর্শ ভিন্ন জলস্পর্শ করেন না ; সাধারণ মানুষ ত দূরের কথা, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত অগ্রণীদের হাতেও তাবিজ, মাদুলি ও বিভিন্ন গ্রহের 'প্রভাবনাশকারী' গ্রহরত্ন শোভা পায়; আর সমাজের চিন্তানায়ক বলে পরিচিত ব্যক্তিগণের কক্ষেও 'সত্য সাঁই বাবা'র 'বিভূতি' ঝরে পড়ে। আহা, ভারতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার কি অগ্রগতি! অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের টেরিকাটা, পায়রা

ওড়ান, বাইজী-নাচ সম্বলিত কলকাতার 'বাবু' কালচারের স্থান নিয়েছে পূজো কালচার। দুর্গাপূজো, কালীপূজো থেকে মোড়ে মোড়ে রক্ষাকালী, শনি পূজোর অত্যাচারে জনজীবন বিপর্যস্ত। বাবা তারকনাথের 'মাহাত্ম্য' আর শুধু পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহেই সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতবর্ষের সর্বত্রই একই চিত্র; শুধু পূজোর রকমফের। কোথাও বাবা বিশ্বনাথ, কোথাও বাবা ভেঙ্কটেশ্বর, আর কোথাও বা কুম্ভ মেলাকে কেন্দ্র করে 'ভক্ত' দলের আগমন। 'আগামী দিনের মানুষ এসে দেখবে—এই হল বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের ভারতীয় কালচাব। ভাবতে অবাক লাগে, যখন পৃথিবীর আধুনিক দেশের প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা যুবকরা প্রাণবেগের তাড়নায় সমস্ত সংস্কার-বাধাবিপত্তিকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখিয়ে সত্যের খোঁজে ছুটে চলেছে, তখন পঞ্চান্ন কোটি মানুষের একটা গোটা দেশ ধর্মেব পাদমূলে নিজেকে সঁপে দিয়ে তাকিয়ে আছে ভবিতব্যের দিকে।

এ'ছাড়া জাতি-ভেদ প্রথা ত ভারতের সনাতন বৈশিষ্ট্য। উচ্চ বর্ণে নিম্ন বর্ণে সংঘর্ষ, উচ্চ বর্ণ কর্তৃক গ্রামকে গ্রাম হরিজনদের পুড়িয়ে মারার ঘটনাও প্রাত্যহিক ব্যাপার। নিম্ন বর্ণরা উচ্চবর্ণ কর্তৃক নির্যাতিত হলেও, নিজ নিজ জাতির প্রতি আসক্তি কারো কম নয়। এমন কি তথাকথিত গণতান্ত্রিক ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভোটের লড়াইও জমে ওঠে এই জাতি ভেদ প্রথা ও সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের ওপর নির্ভর করে। ভারতীয় রাজনীতিতে জাতিভেদ প্রথা ও সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ভূমিকা কি পরিমাণ তা সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়। এই সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতিই আমরা বহন করে চলেছি, তাই আজও অসবর্ণ বিবাহ ভারতে বিরল ঘটনা। শুধু কি তাই, আজও কি যৌথ পরিবারগুলো, যৌথ পরিবারই বা কেন, ভারতীয় সরল পরিবারগুলোও কি এশীয় স্বৈরাচারের ভিত্তি হয়ে নেই? এই পরিবারগুলোই তার সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে সমাজের সভ্যদের ব্যক্তিত্বকে দুমড়ে মুচড়ে অহরহই তৈরী করছে এক একটা 'শান্ত', 'বিনয়ী', জড-পদার্থে, যারা পারে না কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে, জানে না কোন বিদ্রোহ করতে—এমন কি নিজেদের পিতা-মাতার বিরুদ্ধে। ভারতীয় পরিবারগুলোর বৈশিষ্ট্য হল কর্তৃত্ব ও অধীনতা (domination and subjugation), যা তার এক একটা সদস্যকে এমনভাবে তৈরী করে যার ফলে তারা 'নাবালক' অবস্থায় মুখ বুজে

পিতামাতার আদেশ পালন করে, আর তারাই পরিবারের কর্তা হয়ে স্বৈরাচারী হয়ে দাঁড়ায়। তাই ল্যাফার্গ সমষ্টিগত সম্পত্তির অবস্থায় পরিবারের যে চরিত্র বর্ণনা করেছেন আজও তা ভারতীয় পরিবারের বৈশিষ্ট্য হয়ে রয়েছে। এই ধরনের পরিবারভিত্তিক সমাজের সদস্যদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ না হওয়ার ফলেই ভারতের কমিউনিষ্ট নামধারী পার্টিগুলিতে সাধারণ কর্মীরা স্বৈরাচারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মত সাহস সঞ্চয় করতে পারে না এবং বাস্তবে 'কর্তাভজা'র দলেই পরিণত হয়। তাই 'প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ন্যায়সঙ্গত' ভারতীয় রূপ পেয়েছে—বিদ্রোহ করা অন্যায়। ওয়াজেদ আলি বোধ হয় ঠিকই দেখেছিলেন—'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।'

এই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এই দূষিত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মত প্রগতিশীল ব্যক্তিদের ভূমিকা আজও তাই নিঃশেষ হয়ে যায় নি। এঁদের ভূমিকা নিঃশেষ হয় নি বলেই শাসক শ্রেণীর পরিচিত ও অপরিচিত সেবাদাসরা এঁদের ভাবমূর্তি বিকৃত করতে বদ্ধপরিকর, যাতে ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি বিরোধী সংগ্রামে শ্রমিক-শ্রেণী ও বিপ্লবী রাজনীতির সমর্থকরা আর রামমোহন-বিদ্যাসাগরকে ব্যবহার করতে না পারেন। কারণ এবিষয়ে কমিউনিষ্ট বিপ্লবীরা সচেতন না হলেও বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও তার ভারতীয় অনুচরেরা দীর্ঘদিন আগেই বুঝতে পেরেছে যে বস্তুবাদ, বিশেষতঃ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে পরাস্ত করাই হল কমিউনিজমকে প্রতিহত করার একমাত্র পথ। আর ঠিক এই কারণেই প্রয়োজন ভাববাদের অবিরাম প্রচার, অর্থাৎ ধর্মের উত্তেজনা বৃদ্ধি ; অন্য কোন পথ নেই। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পয়লা নম্বর তাত্ত্বিক জন ফষ্টার ডালেস বহুদিন আগেই বিশ্বধনতন্ত্রকে এবিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং বর্তমানে বিশ্ব ধনতন্ত্রের ভারতীয় সেবাদাসরা সেই কর্তব্য পালনেই সচেষ্ট। ডালেস তার 'যুদ্ধ না শান্তি ?' গ্রন্থে বিশ্বব্যাপী কমিউনিষ্ট ভাবধারার দ্রুত প্রভাব বৃদ্ধির নানা কারণ অনুসন্ধানের পর কমিউনিজমকে প্রতিহত করার সম্ভাব্য পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন। ডালেসের মতে কমিউনিষ্ট ভাবধারা প্রসারের অন্যতম কারণ হল এই আদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিশ্ব পুঁজিবাদী দেশগুলির ব্যর্থতা। "গত পাঁচ বছরে আমরা বোমা, বিমান ও বন্দুকের সম্ভাব্য লড়াইয়ের প্রস্তুতি হিসেবে কোটি

কোটি ডলার খরচ করেছি। কিন্তু যে ভাবধারার লড়াইয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছি তার জন্যে খুব কমই খরচ করেছি; এর ফলে যে পরাজয় আমাদের ঘটছে **কোন সামরিক শক্তি দিয়েই তার ক্ষতিপূরণ করা যাবে না।**[২৫৪] (বড় হরফ আমাদের) বিশ্ব কমিউনিজমের দুর্বলতম স্থান কোনটি? তাঁর মতে এখনও পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের মনে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, আর এইটিই হল কমিউনিজমের দুর্বলতম স্থান। এমন কি স্তালিনের নেতৃত্বাধীন রুশিয়াও যে এর ব্যতিক্রম নয়, সেটি উল্লেখ করে ডালেস লিখলেন, "এমন কি সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেও ব্যাপক অসন্তোষ রয়েছে। রুশ জনসাধারণ মোটের ওপর ধর্মপ্রবণ। তাদের গোঁড়া চার্চকে শেকলে বাঁধা দেখে তারা কিছুতেই সুখী হতে পারে না।"[২৫৫]

তা'হলে কমিউনিজমের প্রভাব প্রতিহত করার উপায় কি? অবশেষে বিশ্ব কমিউনিজমকে প্রতিহত করার জন্য ডালেস বিশ্ব ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সামনে যে কর্মসূচী রাখলেন, তাতে বলা হোল, "আমাদের প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের আত্মিক ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা ফিরে পাওয়া। মানুষের নৈতিক প্রকৃতি ও সম্ভাবনার প্রতি ধর্মীয় বিশ্বাস অতীতে যুগ যুগ ধরে প্রত্যেক সমাজের অঙ্গীভূত ছিল, এবং ভবিষ্যতেও তা থাকা একান্ত দরকার। আজকের সমাজের জটিল পরিস্থিতিতে এ প্রয়োজন আরও বেশী, **বস্তুবাদী বিশ্বাসের কলাকৌশল যদি প্রতিরোধ করতে হয়, তাহলে একথা আমাদের অনুধাবন করতেই হবে।**"[২৫৬] (বড় হরফ আমাদের)

ডালেস নির্ধারিত পথ অবলম্বন করে ভাববাদের অন্যতম আকর হিন্দুধর্মের প্রচার সারা পৃথিবী জুড়েই চলছে—কোথাও রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে, কোথাও মহেশ যোগীর সাহচর্যে, আবার কোথাও বা মার্কিনী 'ইসকো'র তত্ত্বাবধানে। তাই যে-কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশের প্রতিনিধিরা ভারতবর্ষে এসে প্রথমেই জানিয়ে দেন—আজকের বিশ্বজোড়া সংকটের মুখে হিন্দু ধর্মই হল 'আত্মমুক্তি'র একমাত্র পথ। ভারতবর্ষে বস্তুবাদী দর্শনের মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের আর এক অস্ত্র হল গান্ধীবাদ, যা অতি নিকৃষ্ট ধরনের ভাববাদ ভিন্ন কিছু নয়। ভাববাদ প্রচারের কাজে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার উৎসাহও কিছু কম নয়। তবে তারা তা সুকৌশলেই করে থাকে। এই কৌশলের জন্যই তারা সব সময় হিন্দু

ধর্মের নামোল্লেখ না করেও ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের যে প্রশংসা করে, তার সাহায্যে তারা সনাতন হিন্দু ধর্মের 'মহান আদর্শ'-কেই উচ্চ তুলে ধরে। সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা ভাববাদের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আজ গান্ধীকে লেনিনের সঙ্গে একই আসনে বসিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল গান্ধীর বিপ্লবী ভাবমূর্তি গড়ার কাজে উদ্যোগী হয়েছে।

ভারতবর্ষে ভাববাদ প্রচার ও ব্যাপক জনসাধারণের মনে ধর্মোন্মাদনা সৃষ্টির কাজকে সফল করার জন্যই প্রয়োজন—যে সমস্ত ভারতীয় বস্তুবাদীদের এখনও জনগণের ওপর প্রভাব আছে এবং যাঁদের ভূমিকা এখনও শেষ হয়ে যায় নি, সেই সমস্ত বস্তুবাদীদের ভাবমূর্তি বিকৃত করা। আর ভারতীয় বস্তুবাদীদের ভাবমূর্তি বিকৃতিকরণকে সার্থক করার জন্য নতুন ধরনের 'গবেষণা'র প্রয়োজন, যাতে ওই 'গবেষণা'লব্ধ বিকৃত তথ্যের দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম সচেতন ব্যক্তিরা বিভ্রান্ত হন। হয়ত অল্প কিছুদিনের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদী চাবার্ককেও বিকৃত করার আবশ্যকতা দেখা দেবে। এই ধরনের 'গবেষণা'র উদ্দেশ্যেই ভারতীয় শাসকশ্রেণী তার কিছু ভাড়াটিয়া গবেষকদের নিয়োগ করেছে। রমেশচন্দ্র মজুমদার নামক ঐতিহাসিকটি আজ এ-কাজেই নিযুক্ত। তা না হলে যিনি মাত্র কয়েক বছর আগেও রামমোহনকে বেকন ও লুথারের সঙ্গে একই আসনে বসিয়েছিলেন, তিনিই কেন হঠাৎ তাঁর পূর্ব-মূল্যায়নের পরিবর্তন করে 'প্রতিক্রিয়াশীল', 'ঘুষখোর' রামমোহনের পরিচয় পাচ্ছেন ? না কি আমাদের বুঝতে হবে যে জীবন সায়াহ্নে মজুমদার মশাই হঠাৎ বিপ্লবী রোশনাইয়ে চমকিত হয়ে আজীবন বুর্জোয়া ইতিহাস লেখার দায় থেকে মুক্তি পেতে অবশেষে 'প্রতিক্রিয়াশীল' রামমোহনকে আবিষ্কার করেছেন ? তাও হয়ত ভাবা যেত, যদি দেখা যেত যে এরই সঙ্গে তিনি ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর অন্যান্য ভ্রান্ত মূল্যায়নের পরিবর্তন করেছেন। ডঃ মজুমদারের গান্ধী-বিরোধী বলে বেশ সুনাম আছে, এবং পরিতাপের বিষয় কোন কোন বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীও এ প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত হন। কিন্তু ডঃ মজুমদারের গান্ধী-বিরোধিতার মূল ভিত্তিটা কি ? তাঁর সমগ্র রচনাবলী পড়লেই বোঝা যায় যে তাঁর গান্ধী-বিরোধিতার মূল ভিত্তি হল উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ সম্পৃক্ত নৈরাষ্ট্রবাদ। গান্ধীর শ্রেণী সমন্বয়ের নীতি ডঃ মজুমদারকে যথেষ্ট গান্ধী-বিরোধী করে তোলে নি। গান্ধী কেন ভারতীয়

মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর নগ্ন আক্রমণ চালালেন না, কেন তিনি একটু আবরণের আশ্রয় নিলেন—ঐতিহাসিক মজুমদারের এই অনৈতিহাসিক প্রতিবাদই "হিস্ট্রি অব দি ফ্রিডম মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া"-র পাতায় পাতায় উচ্চারিত হয়েছে। ভাবতীয় মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯০৯ সালে গান্ধী মুসলমান সম্প্রীতির যে মুখোশটা পরেন, সে সম্পর্কে রমেশচন্দ্র লিখেছেন, "গান্ধী বলেছিলেন, 'সত্যের পূজাবী হিসাবে আমি আন্তরিক-ভাবেই বিশ্বাস করি যে, মুসলমানেরা যেমন চান হিন্দুরা সেইমত তাঁদেব জন্য পথ ছেড়ে দেবেন এবং সেটি করে তাঁরা আনন্দও করবেন। যদি এই ধরনের পারস্পরিক উদারতা প্রকাশ পায়, একমাত্র তবেই আমরা ঐক্য আশা করতে পাবি।' প্রথম বাক্যটি হল গান্ধীর সেই বিশেষ মার্কা-মারা ( special trademark ) মুসলিম ঘেঁষা কথার একটি যা মুসলমানদেব আপস-বিরোধী মনোভাবকে অনেক বেশী মূল্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের অপরিমেয় ক্ষতি করেছিল। গান্ধীব এই বক্তব্যই আবার শোনা গেল ১৯৪৭ সালে যখন তিনি বললেন যে, নিজেব পছন্দমত মন্ত্রীসভা গঠন করে, যাতে হয়ত বা শুধু মুসলমান মন্ত্রীরাই থাকবে, জিন্নারই হওযা উচিত ভাবতের সর্বোচ্চ শাসনকর্তা। গান্ধীর এই উক্তি এমন কি তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামীদেরও স্তম্ভিত কবেছিল। দ্বিতীয় বাক্যেব 'পাবস্পবিক' শব্দটা হল অর্থহীন। কাবণ মুসলমানদেব এই ধবনেব অনুবোধ করাব মত সাহস গান্ধীব কখনই ছিল না এবং মুসলমানবাও এই বেকুবি কবাব জন্য বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখায় নি। এমন কি পাকিস্থান সৃষ্টিব পরেও গান্ধীব মনোভাবেব কোন পবিবর্তন হয় নি।"২৫৭

ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা থেকে এবং হিন্দু পুনরুত্থানবাদের প্রভাবের ফলে বালগঙ্গাধর তিলক একসময় ভ্রান্তভাবে শিবাজী-উৎসব পালনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ ও বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেই উৎসব অনিবার্যভাবে তিলকের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে পরিণত হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান বৈরীতা বৃদ্ধির এক অচেতন অস্ত্রে। যদিও তিলক পরবর্তীকালে এই ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য গড়ে তোলার জন্য বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করেন, তবুও শিবাজী-উৎসব যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ ছিল এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই তিলকের ওই কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা হওয়া উচিত। আর চরম মুসলমান-বিদ্বেষী

রমেশচন্দ্র ঠিক এখানেই তিলকের প্রশস্তির কারণ খুঁজে পেলেন এবং শিবাজী উৎসবের কর্মসূচী সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, "এ-বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে শিবাজী-উৎসব নিশ্চিতভাবে রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করেছিল। আর শিবাজী সম্পর্কে আলোচনাগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমিক অনুভূতি ও জাতীয় সচেতনতা সৃষ্টি। ...এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু নিঃসন্দেহে ছিল **বিপ্লবী চরিত্রের**...।"[২৫৮] (বড় হরফ আমাদের) এই সাম্প্রদায়িক ইতিহাসবিদের কাছে শিবাজী-উৎসবের বিপ্লবী চরিত্র বিচারের মানদণ্ডটি কি? তাঁর একমাত্র মানদণ্ড হল এই উৎসব মুসলমানদেব কি পরিমাণ বিরক্তি উৎপাদনে সমর্থ হল। তাই এ সম্পর্কে রমেশচন্দ্র লিখেছেন, "স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে বাঙ্গলা দেশের হিন্দুগণকে কতখানি অনুপ্রাণিত করেছিল এই শিবাজী উৎসব তা পরিমাপ করা যাবে **মুসলমান সম্প্রদায়ের এর প্রতি গভীর বিরক্তি থেকে।**"[২৫৯] (বড হরফ আমাদের) তিলক ভ্রান্তভাবে শিবাজী উৎসব পালন করলেও তাঁব প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ভারতবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করা। তাই তিলক শিবাজীকে হিন্দু ধর্মের রক্ষক হিসাবে চিত্রিত করেন নি; তিনি শিবাজীকে প্রচার করেছিলেন অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে এক অমিত বিক্রম যোদ্ধা হিসাবে। আর শিবাজী উৎসবের 'বিপ্লবী' চরিত্রের আবিষ্কারক রমেশচন্দ্র তিলকেব প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছেন শিবাজীর মুসলমান বিরোধী চরিত্রের বিকৃতি ঘটানোব জন্য। এ বিষয়ে ১৯৭৫ সালে ডঃ মজুমদার লিখলেন, "...হিন্দু রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ মুসলমানদিগকে তুষ্ট রাখিতে খুবই সচেষ্ট ছিলেন। ...কিন্তু ইহার জন্য তাঁহারা যে ভাবতের অতীত ইতিহাসকে বিকৃত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই তাহার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় এই শিবাজী উৎসবে। হিন্দুদের প্রতি ধর্মান্ধ ঔরঙ্গজেব যে অকথ্য অত্যাচার করেন তাহার জন্যেই এই মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে শিবাজীর অভিযান আর তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল হিন্দুপদ-পাদশাহী, হিন্দুর ধর্মরাজ্য স্থাপন। কিন্তু যে কারণে হিন্দুরা শিবাজীকে মহাপুরুষজ্ঞানে পূজা করে, মুসলমানেরা ঠিক সেই কারণেই মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংসকারী মারাঠা জাতির জনক শিবাজীর প্রতি বীতস্পৃহ হইবে, এমন কি তাঁহার স্মৃতি উৎসবের প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করিবে, ইহাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু হিন্দুরা তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মুসলমানদের সাহায্যপ্রার্থী, সুতবাং শিবাজীর

সম্বন্ধে যাহা **সর্বাপেক্ষা বড় সত্য** তাহা গোপন করিয়া তিনি যে মুসলমানদের বিরোধী ছিলেন না, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

"আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শিবাজী উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা মারাঠী বালগঙ্গাধর তিলক **মুসলমান তোষণের** জন্য বলিলেন যে, শিবাজী মুসলমানদেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নাই, **অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন**।..."[২৬০] (বড় হরফ আমাদের)

তিলক তাঁর প্রাক্তন ত্রুটি সংশোধন করে ১৯১৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের স্বপক্ষে বললেন, "অনেকে বলে থাকেন যে আমরা না কি মুসলমানদের কাছে খুবই বেশী নতি স্বীকার করেছি। ...আমার মনে হয আমবা বোধ হয খুব একটা বেশী আত্মসমর্পণ করিনি। যদি শুধুমাত্র মুসলমানদেরই স্বাযত্ত-শাসনেব অধিকাব দেওযা হয়, তা নিয়ে আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। ...যদি ভাবতীয় সম্প্রদায়ের কোন একটি অংশকে এই অধিকাব প্রদান কবা হয় তা'হলেও আমাব বলাব কিছু নেই। তা'হলে লডাইটা তাদেব সাথে অন্য অংশের হবে, এখনকার মত ত্রিমুখী লডাই হবে না। আমাদেব লডাই কবতে হবে এক তৃতীয় পক্ষেব সঙ্গে, এবং এই মঞ্চে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া খুবই জরুরী। ...আমবা যে এই ঐক্য স্থাপন কবেছি, এইটাই হল আজকের দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।[২৬১]

তিলকের এই হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐক্যেব পক্ষ গ্রহণে বমেশচন্দ্র যে খুবই আহত হবেন তা সহজেই অনুমান কবা যায়। তাই তিনি তিলকেব এই ভাষণ সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, "তাঁর সমগ্র ভাষণ...প্রমাণ কবে যে, যে-কোন মূল্যে স্বায়ত্ব শাসন (home rule) লাভেব চিন্তায় তাঁর মন কী রকম আচ্ছন্ন ছিল। তাৎক্ষণিক স্বাধীনতা লাভের মূল্য হিসাবে তিনি জাতিব ভবিষ্যৎ বাঁধা দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। এবং তাবপর স্বাধীনতা প্রাপ্ত হলে অবস্থা অনুযায়ী যতটা সম্ভব সুষ্ঠুভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্য ও সমান ব্যবস্থা কবার প্রশ্ন। এটা স্মরণযোগ্য যে গান্ধী, যিনি বাজনৈতিক নেতা হিসাবে তিলকের উত্তরসূরী, তিনি তিলকের এই নীতি শুধুমাত্র উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেন নি, বরঞ্চ এ'কে যতদূর নিয়ে যাওয়া যায় ততদূরই নিয়ে গিয়েছিলেন।"[২৬২]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের কি চমৎকার ইতিহাসবোধ! রমেশচন্দ্র মজুমদারের সমগ্র ইতিহাস চেতনার ভিত্তি যে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও

সীমাহীন মুসলমান-বিরোধিতা তা এই ভিন্ন ভিন্ন উদ্ধৃতির মধ্যে অনেকটাই প্রকাশ পেয়েছে। এ কারণেই তিনি রামমোহনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে যথেষ্ট প্রগতিশীলতার প্রমাণ না পেলেও উনিশ শতকের হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের প্রশংসায় বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং নৈরাষ্ট্রবাদীদের 'মা' শব্দের মধ্যেই ভারত-বর্ষের মুক্তি খুঁজে পান। তাই ভারতীয় শাসকশ্রেণীর নির্দেশ অনুযায়ী ভাববাদ ও নৈরাষ্ট্রবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ভাড়াটিয়া গবেষককে রামমোহন সম্পর্কে তাঁর পূর্ব মূল্যায়নের পরিবর্তন করে বলতে হয়—"কিন্তু আন্তর্জাতিকতাবাদের এই ভাবধারা নয়, বরং জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য আন্তরিক আকুলতা অন্ততঃ কিছুকাল আগে পর্যন্ত ভারতের নবযুগের বৈশিষ্ট্যসূচক ছিল। রামমোহন যে বিদেশী জোয়াল থেকে নিজ দেশের মুক্তির জন্য আদৌ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, এমন কথা শোনা যায় নি, যা আমরা রামমোহনের সমসাময়িক ডিরোজিও ও তাঁর হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দেখতে পাই। ডিরোজিও'র স্বদেশপ্রেমের এই নতুন ভাবধারা উনিশ শতকের প্রতিটি বছরই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সঠিকভাবে এই ভাবধারাকেই ভারতের নবযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা যেতে পারে। অপরপক্ষে রামমোহন ভারতবর্ষে আরও অনেক বছরের বৃটিশ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।…এই স্বদেশ প্রেমিক ও বৃটিশ-বিরোধী জাতীয় চিন্তাধারার উন্মেষের কৃতিত্ব রামমোহনের নয়, ডিরোজিও এবং তাঁর ছাত্রদেরই, যা রামমোহনের মৃত্যুর একশ বছর পর পর্যন্ত বাংলা কাব্যে সব থেকে সুন্দর কাব্যিক অভিব্যক্তি পেয়েছে। এই চিন্তাধারাকেই আধুনিক ভারতের অগ্রগণ্য ও স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা যেতে পারে, যার কোন সমান্তরাল ভারতের বিগত তিন হাজার বছরের ইতিহাসে নেই ; অথচ এটি রামমোহন রায়ের হৃদয়কে কখনও আলোড়িত করেছিল বলে মনে হয় না।"[২৬৩]

জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ ও স্বদেশ প্রেম কথাগুলির প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র যেমন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মধ্যে নৈরাষ্ট্রবাদী চরিত্র দেখতে পান না, তেমনিই তাঁর কাছে জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেম এক ও অভিন্ন ; এবং তিনি স্বদেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে বৈরীতা খুঁজে পান। এইজন্য রামমোহন উগ্র জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে স্বদেশ প্রেম ও

আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রচার করেছিলেন বলে এই উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকের কাছে রামমোহনের স্বদেশপ্রেম 'বিমূর্ত' ("..... the abstract ideas of freedom cherished by Rammohoan")[২৬৪] হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ডিরোজিওর 'দেশমাতৃকা'র আবেগপ্রবণ ভাববাদী আরাধনা তাঁর কাছে রামমোহনের বস্তুবাদী কর্মকাণ্ডের তুলনায় অনেক বেশী মূল্যবান মনে হয়েছে। কিন্তু ডঃ মজুমদারের রামমোহনকে বিকৃত করার প্রধান অস্ত্র যে উগ্রজাতীয়তাবাদ ও নৈরাষ্ট্রবাদ তা তিনি দেশপ্রেম সম্পর্কে তাঁর আত্মগত ব্যাখ্যায় ও কল্পনাবাদী ডিরোজিওর ভাবমূর্তি গঠনের মাধ্যমে আর একবার প্রমাণ দিলেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত যশস্বী সমাজ সচেতন ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষও আজ এই কাজে ব্রতী। তবে তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য বিদ্যাসাগর। কারণ বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ। আর সে প্রচেষ্টায় বিদ্যাসাগরের উক্তিকে বিকৃত করাতেও তিনি যে কুণ্ঠিত নন তা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়েই দেখেছি। কি কারণে আজ তিনি বিদ্যাসাগর-চরিত্রের অসঙ্গতির খোঁজ পাচ্ছেন? তাঁর নিজের ভাষাতে—"...ইতিহাসের গতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসবোধও পরিবর্তনশীল, এবং সেকথা অস্বীকার করলে 'ইতিহাস' রচনার অধিকারটুকুও ঐতিহাসিকদের ত্যাগ করতে হয়।"[২৬৫] এ'ত একেবারে আদর্শ সমাজসচেতন ঐতিহাসিকেরই বক্তব্য! বিনয় ঘোষের মার্কসবাদী হিসাবেও বেশ খ্যাতি আছে। কিন্তু আগে তাঁর মার্কসবাদী দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের যে-সব অসঙ্গতি ধরা পড়ে নি, আজ সেগুলোই কিভাবে তাঁর কাছে অনায়াসে ধরা দিচ্ছে? এ কি তাঁর মার্কস-বাদী চেতনা বৃদ্ধিরই পরিণাম, না কি তিনি ইতিহাসবোধের নতুন কোন উৎসের সন্ধান পেয়েছেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অবশ্য একটু কঠিন। তবে তাঁর সাম্প্রতিককালের কোন কোন রচনা হয়ত এ বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত দিতে পারে। 'বিপ্লব মহানগর মধ্যবিত্ত মার্কসীয় চিন্তাধারা' প্রবন্ধটি তাঁর এই নব পর্যায়ের রচনারই অন্তর্ভুক্ত। এই প্রবন্ধে তিনি মধ্যবিত্তদের আত্মবিচ্ছেদ (alienation) বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু বিনয় ঘোষের নতুন ইতিহাস বোধের উন্মেষে রেজিস দেব্রে, মারকিউস প্রমুখ নয়া-নৈরাষ্ট্রবাদীদের চিন্তা-ধারা যে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে, তা প্রবন্ধটির তাত্ত্বিক ধূম্রজাল

ভেদ করতে পারলে লক্ষ করা যায়। মধ্যবিত্তশ্রেণীর দ্বৈত ভূমিকা মার্কসবাদে চিরস্বীকৃত বিষয় এবং সে-বিষয়ে মার্কসবাদী ব্যাখ্যার অপ্রতুলতা এখনও দেখা দেয় নি। সম্ভবতঃ বিনয় ঘোষ এই মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় আর সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তাই মার্কসবাদী বিশ্লেষণ করতে গিয়েও তাঁকে রেজিস দেব্রের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। বর্তমান সমাজের নৈরাজ্য কি করে হৃদয়ঙ্গম করা যাবে? বিনয় ঘোষের মতে, "পারতপক্ষে বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে বর্তমান নৈরাজ্যের আন্তর তাৎপর্য বোঝাই সম্ভব নয়, কারণ **'the intellectual will try to grasp the present throu**ɔ**h preconceived ideo**ı**ogical constructs and live to it through books (Debray,** পৃঃ ২১ এবং শ্রেণী হিসেবে শাসন-শোষণের নির্যাতন-যন্ত্রণা বুদ্ধিজীবীদের কোনদিন তেমন ভোগ করতে হয়নি। ইতিহাসে চিরদিন তাঁরা প্রধানত শাসকশ্রেণীর পারিষদের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, কাজেই তাঁদের মজুতবুদ্ধিতে বর্তমান সামগ্রিক নৈরাজ্য বিক্ষোভ বিদ্রোহের ব্যাখ্যা করা যাবে না। এমন কি যাঁরা বিপ্লবী তাঁরাও যদি তাঁদের গতানুগতিক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা নতুন করে **revolutionize** না করেন, তাহলে **বর্তমানের 'Revolution in the revolution'-এর প্রকৃত মর্মোদ্‌ঘাটন করা তাঁদের পক্ষেও অসম্ভব**।"[২৬৬] ( বড় হরফ আমাদের )· অতএব বোধ হয় এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, রেজিস দেব্রের **'revolution in revolution'**-এর চিন্তাধারার দ্বারাই বিনয় ঘোষের 'পরিবর্তিত ইতিহাসবোধ' সমৃদ্ধ হয়েছে।

শুধু নৈরাষ্ট্রবাদী রেজিস দেব্রেই নয়, এই প্রবন্ধে দেখা যায় মারকিউসও বিনয় ঘোষের চিন্তাধারার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছেন। বর্তমানে বিপ্লবী কমিউনিষ্ট-আন্দোলনের দুর্বলতার ফলে এবং অন্যান্য কারণে কমিউনিষ্ট আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে ব্যক্তিবাদী চিন্তাধারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং তারই প্রভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত শ্রেণী-সংগ্রামের পরিবর্তে পাতিবুর্জোয়ারা যে নৈরাষ্ট্রবাদী কার্যকলাপের সূচনা করেছে, সেইসব কার্যকলাপ হল না কি প্রচলিত সমাজ রীতি-নীতির বিরুদ্ধে সদস্যদের প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক। সেগুলো ব্যাখ্যার জন্য মার্কসবাদ আর যথেষ্ট নয়। তাই বিনয় ঘোষকে মারকিউসের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে চোখা চোখা বুলি— **'instinctual revolt', 'biological hatred'** ইত্যাদি। বিনয় ঘোষ লিখছেন

"নৈরাজ্যের অথবা বিদ্রোহের পূর্বধারণা বর্তমান সমাজে অচল। কারণ **এর জাত আলাদা**। ···বহুকালের নির্যাতন পীড়ন শোষণ ও বৈপ্লবিক শঠতার বিরুদ্ধে এ হল সমগ্র মানবসত্তার বিদ্রোহ। এ হল 'instinctual revolt' 'biological hatred'-এর বিস্ফোরণ(Mercuse, Political Preface 1966)। ···যেমন কিউবায় ভিয়েৎনামে বলিভিয়ায়, যেমন তরুণবিদ্রোহে, ছাত্র-বিদ্রোহে।···চারজন তরুণী ও একজন তরুণ বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের কার্যালয়ের সামনে চেকোস্লোভাকিয়ার সমাজতান্ত্রিক সতীত্ব রক্ষার্থে সোভিয়েটের সামরিক অভি-যানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন উলঙ্গনৃত্য করে এবং সমবেত দর্শকদের সামনে সোভিয়েট পতাকা অগ্নিদগ্ধ করার পরে পোশাক পরিধান করে ঘরে ফিরে যায়। উলঙ্গনৃত্য, বজ্রমুষ্ঠি সবই আদিম ব্যাপার। 'biologjcal hatred' **এর প্রকাশ বলেই আজকের গণবিদ্রোহে আদিমতার উপাদান এত বেশী**। অস্থির অশান্ত অবাধ্য তরুণ ছাত্রদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় নামক 'বিদ্বান' উৎপাদনের কারখানার উপাচার্য-অধ্যাপকদের নাজেহাল বা অপ-মানিত হওয়া নিশ্চয় তরুণীদের উলঙ্গনৃত্যের মতো আদিম বা অশোভন নয়, অতি নগণ্য ব্যাপার মাত্র।"[২৬৭] (বড় হরফ আমাদের) নৈরাষ্ট্র-বাদীদের উস্কানী দেওয়ার মত সব কিছুই এ উদ্ধৃতিতে রয়েছে, শুধু বিনয় ঘোষ বলতে ভুলে গেছেন, 'biological hatred'-এর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ব্যক্তি-হত্যাতে। সেক্ষেত্রে অবশ্য বিনয় ঘোষের স্বরূপটি একটু বিশেষভাবে প্রকট হয়ে পড়ত। উক্ত প্রবন্ধের রচনাকালটি কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার। এটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬১ সালে। আর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ'-এর নবতম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৯৬১ সালে। একেবারে মহেন্দ্রক্ষণই বলতে হয়। একদিকে ভারতে নৈরাষ্ট্রবাদী কার্যকলাপ ও মূর্তি ভাঙার সূচনা, আর অপরদিকে নানা 'মার্কসবাদী' তাত্ত্বিক বুকনির আড়ালে নৈরাষ্ট্রবাদী কার্য-কলাপের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যাসারগকে বিকৃত করা। প্রকৃত বিপ্লবীদের বিভ্রান্ত করার জন্য শাসকশ্রেণীর পক্ষে এর থেকে সার্থক কৌশল আর কি হতে পারে?

বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ আজ সারা দুনিয়ায়, বিশেষতঃ তৃতীয় দুনিয়ার নয়া ঔপনিবেশিক দেশগুলির জনগণের মধ্যে আধ্যাত্মবাদ ও অলৌকিকত্ব প্রচারের জন্য বিজ্ঞানের ওপর আঘাত হানতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে না। তাই

সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী দানিকেন নামক তাদের এক বিশ্বস্ত অনুচরকে 'দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন' বৈজ্ঞানিক সাজিয়ে এই অলৌকিকত্ব প্রচারের কাজে নিযুক্ত করেছে। আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা অর্থপুষ্ট এই 'ক্ষণজন্মা' পুরুষটি অতি অল্প বয়সের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের সব শাখা অধিগত (!) করে মানববিবর্তন সম্পর্কিত সমস্ত বৈজ্ঞানিক সত্যকে উল্টে দিয়ে অন্য গ্রহ থেকে পৃথিবীতে মানুষ আসার গল্প ফেঁদে বসেছে। দানিকেনের 'গবেষণা'র আসল লক্ষ্য যে জীব-জগতের বিবর্তন সম্বন্ধে সমস্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বিকৃতিকরণ, এতে কোন সন্দেহই নেই। কারণ বিবর্তনের ধারণাটি খারিজ না করে মার্কস আবিষ্কৃত সমাজ বিবর্তনের তত্ত্বকেও পুরোপুরি নস্যাৎ করা যায় না।

আসলে বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানের ওপর বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ হল তাদের নয়াঔপনিবেশিক কৌশলেরই অন্তর্গত একটি কর্মসূচী, **নয়াঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক আক্রমণ।** তৃতীয় বিশ্বের নয়াঔপনিবেশিক দেশ-গুলোতে নানা ছদ্মবেশে এই আক্রমণ অহরহই চলছে। অবক্ষয়ী পুঁজিবাদী সংস্কৃতিও আজ এই উদ্দেশ্যকেই চরিতার্থ করে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান ভারতে আধুনিকতার নামে যেমন যৌন আবেদন মূলক নৃত্য, হিপি কালচার ও পর্ণগ্রাফি সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব, তেমনিই আবার মানুষকে জীবনবিমুখ করে তোলার জন্য বিমূর্ত দর্শন ও শিল্প-সাহিত্যের প্রসার। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় বুর্জোয়া সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, মূল্যবোধ প্রভৃতি সবকিছুই আজ সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতিরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি ও অবক্ষয়ী পুঁজিবাদী সংস্কৃতির মিলনে যে দানবীয় জরাসন্ধের সৃষ্টি হয়েছে সেটিই আজ পঞ্চান্ন কোটি মানুষের বুকের ওপর চেপে বসে রুদ্ধ করে তুলেছে ভারতীয় সমাজ বিকাশের পথকে।

নয়া-ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি শুধু ভাবতের বুর্জোয়া-পাতিবুর্জোয়া শ্রেণীকেই প্রভাবিত করে না, শ্রমিক ও কৃষকের ওপরও এর প্রভাব যথেষ্ট। ভারতবর্ষে পুঁজিবাদ যেহেতু সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির ওপর প্রোথিত হয়েছে, সেহেতু সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির পূর্ণ বিনাশ হয় নি। কিন্তু পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পুঁজিবাদের বিকাশের ইতিহাস হল সামন্তবাদের বিরুদ্ধে জনগণের এক সুদীর্ঘ জীবনমরণ সংগ্রামের ইতিহাস। এই সমস্ত দেশে ধনতন্ত্রের এক একটি অগ্রগতি হল জনগণের সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রামের

এক একটি বিজয়। বলা নিষ্প্রয়োজন, জনগণের এই সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রামেরই অন্তর্গত ছিল কূপমণ্ডূকতা, চার্চের প্রভুত্ব, ধর্মীয় কুসংস্কার, লোকাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে এক নিরবচ্ছিন্ন আদর্শগত সংগ্রাম। বিজ্ঞানের এক একটি আবিষ্কার যেমন তাঁদের মধ্যযুগীয় বিশ্বাসকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল, তেমনি তাঁদের প্রত্যেকটি সংগ্রাম সামন্তপ্রভুদের 'দেবত্ব' ও শক্তি সম্পর্কে অতীন্দ্রিয় ধারণাগুলিকে নির্মূল করেছিল। এই ভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামগুলি ছিন্ন করেছিল সামন্তপ্রভুদের শক্তির কুহক; আর প্রতিটি সংগ্রামে ধর্মীয় অনুশাসন লঙ্ঘন তাঁদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল ধর্মের নিষ্ফলতা। ধনতান্ত্রিক দেশের জনগণ এই নিরন্তর সংগ্রামের মাধ্যমেই সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা ও মূল্যবোধের বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধন করেছিলেন। এর পাশাপাশি ভারতীয় সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রামের চিত্রটি কেমন? সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণ বার বার বিদ্রোহ করলেও সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের বিশেষ নজির ভারতীয় জনগণের নেই। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির ওপর পুঁজিবাদ প্রোথিত হওয়ার ফলে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজের এক অংশকে নাড়া দিলেও ব্যাপক জনগণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে সুদূর প্রসারী ফল সৃষ্টি করতে পারে নি। ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে পুঁজিবাদ বিকশিত হওয়ায় ভারতীয় জনগণ তাঁদের সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, আদর্শ, মূল্যবোধ প্রভৃতির কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটিয়েও পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে সক্ষম হয়েছেন। পশ্চিমী দুনিয়াতে বাস্তব সংগ্রাম জনগণকে ধর্মীয় অনুশাসন ভাঙতে বাধ্য করেছিল এবং তার মধ্য দিয়েই তাঁরা ধর্মীয় অনুশাসনের নিষ্ফলতা ও ধর্মগুরুদের অভিশাপের নির্বীর্যতার প্রমাণ হাতে-নাতে পেয়েছিলেন। ভারতীয় জনগণের সে অভিজ্ঞতা হয় নি। শুধু যুক্তি নয়, বাস্তব জীবনে ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও অনুশাসন ভঙ্গ করাই হল ধর্ম নামক জুজুটির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র পথ। সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা ও আদর্শের পরিবর্তন না করে ভারতীয় সামন্ত-প্রভুদের পক্ষে পুঁজি বিনিয়োগ করে পুঁজিপতি হওয়া সম্ভব হয় বলেই আধুনিক বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষিত বিজ্ঞানীদেরও অবচেতন মনে ধর্মীয় কুসংস্কার লালন-পালন করা সম্ভব হয়। ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন সামন্ততন্ত্র ও

পুঁজিবাদের 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' সম্ভব হচ্ছে, তেমনি এই দুই বিপরীত ধর্মী সংস্কৃতি নিশ্চিন্তে বিরাজ করছে। তাই বর্তমান আধা-সামন্ততান্ত্রিক নয়া-ঔপনিবেশিক ভারতের সংস্কৃতিও হল আধা-সামন্ততান্ত্রিক নয়া-ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি।

কোন্ শ্রেণী এই আধা-সামন্ততান্ত্রিক নয়া-ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির ধ্বংস সাধন করবে ? বলা বাহুল্য, সাম্রাজ্যবাদের দ্রুত ভাঙনের যুগে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টিই পারে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে। কিন্তু ভারতবর্ষে কমিউনিষ্ট নামধারী পার্টিগুলি যেমন জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করার কোনরকম চেষ্টা করে নি, তেমনি প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রকৃত সংগ্রামের কোন নজিরই এই পার্টিগুলির নেই। মাঝে মধ্যে তথাকথিত প্রগতিশীল পার্টি পত্রিকাগুলিতে এবিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত হলেও সেগুলি কেবলমাত্র এক দল মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। জনগণ ত দূরের কথা, এমন কি এই সব পার্টিগুলোর সাধারণ সভ্যদেরও কখনও সচেতন করে তোলা হয় নি। একারণেই দেখা যায় রঙ বেরঙের সংশোধনবাদী পার্টি কর্মীরা নেতৃত্বের নির্দেশক্রমে জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের অজুহাতে পূজোর খেলায় মেতে ওঠে। যে জাতিভেদ প্রথা ও সাম্প্রদায়িক বিরোধের ভিত্তিতে ভারতের ভোটরঙ্গটি অনুষ্ঠিত হয়, তার কখনও কখনও মৌখিক সমালোচনা করলেও ছদ্মবেশী প্রগতিশীলদের দল এই ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে এবং ভোটদাতা ও বিপক্ষ দলের প্রার্থীদের ধর্ম ও জাতি বিচার করেই নিজেদের প্রার্থী মনোনয়ন করে। ফলতঃ ভারতবর্ষে এক সুদীর্ঘ কমিউনিষ্ট আন্দোলন সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ ত বটেই, এমন কি অগণিত মার্কসবাদী কর্মীদের মনেও ধর্মীয় কুসংস্কার এখনও পুরোমাত্রায় অটুট রয়েছে। সুতরাং একথা অতি সুস্পষ্ট, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সে-তুং বিচারধারার ভিত্তিতে ভারতবর্ষে সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতির প্রচার ও বাস্তবে সেটি প্রয়োগের দায়িত্ব যে বিপ্লবীদের গ্রহণ করতে হয়েছে, এই আধা-সামন্ততান্ত্রিক নয়া-ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির বিনাশ সাধনও তাঁদেরই করতে হবে। মাও সে-তুং নির্দেশিত পথে ভারতবর্ষে বিপ্লবীরা যে সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নয়াগণতান্ত্রিক সমাজ গঠন করতে

চান, সেই সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল এই প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করে নয়া-গণতান্ত্রিক সমাজ গঠিত হবে, তেমনি এই আধা-সামন্ততান্ত্রিক নয়া-ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির অবসান ঘটিযেই সৃষ্টি কবতে হবে নয়াগণতান্ত্রিক সংস্কৃতি। কারণ চীন-বিপ্লবের অভিজ্ঞতা হল, "সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি ও আধা সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি হচ্ছে দুই ভাই; এবা খুবই অন্তরঙ্গ। চীনেব নতুন সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই দুই সংস্কৃতি মৈত্রী স্থাপন করেছে। এই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী স্বার্থবাহী, তাই এই সংস্কৃতিকে উচ্ছেদ করতেই হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সংস্কৃতিব উচ্ছেদ সাধন করা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো ধবনেব নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।[২৬৮]

তাই ভারতীয় বিপ্লবীদের সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের অন্যতম কর্মসূচী হওয়া উচিত এই প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক আপোষহীন সংগ্রাম। এটিও হল এক ধরণের সাংস্কৃতিক বিপ্লব। তবে নৈরাষ্ট্রবাদীদের ওই তথাকথিত সাংস্কৃতিক বিপ্লব নয়; এ হল নয়াগণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব। আর এই আন্দোলনের অস্ত্র হবে **মতাদর্শগত সংগ্রাম;** গোপনে মূর্তি ভাঙা নয়। ভবিষ্যতের নয়াগণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে যেমন দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের মধ্যে দিযে যেতে হবে, তেমনি এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনও চলবে এক সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী। এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রথম কাজ হবে সব রকমের সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী তত্ত্বের স্বরূপ প্রকাশ এবং ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে সেটি প্রচার। আর দ্বিতীয় কাজটি হবে আঞ্চলিক ক্লাব, ছাত্র ইউনিয়ন থেকে শুরু করে শ্রমিক সংগঠন, কৃষক সংগঠন প্রভৃতিব মাধ্যমে জনগণেব মধ্যে সামন্তবাদী ও অবক্ষয়ী পুঁজিবাদী সংস্কৃতির প্রতিটি বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে নিরন্তর মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা কবে শ্রমজীবী জনগণের মানসিকতার বিপ্লবীকরণ করা। এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন যেমন শহীদ মিনার থেকে বহির্গত সংশোধন-বাদীদের শূন্য আস্ফালনে শেষ হবে না, তেমনি এই আদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে কোন ইচ্ছাকৃত বলপ্রয়োগেব ঘটনাও ঘটবে না। প্রতিক্রিয়াশীল

সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আমাদের গঠন করতে হবে জনমত। অতি ধীরে, ক্ষেত্র বিচার করে, জনগণের পশ্চাৎপদ অংশ যে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত রয়েছেন, পোষ্টার, বিতর্ক, প্রকাশ্য জনসভা, জনে জনে প্রচারের মাধ্যমে সেই সমস্ত আচার-আচরণ, চিন্তাভাবনা, মূল্যবোধ প্রভৃতির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করাই হবে এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য। জনগণের সৃজনশীল ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটিয়ে এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করতে হবে নতুন শিল্প-সাহিত্য। কোন দেবমূর্তি বা মন্দির ভাঙা, এমন কি অসম্মান করারও প্রয়োজন নেই, কেবলমাত্র জনমত গঠন করেই এমন অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব যেখানে ধর্মভীরু মানুষও প্রকাশ্যে ধর্মোপাসনা করতে লজ্জাবোধ করবেন। তাই এই জনমত গঠনের জন্য এ আন্দোলনকে নিয়ে যেতে হবে শোষিত মানুষের প্রতিটি পরিবারে। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে, যুক্তির সাহায্যে, জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনাবলী থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে শোষিত মানুষকে মুক্ত করতে হবে ধর্মীয় কুসংস্কারসহ সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি থেকে। এই ভাবেই শোষিত জনগণের বর্তমান মানসিকতার বিপ্লবীকরণ সম্ভব, যা একদিকে সৃষ্টি করবে এক অভূতপূর্ব আত্মবিশ্বাস ও কর্মোদ্যম, অপরদিকে এর ফলে জনগণের সচেতনতার মানের যে বৃদ্ধি ঘটবে তার দ্বারা শোষণের প্রকৃত কারণগুলিও তাঁদের কাছে হয়ে উঠবে স্পষ্ট। ভারতের মত একটি সুবিশাল দেশে যেখানে অঞ্চলগত, জাতিগত, আচারগত বিভিন্নতা প্রকট, সেখানে এ পথ যে অতি দীর্ঘ, কষ্টকর সন্দেহ নেই। কিন্তু আবহমানকালের সঞ্চিত কুসংস্কার এবং সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শ দূর করার অন্য কোন পথও নেই। এই কষ্টকর পথের বিকল্প হিসাবে কোন সংক্ষিপ্ত পথের অনুসন্ধান করার অর্থ হবে ভারতীয় কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ব্যর্থতারই পুনরাবৃত্তি।

ভারতীয় আধা-সামন্ততান্ত্রিক নয়া-ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি বিরোধী যে আন্দোলন আমাদের পরিচালনা করতে হবে সে আন্দোলন মতাদর্শগত হলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, মতাদর্শের কোন্ কোন্ অস্ত্র সব থেকে ফলপ্রসূ হবে। নিঃসন্দেহে এবিষয়ে মার্কসবাদ ও বিজ্ঞানের প্রসারই হবে বিশেষ কার্যকরী। কিন্তু এ ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্রের অনুসন্ধান কি মার্কসবাদ বিরোধী কাজ হবে ? মনে রাখা প্রয়োজন, বিজ্ঞানের প্রসার মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত করার ক্ষেত্রে

বিশেষ ফলপ্রদ হলেও বর্তমান অবস্থায় কোটি কোটি নিরক্ষর ভারতবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসার অতি দুরূহ কাজ। বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পাঁচ বছর পরেও ঠিক একই প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল— পশ্চাৎপদ জনগণের অন্ধতা দূব করাব জন্য শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও মার্কসবাদের চর্চাই কি যথেষ্ট? রুশ জনগণের কুসংস্কার দূর করাব উদ্দেশ্যে ট্রটস্কি প্রমুখ ব্যক্তিগণ অমার্কসীয় বস্তুবাদীদেব সঙ্গে একত্রে একটি পত্রিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবেন এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাসে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি বিরোধী সংগ্রামে মার্কসীয় ও অমার্কসীয় বস্তুবাদীদের এই ঐক্যে লেনিনের প্রতিক্রিয়া কিরকম হল? মার্কসীয় ও অমার্কসীয় বস্তুবাদীদের ওই ঐক্যকে জোরালো সমর্থন জানিয়ে লেনিন বললেন,

"যে হারেই হোক, রাশিয়ায় অকমিউনিষ্ট শিবির থেকে আসা বস্তুবাদীরা আজও আমাদের মধ্যে আছেন এবং ভবিষ্যতে এক সুদীর্ঘ সময় ব্যাপী তাঁরা থাকবেনও। আমাদের অবশ্য কর্তব্য হল: তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের দার্শনিক প্রতিক্রিয়া ও দার্শনিক কুসংস্কার—এই দুই'এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য সমস্ত অবিচল ও সংগ্রামশীল বস্তুবাদের অনুগামীদের নিযুক্ত করা।"[২৬৯]

জনগণের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীব বস্তুবাদীদের রচনা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে লেনিন এই প্রবন্ধে আরও বললেন, "অষ্টাদশ শতকের সংগ্রামী নাস্তিক্যবাদী সাহিত্যের অনুবাদ করার জন্য এবং সেইগুলি সর্বসাধারণেব মধ্যে প্রচার করার জন্য এঙ্গেলস দীর্ঘদিন আগেই তাঁর সমসাময়িক শ্রমিক নেতাদের উপদেশ দিয়েছিলেন। আমাদের লজ্জার কথা আমরা সেটি আজও করে উঠতে পারি নি…। আমাদের অনীহা, নিষ্ক্রিয়তা এবং অক্ষমতাকে কখনও কখনও চাপা দেওয়া হয় নানা ধরণের সব 'অত্যুচ্চ' অজুহাত দেখিযে, যেমন কিনা অষ্টাদশ শতকের পুরনো নাস্তিক্যবাদী সাহিত্য হল সেকেলে, অবৈজ্ঞানিক, সাদাসিধে প্রভৃতি। এই রকম ভূয়ো-বৈজ্ঞানিক কুতর্কের থেকে খারাপ আর কিছু হতে পারে না, যা হয় পণ্ডিতিপণা নয়ত মার্কসবাদ অনুধাবন করার সম্পূর্ণ অক্ষমতাকে ঢাকা দেওয়ার একটা পর্দা হিসেবেই কাজ করে। অষ্টাদশ শতকের বিপ্লবীদের রচনায় অনেক কিছুই যে অবৈজ্ঞানিক বা অতি সরল সেকথা ঠিকই। কিন্তু এই রচনাগুলিকে সংক্ষিপ্ত

করা এবং এর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সংযোজিত অংশ যোগ করা থেকে কোন প্রকাশককেই বিরত করা হয়নি। ধর্মের বৈজ্ঞানিক সমালোচনার ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে মানবসমাজে যে সব অগ্রগতি ঘটেছে সেগুলির উল্লেখ এবং এবিষয়ে সর্বশেষ রচনাগুলির নামোল্লেখও এই সমস্ত সংযোজিত অংশে করা যেতে পারে। লক্ষ লক্ষ মানুষ (বিশেষতঃ কৃষক ও কারিগররা) যারা সমস্ত আধুনিক সমাজ দ্বারা দণ্ডপ্রাপ্ত তারা অন্ধতা, অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার থেকে নিজেদের শুধুমাত্র বিশুদ্ধ মার্কসবাদী শিক্ষার সরলরেখা বরাবর মুক্ত করবে —একজন মার্কসবাদীর পক্ষে এটা ভাবা হল সব থেকে বড় ও মর্মান্তিক ভুল।"[২৭০]

এঙ্গেলস বা লেনিন শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মবিরোধী সংগ্রামে কেন অকমিউনিষ্ট বস্তুবাদীদের সাহায্যের ওপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করলেন ? এই সংগ্রামে মার্কসবাদ ও বিজ্ঞানের প্রসার কি যথেষ্ট নয় ? এ প্রসঙ্গে লেনিন বলছেন, "অষ্টাদশ শতকের পুরনো নাস্তিক্যবাদীদের তীক্ষ্ণ, প্রাণবন্ত ও প্রতিভাসম্পন্ন রচনাগুলো বুদ্ধিদীপ্তভাবে ও অকপটে তৎকালীন যাজকবৃত্তিকে আক্রমণ করেছিল। সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় জড়ত্ব থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে মার্কসবাদের নিরস ও শুষ্ক চর্বিতচর্বণ থেকে প্রায়শঃই অষ্টাদশ শতকের এই সব রচনাগুলো হাজার গুণ উপযোগী হবে। আর এই সব মার্কসবাদী রচনাগুলো, যার মধ্যে বাস্তব জগৎ থেকে নিপুণভাবে সংগৃহীত উদাহরণ সমূহ প্রায় একেবারেই অনুপস্থিত, সেগুলোর প্রাদুর্ভাবই আমাদের সাহিত্যে বেশী এবং (গোপন করে লাভ নেই) এগুলো প্রায় সময় মার্কসবাদকেই বিকৃত করে। এমন আশঙ্কার কোন ভিত্তিই নেই যে পুরনো নাস্তিক্যবাদে ও পুরনো বস্তুবাদে মার্কস-এঙ্গেলস প্রবিষ্ট সংশোধনগুলো সংযুক্ত করা হবে না। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই—যা আমাদের কমিউনিষ্টদের মধ্যেকার তথাকথিত মার্কসবাদীরা অবহেলা করে থাকে এবং তারা বাস্তবে মার্কসবাদকে বিকৃতই করে, তাদের জানা উচিত কিভাবে অনুন্নত জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় প্রশ্ন সম্পর্কে একটা বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনার মনোভাব জাগরিত করা যায়।"[২৭১]

সুতরাং পশ্চাৎপদ জনসাধারণকে সামন্ততান্ত্রিক কূপমণ্ডূকতা, বিশেষ করে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে যদি লেনিনীয় শিক্ষাটি গ্রহণ করা যায়,

তা'হলে আমাদের শুধু মার্কসবাদ ও বিজ্ঞানের প্রচারের ওপর নির্ভর করলেই চলবে না। লেনিনের মত মার্কসবাদীর উপস্থিতি সত্ত্বেও লেনিন যেখানে রুশিয়ার মার্কসবাদী সাহিত্যের মানকেও যথেষ্ট মনে করেন নি, সেখানে আমাদের মার্কসবাদী রচনাগুলি যে অতিশোচনীয়ভাবে নিকৃষ্ট সে বিষয়ে কি কোন সংশয় থাকতে পারে? জনগণের মন থেকে ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করার জন্য এঙ্গেলস ও লেনিন অষ্টাদশ শতকের বস্তুবাদীদের রচনা প্রচার করতে উপদেশ দিয়েছেন। এমন কি বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়ায় এ বিষয়ে মার্কসীয় ও অমার্কসীয় বস্তুবাদীদের ঐক্যকে লেনিন যদি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করে থাকেন, তা'হলে আমাদের আশু প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ভারতীয় বস্তুবাদী, নাস্তিক্যবাদী ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের সাহায্য গ্রহণ না করার পক্ষে কি কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে? শুধুমাত্র সামন্ততান্ত্রিক কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধেই নয়, বর্তমান ভারতের অবক্ষয়ী বুর্জোয়া সংস্কৃতি বিরোধী সংগ্রামেও উনিশ শতকের প্রগতিশীল ভারতীয়দের চিন্তাধারার গুরুত্ব যথেষ্ট। কারণ তাঁরা অনেকাংশেই ছিলেন বিশুদ্ধ বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রতিনিধি। প্রকৃতপক্ষে আমরা যদি লেনিন উল্লিখিত ওই তথাকথিত মার্কসবাদীদের দল না হই, যদি আমাদের একমাত্র কাজ মার্কসবাদের শুকনো 'চর্বিতচর্বন' না হয়, তা'হলে এই নয়াগণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদী সহ সমস্ত প্রগতিশীল ভারতীয়দের সার্থক ব্যবহার করাই হবে একমাত্র বিপ্লবী কৌশল। তাই আমরা আধা-সামন্ততান্ত্রিক নয়া-ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি বিরোধী সংগ্রামে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন ভারতীয় বস্তুবাদীদের পরিত্যাগ করতে পারি না। তাঁদের প্রকৃত ইতিহাস হল ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এক আপোষহীন সংগ্রামের ইতিহাস। এই সংগ্রামে যদিও আমাদের মার্কসবাদ ও বিজ্ঞানের প্রচারকার্যে কোনক্রমেই অমনযোগী হলে চলবে না, কিন্তু মনে রাখতে হবে—যে ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে আমরা এই সংগ্রামকে বাস্তবে নিয়ে যেতে চাই, তাঁদের মধ্যে বেশীরভাগ মানুষ এখনও মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত নন। ফলে মার্কসবাদের মৌলিক পুস্তকাবলী থেকে উদ্ধৃতি 'আবৃত্তি' তাঁদের মনে রেখাপাত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। পক্ষান্তরে, যেহেতু সাধারণ মানুষ এইসব প্রগতিশীল ভারতীয়দের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ( অল্প হলেও ) পরিচিত, সেহেতু এই দূষিত সংস্কৃতি থেকে

জনসাধারণকে মুক্ত করার সব থেকে সহজ অথচ কার্যকরী অস্ত্র হবে ভারতীয় বস্তুবাদী ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের যথাযোগ্য ব্যবহার। ব্যবহারের অর্থ অবশ্যই এঁদের সমগ্র বক্তব্যের হুবহু আবৃত্তি নয়। ব্যবহার বলতে আমাদের মার্কসবাদী ব্যবহারই বুঝতে হবে। অর্থাৎ নিপুণভাবে বিষয়বস্তু নির্বাচন করে, বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করে আমাদের ভারতীয় বস্তুবাদী ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের সেইসব বক্তব্য প্রচার করাই যুক্তিযুক্ত হবে, যা একদিকে সঠিক এবং অন্যদিকে বাস্তবোপযোগী। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুযায়ী এরই সঙ্গে আমাদের সংযোজন করতে হবে টীকা, ভাষ্য ও বাস্তব থেকে সংগৃহীত দৃষ্টান্ত। এই সব ব্যক্তিদের কোন কোন বক্তব্য যে সেকেলে হয়ে গেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই সেই বিষয়গুলিকে পরিমার্জিত করতে হবে নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও মার্কসবাদের আলোকে। প্রগতিশীল ব্যক্তিমাত্রই ত্রুটিবিহীন হবেন এমন কোন কথা নেই। এইজন্য যে সব বস্তুবাদী ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত হবে, তাঁদের নেতিবাচক দিকগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে অকপটে। মনে রাখা প্রয়োজন, শুধু রামমোহন-বিদ্যাসাগরই নন, ভারতীয় ইতিহাসে এই রকম বস্তুবাদী ও প্রগতিশীল ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া কষ্টকর নয়। কিন্তু ভারতীয় মার্কসবাদীরা এ বিষয়ে যে চরম অজ্ঞতা প্রদর্শন করে আসছেন, তার ফলেই আজ শাসকশ্রেণী কারোকে 'রাজা' সাজিয়ে, আর কারোকে বা 'দয়ারসাগর-করুণাসাগর'-এ রূপান্তরিত করে, এঁদের বিপ্লবী চরিত্র হরণ করতে ও জনগণের কাছ থেকে এঁদের সরিয়ে রাখতে কৃতকার্য হয়েছে। সুতরাং, আজ যাঁরা আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও নয়া-ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির হাত থেকে জনগণকে মুক্ত করা বিপ্লবী কর্তব্য বলে মনে করেন, তাঁদের একমাত্র কাজ হল ভারতীয় শাসকশ্রেণীর ভাববাদ ও অবক্ষয়ী পুঁজিবাদী সংস্কৃতির প্রচারের মোকাবিলা করার জন্য ভারতের ও অন্যান্য দেশের বস্তুবাদী, নাস্তিক্যবাদী ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের চিন্তাধারার অবিরাম প্রচার করা। প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মার্কসীয় ও অমার্কসীয় বস্তুবাদী এবং প্রগতিশীল ব্যক্তিদের এই ঐক্য স্থাপনই হবে সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সঠিক মাওবাদী রণকৌশল। এই পদ্ধতি সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পারলেই দেখা যাবে—জনগণের মধ্যে যে অগণিত গণতান্ত্রিক মানুষ আছেন, যাঁরা হয়ত মার্কসবাদী নন এবং তাঁদের ভুল

চিন্তাধারা ও আমাদের ভুল কর্মধারার ফলে যাঁদেরকে আমরা সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে এখনও অনুপ্রাণিত করতে পারিনি, তাঁরাও বৃহৎ সংখ্যায় এগিয়ে আসবেন। এমন কি সংশোধনবাদী পার্টিগুলির সাধারণ কর্মীদের উপরও এই সংগ্রামের প্রভাব পড়তে বাধ্য। আর এর মধ্য দিয়েই ভারতে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে মাও সে-তুং প্রদর্শিত ব্যাপক সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণমোর্চা। সামন্ত-তান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শুন্য আস্ফালন নয়, একমাত্র এই কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ণ যেমন প্রকৃত প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির বিনাশসাধন করবে, তেমনি এই কর্মধারার সঠিক অনুসরণ যে গণচেতনার সঞ্চার করবে তার ফলে বিপ্লবীদের বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত শাসকশ্রেণীর প্রতিটি কৌশলই যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।